সত্য হরর কাহিনি

ভুতুড়ে ছায়া

ইশতিয়াক হাসান

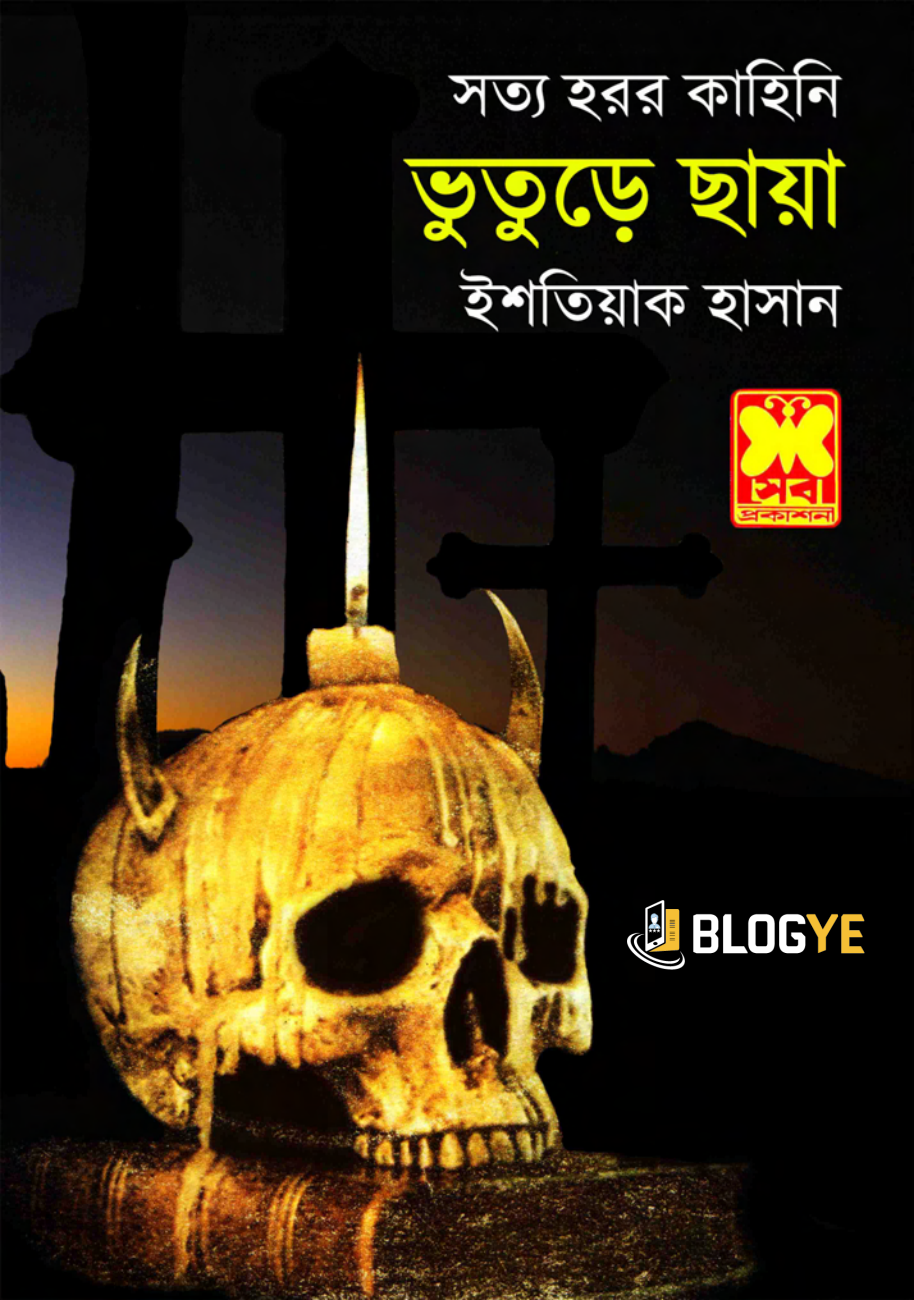

BLOGYE

সত্য হরর কাহিনি

ভুতুড়ে ছায়া

ইশতিয়াক হাসান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-0258-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

BHUTURE CHHAYA
Collection of true horror stories
By: Ishtiaq Hasan

একাশি টাকা

উৎসর্গ

ইসমত জাহান পুনম

Download More PDF Books

সূচি

অভিশাপ

মমির অভিশাপ ১০
ভুতুড়ে খুলি ১৮
অভিশপ্ত হীরা ৩২
মমি ভয়ংকর ৩৯

ভুতুড়ে বাড়ি

৫০ বার্কলে স্কয়্যার ৪৫
রহস্যময় মহিলা ৫০
অপদেবতার আস্তানা ৫৩
অনাহূত অতিথি ৬৯

সাগরে ভূত

বাতিঘরের রহস্য ৭৩
এফডি ১২ ৮৩
সুগন্ধি ভূত ৮৯
দড়ি নামাও! ১০২
স্বপ্নে দেখা মুখ ১০৫
বিদায় প্রিয়তম! ১০৯
ফ্লাইং ডাচম্যান ১১৩

মরণের ডঙ্কা বাজে

মৃত্যু মোমবাতি ১২০
বানশি (দ্বিতীয় পর্ব) ১২৯
মৃত্যু মুখোশ ১৩৩
আত্মহত্যা ১৩৬

এই কামরা ভাল নয়

পোড়াকপালী ১৩৯

অশুভ হাত ১৫২
জাদুঘরের ভূত ১৫৫
অদৃশ্য হাত ১৬৩

সীমানা পেরিয়ে
ওপার থেকে ১৬৭
মোমবাতি পুড়ছে ১৭৩
হিথরোর আতংক ১৭৫
সুড়ঙ্গের ভূত ১৭৯

ভুতুড়ে ৯
চোরাবালি ১৮২
শিকলের শব্দ ১৯০
আমার নাম... ১৯৬
ডাইনীর গুহা ১৯৮
দখল ২১১
বুকিট বাটক ২১৪
শেষ বাস (তৃতীয় পর্ব) ২১৭
মুখোমুখি ২১৮
বাদুড় মানব ২২০

রাস্তার আতংক
ক্ষুধার্ত আত্মা ২২৯
পথে বিপদ ২৩০
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ২৩৫
রাতের বিভীষিকা ২৩৬

গোরস্থানে ভয় আছে
বাজি ২৪৭
হাইগেটের রক্তচোষা ২৫৩

হরর সিরিজের আরও ক'টি বই

অনীশ দাস অপু

দুঃস্বপ্নের রাত+প্রেতপুরী ৬৫/-

আবার অশুভ সংকেত+নেকড়ে মানবী

ধূসর আতঙ্ক

মৃত্যু-পুতুল+রক্ততৃষ্ণা ৮৪/-

পিশাচী

ওখানে কে?

ভুতুড়ে দুর্গ+ছায়াবৃত্ত

আরেক ড্রাকুলা

অশুভ ১৩+অশরীরী আতঙ্ক

অশুভ ছায়া

তাহের শামসুদ্দীন/অনীশ দাস অপু

প্রেতশক্তি+পিশাচ দেবতা

অশুভ ছায়া+অপার্থিব প্রেয়সী ৭১/-

ইশতিয়াক হাসান

সব ভুতুড়ে ৭০/-

মুখবন্ধ

'সব ভুতুড়ে' বইটিতে জানিয়েছি, সংগ্রহে রয়েছে আরও অনেক অপ্রাকৃত কাহিনি। সেসব আলোর মুখ দেখবে কি না ঠিক করবেন পাঠক।

আপনারা আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাই ভুতুড়ে কাহিনির এই দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হলো।

এবারও থাকছে গতবারের বেশিরভাগ বিভাগ— তবে পাল্টে গেছে কিছু নাম। বাদ পড়েছে তিনটি বিভাগ, বদলে যোগ হয়েছেঃ 'সাগরে ভূত' এবং 'অভিশ্রাপ' এ দুটি অধ্যায়।

কেউ কেউ 'সব ভুতুড়ে' পড়ে অনুযোগ করেছেন, বড় কাহিনির সংখ্যা বড্ড কম। এবার তাঁদের সে চাওয়া পূরণ করতে চেয়েছি, ফলে বইয়ের আয়তন বাড়লেও কমেছে কাহিনির সংখ্যা।

আগের সংকলনের মত এর মূল অবলম্বন প্রচুর বিদেশি বই। এ ছাড়া, কিছু ম্যাগাযিন ও ওয়েবসাইটের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

এই সংকলন ভাল লাগলে আরও একটি বই প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল।

বইটি লিখতে উৎসাহ দেয়ায় শাহনূর (কাজী শাহনূর হোসেন)

ভাইকে ধন্যবাদ।

আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা—

ইশতিয়াক হাসান
শান্তিনগর, ঢাকা।

www.blogye.com

অভিশাপ

অভিশাপে মানুষের বড্ড ভয়। বেশিরভাগ সময় অভিশাপ ফলে না। কিন্তু যখন সত্যি ফলে যায়, ঘটতে থাকে যত সব অনাসৃষ্টি! একবার অভিশপ্ত কিছু হাতে এলে রেহাই নেই।

'অভিশাপ' অধ্যায়ে রয়েছে অভিশাপ ও অভিশপ্ত জিনিসের কাহিনি।

মমির অভিশাপ

স্যর আলেকযাণ্ডার স্যাটন কোনওভাবেই বুঝে উঠছিলেন না তাঁর স্ত্রী যেয়লা কেন হাড়টা চুরি করেছিল।

১৯৩৬ সাল।

মিশরে ছুটি কাটাচ্ছেন স্যাটনরা। বিশাল সব পিরামিড, স্ফিংস, প্রাচীন মন্দির এমন চমৎকার সব নিদর্শন ঘুরে ঘুরে দেখছেন। একদিন গাইড আবদুল তাঁদেরকে নিয়ে গেল গোপন এক সমাধিতে। কিছু মমি আছে ওখানে, কিন্তু সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি এখনও।

মাটির তলে সমাধি।

ধসে পড়া পাথরের সিঁড়ি-পথে আবদুল তাঁদেরকে নিয়ে চলেছে, বাসি ও ছাতা পড়া ঝতাসের গন্ধে শ্বাস আটকে আসতে চাইল স্যাটন দম্পতির।

'এখানে এমন অনেক আছে,' ফিসফিস করে ষড়যন্ত্রের সুরে বলল আবদুল। 'তবে আমি আপনাদেরকে দেখাব একটা আলাদা সমাধি। ওটা একেবারেই অন্যরকম। আমার ভারি পছন্দ।'

পাথরের একটি চাপড়ার কাছে তাঁদেরকে নিয়ে গেল সে। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতেই শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল স্যর আলেকযাণ্ডারের শরীরে। তাঁর সামনে প্রাচীন পাথরের খুপরিতে আঁটসাঁটভাবে শুয়ে আছে এক নারীমূর্তি। পুরনো, জীর্ণ শবের সাদা পোশাকে ওই লাশ কিছুটা ঢাকা।

এক মুহূর্তের জন্য আতংকিত দৃষ্টিতে মমির দিকে চেয়ে রইলেন স্যর আলেকযাণ্ডার, তারপরই চরকির মত পাক খেয়ে

ঘুরলেন। বাইরের তাজা বাতাসে ফিরে যেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি। 'ধন্যবাদ, আবদুল,' বলেই পুরনো, ভাঙা সিঁড়ি পথে আবারও আলো-বাতাসের রাজ্যে ফিরে যেতে চাইলেন।

আবদুল ও যেয়লা তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে গেছেন, এমনসময় স্যর আলেকযাণ্ডারের বাহু স্পর্শ করলেন যেয়লা।

'আমি ওটাকে আরেকবার দেখব,' রহস্যময় কণ্ঠে বললেন তিনি, 'আমার জন্য অপেক্ষা করো।' তারপর স্বামীকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই দ্রুত নেমে গেলেন সমাধির দিকে।

হোটেলে ফিরবার পর যেয়লা যখন মমির মেরুদণ্ডের ছোট্ট হাড়টা দেখালেন, বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন স্যর আলেকযাণ্ডার।

'এটা চুরি করেছি,' ফিসফিস করে বললেন তাঁর স্ত্রী, 'আমি একটা স্মারক চেয়েছিলাম।'

মিশর বেড়ানো শেষে স্কট্‌ল্যাণ্ডের এডিনবার্গে নিজেদের বাড়িতে ফিরে এলেন স্যর আলেকযাণ্ডার ও তাঁর স্ত্রী যেয়লা।

আর তারপরই যেন কাজ শুরু করল মমির অভিশাপ।

অনেকদিন পর দেশে ফিরেছেন তাঁরা, রাতে বেশ ক'জন অতিথি এলেন তাঁদের দাওয়াত পেয়ে।

খাওয়া-দাওয়া শেষে সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন স্যর আলেকযাণ্ডার। সবাই পার্টিটা দারুণ উপভোগ করেছেন। বিশেষ করে স্যাটনদের মিশর ভ্রমণের গল্প আর যেয়লার হাড় চুরির কাহিনিটা। হাড়টা খাবার-ঘরে কাঁচের এক বাক্সে রেখে সবাইকে দেখবার সুযোগ করে দিয়েছেন স্যর আলেকযাণ্ডার। যেয়লা যখন চুপিসারে আবারও সমাধির দিকে নেমে যাওয়ার গল্পটা বলছিলেন, হাসি থামাতে পারেননি অতিথিরা।

অতিথিদের শেষ কয়েকজনের সঙ্গে করমর্দন করছেন স্যর আলেকযাণ্ডার, এমনসময় উপর থেকে কিছু ভেঙে পড়বার

www.blogye.com

আলেকজান্ডার স্যাটানের ভাতিজা দেখল ভুতুড়ে নারীমূর্তি। অস্ত্র নিয়ে কামরায় ঢুকে স্যাটান দেখলেন সব লণ্ডভণ্ড।

www.blogye.com

আওয়াজ পেলেন। দ্রুত লাফ দিয়ে সরে গেলেন তিনি, পরমুহূর্তেই একটু আগে যেখানে ছিলেন ঠিক সে জায়গাটায় পাথরের দেয়ালের ভারী একটা চাঙড় পড়ল। আঁতকে উঠলেন সবাই। ওটা যদি স্যরের মাথায় পড়ত, সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ হতো।

এ ঘটনা মন থেকে মুছে দিতে চাইলেন স্যর আলেকযাণ্ডার। তা ছাড়া, আজ রাতে দমকা হাওয়া বইছে, এমন আবহাওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটা খুব অস্বাভাবিক নয়। আর বাড়িটাও বেশ পুরনো। যদিও আজ সন্ধ্যা থেকেই কেমন যেন অস্বস্তি দানা বাঁধছে তাঁর মনে।

এর পর থেকেই শুরু হলো নানা ঝামেলা ও শব্দ।

যে রাতে পার্টি হয়েছিল, তার কয়েক রাত পরের কথা।

স্যাটনদের আয়া মিস ক্লার্ক প্রথম শুনলেন শব্দটা। কোনও কিছু পতনের এবং বাড়ি দেওয়ার টানা আওয়াজ। ওগুলো আসছে খাবার ঘর থেকে।

শব্দ কানে গেল স্যর আলেকযাণ্ডারেরও।

সকালে আবিষ্কার করলেন, যে টেবিলের উপর কাঁচের বাক্স ছিল, ওটা উল্টে গেছে। আর মমির হাড় পড়ে আছে মাটিতে।

আসলে কিছুই ঘটছে না ভঙ্গি করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়া এবার কঠিন হলো স্যর আলেকযাণ্ডারের পক্ষে পুরনো অস্বস্তি আবারও ফিরে এল মনে।

তারপর একদিন তাঁকে রীতিমত ভড়কে দিল ছোট্ট ভাতিজা।

'চাচা, আমি যখন টয়লেট থেকে ফিরছি, তখন ওটাকে দেখেছি। অদ্ভুত পোশাকের মানুষ, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। ...সে কে ছিল, বলতে পারেন?' কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল ছেলেটা।

স্যর আলেকযাণ্ডারের মনে হল তাঁর হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। শব্দের সঙ্গে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রায় একমাস ধরে টানা যন্ত্রণা করছে ওই আওয়াজ। কেউ দেখেনি

www.blogye.com

ভূত বা প্রেতাত্মা। তারপরই এই ঘটনা।

তবে কি মমির সাদা পোশাক অদ্ভুত মনে হয়েছে তাঁর ভাতিজার?

গা কাঁটা দিয়ে উঠল স্যর আলেকযাণ্ডারের।

'আমি... জানি না ওটা কী,' বলেই মনে হলো ছোট্ট ছেলেটিকে ভয় পাইয়ে কাজ নেই। 'আমি নিশ্চিত ওটা ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়। তুমি বরং যাও, খেলা করো।'

একদৃষ্টিতে কাঁচের বাক্সের ভিতর পড়ে থাকা হাড়টার দিকে তাকিয়ে আছেন স্যর আলেকযাণ্ডার। দোতলায় নিজের পড়ার ঘরে এনেছেন ওটাকে। এখন কামরাটার সব দরজা-জানালা আটকে অপেক্ষা করছেন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবার জন্য।

ঘড়িটা ঢং-ঢং করে মধ্য রাতের সংকেত দিল।

স্যর আলেকযাণ্ডার এখনও বসে আছেন। চারপাশ আশ্চর্য শান্ত, নীরব। নিজেকে কেমন বোকা লাগল তাঁর।

তারপরও ধৈর্য ধরে বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ পর ঘড়িটা রাত একটা বাজবার ঘোষণা দিল।

শেষ পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন স্যর আলেকযাণ্ডার। মেহগনি কাঠের টেবিলটার উপর ঝুঁকে হাড়টার দিকে তাকালেন। আসলেই হাস্যকর ব্যাপার, ভাবলেন। এটা সামান্য হাড় ছাড়া কিছুই নয়, মৃত মানুষের কংকালের একটি অংশ। মোটেই ভুতুড়ে নয়। আর ভূত-প্রেতাত্মা আছে কেবল ছেলে-পুলেদের কল্পনায়।

কামরা তালাবদ্ধ করে ঘুমাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

বিছানায় এসে শুতেই দু' চোখে এল ভীষণ ঘুম।

কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমাননি, এমনসময় যেয়লার চিৎকারে ধড়মড় করে জেগে উঠলেন।

'আলেকযাণ্ডার,' গুঙিয়ে উঠলেন যেয়লা, 'আলেকযাণ্ডার, এখানে কিছু আছে! স্পষ্ট আওয়াজ শুনলাম! তাড়াতাড়ি ওঠো!'

www.blogye.com

হলরুমে মিস ক্লার্কের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁদের।

'আপনারা শব্দটা শুনেছেন?' বারান্দা ধরে দৌড়ে এসেছে দম্পতি, তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। ভয়ে কাঁপছে তাঁর কণ্ঠ, 'এ বাড়িতে এসব কী হচ্ছে?'

আয়াকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে ঢোলা আলখেল্লার পকেট থেকে পিস্তল বের করলেন স্যর আলেকযাণ্ডার। পড়ার ঘরের তালা খুলে দরজাটা মেলে ধরলেন।

আয়া আতংকে চেঁচিয়ে উঠল। দুই হাত মুঠো করে বুকে চেপে ধরলেন যেয়লা।

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে গোটা কামরার চারপাশে নজর বোলালেন স্যর আলেকযাণ্ডার।

যে চেয়ারে বসে হাড়টার দিকে চেয়েছিলেন, ওটা উল্টে আছে।

ভারী একটা সুভ্যেনিয়ার ফুলদানি গালিচার উপর পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কামরার এখানে-সেখানে পড়ে আছে বই। যেন কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে ছুঁড়ে মেরেছে ওগুলো। কামরা ছাড়ার আগে আসবাবগুলোকে যেখানে দেখে গিয়েছিলেন, একটাও ঠিক জায়গায় নেই। যেন আপন শক্তিতে জায়গা বদল করেছে ওগুলো। কেবল একটা জিনিসই ভাঙেনি বা সরেনি।

ঠিক তবিয়তে আছে ওটা। জানালা পথে আসা উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে মেহগনি টেবিল। তার উপর কাঁচের বাক্স, আর বাক্সের ভিতর মমির হাড়, ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিলেন স্যর আলেকযাণ্ডার।

এ ঘটনার পর থেকেই খারাপের দিকে মোড় নিল পরিস্থিতি।

স্যর আলেকযাণ্ডার ওই হাড় যেখানেই রাখুন না কেন, কোনও না কোনও ঘোট পাকাতেই লাগল ওটা।

ওই হাড় ছাড়া অন্য কিছুকে দায়ী করবার কোনও সুযোগ রইল না।

www.blogye.com

ওটাকে আবার নীচতলায় বসার ঘরে রাখলেন। কিন্তু সেদিন কাজ শেষে বাসায় ফিরে দেখলেন কামরার কাঁচের জিনিসপত্র ভেঙে একাকার, উল্টে আছে আসবাবপত্র।

আবারও উপরতলায় পড়ার ঘরে মেহগনি টেবিলে রাখলেন হাড়টাকে। কোনও কারণ ছাড়াই ভেঙে পড়ল শক্তপোক্ত টেবিলটা। হাড়টাকে পড়ে থাকতে দেখলেন মাটিতে। এবার খাবারঘরের এক টেবিলের উপর রাখলেন।

কয়েকদিন কাটল ঝামেলা ছাড়াই।

একটু ধাতস্থ হলেন বাড়ির সবাই। আর তারপরই এক নৈশভোজের পার্টির সময় তুলকালাম কাণ্ড বাধল।

আপনা থেকেই নড়ে উঠল টেবিল, যেন হাত-পা গজিয়েছে। তারপর জোরে গিয়ে পাশের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ধসে পড়ল। দু-জন ভদ্রমহিলা আতংকে জ্ঞান হারালেন। পণ্ড হলো পুরো পার্টি।

সংবাদপত্রের এক রিপোর্টারের পীড়াপীড়িতে তাঁকে মমির হাড় ধার দিলেন স্যর আলেকযাণ্ডার। আপাতত বাড়ির সবাই সুস্থ থাকবে. ভাবলেন তিনি।

একইসঙ্গে দুশ্চিন্তা হলো, রিপোর্টারের কাছে গিয়ে কী কাণ্ড ঘটায় ওটা, কে জানে! মনে কু ডাকল তাঁর।

আশংকা সত্যি হতে খুব বেশি সময় লাগল না। দু-সপ্তাহ পর ওই রিপোর্টার হঠাৎ করেই মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শুধু তাই নয়, জরুরি অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো তাঁকে।

স্যর আলেকযাণ্ডার মনে মনে স্থির করলেন, এবার সহ্য করবেন না, এর একটা শেষ দেখতেই হবে তাঁকে।

কিচেন একদমই চুপচাপ। পিন পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে। স্যর আলেকযাণ্ডার আগুনে কাঠ-কয়লা ফেললেন। আয়া মিস ক্লার্ক শরীরের সঙ্গে শাল আঁটসাঁটভাবে জড়িয়ে নিলেন।

www.blogye.com

ঠাণ্ডায়, না আতংকে কে জানে!

দুই হাত দিয়ে অভিশপ্ত হাড় ধরে দাঁড়িয়ে আছেন স্যর আলেকযাণ্ডারের চাচা। চোখ বুজে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছেন।

হাতে পোকার (উনুনের আগুন খোঁচাবার লোহার দণ্ড) নিয়ে চাচা ও মিস ক্লার্কের দিকে তাকালেন স্যর আলেকযাণ্ডার। মনে মনে ভাবছেন, প্রিয় এই সুভ্যেনিয়ার নষ্ট করে দেয়ায় যেয়লা কী তুলকালাম ঘটায় কে জানে!

'আমি তৈরি,' শান্তভাবে বললেন তিনি।

স্যর আলেকযাণ্ডারের চাচা তাঁর পাশে উবু হয়ে বসলেন। তারপর উনুনের গনগনে কয়লার মধ্যে টুপ করে ফেলে দিলেন হাড়টা।

আগুনের শিখা ঘিরে ধরল ছোট্ট হাড়কে।

ধোঁয়া বেরুতে লাগল ওটার থেকে।

তারপর লালচে শিখা তৈরি করে জ্বলতে লাগল হাড়। ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা অভিশপ্ত জিনিসটা থেকে চোখ সরাতে পারলেন না উপস্থিত তিনজন।

তাঁরা চেয়েই রইলেন, যতক্ষণ না উনুনে ছাই ছাড়া কিছুই রইল না

কিন্তু স্যর আলেকযাণ্ডারের কপাল খারাপ।

তাঁর জানা ছিল না হাড় পুড়ে যাওয়া মানেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া নয়।

আশ্চর্যজনক হলেও হাড় পুড়িয়ে দেওয়ার কারণেই যেয়লার সঙ্গে প্রথমবারের মত দাম্পত্য সমস্যা শুরু হলো।

ভদ্রমহিলা কখনোই ক্ষমা করেননি স্বামীকে।

১৯৩৯ সালে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দু'জনের।

তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যেয়লা কয়েক বছর রোগে ভুগবার পর কম বয়সেই পৃথিবীর ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন তিনি। এরপর আরও দু'বার বিয়ে করলেন স্যর আলেকযাণ্ডার। কিন্তু

www.blogye.com

কোনও সম্পর্ক শান্তি দিল না তাঁকে।

বুঝতে বাকি রইল না তাঁর, এ জীবনে ভাল কিছু সম্ভব নয় আর। জীবনের শেষ দিনগুলোতে যেয়লা এবং ওঁর এই পরিণতির জন্য মমির হাড়ের অভিশাপকেই দায়ী করেছেন বারবার।

পরিচিতরা যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছে, বিড়বিড় করে ওই হাড়কে শাপ-শাপন্ত করতে দেখেছে তাঁকে।

সে-সময়ের সংবাদপত্রগুলোর পাতায় এ ঘটনা দারুণ আলোড়ন তুলেছিল।

এডিনবার্গ সাইকিক কলেজের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হয়। স্যর আলেকযাণ্ডার সেখানে অনুষ্ঠিত একটি সভায় উপস্থিতও ছিলেন।

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পাশাপাশি তাঁর বাড়িতে ঘটে যাওয়া রহস্যময় ঘটনাগুলোর বিবরণ দেন।

কোনও কোনও সংবাদপত্র দাবী করে, প্রাচীন এক মিশরীয় অভিশাপের বলি হয়েছেন স্যাটানরা।

কী ভাবে এই অভিশপ্ত মমির গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, এ বিষয়ে পাঠকদের লেখা কিছু চিঠিও ছাপে পত্রিকাগুলো।

কিন্তু যেয়লা হাড় চুরি করবার পর থেকে স্যাটনরা যেসব বিপদে পড়েছেন, তার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি আজও।

ভুতুড়ে খুলি

সতেরো শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারের উত্তর

www.blogye.com

রিডিংয়ের ব্রিডলিংটন ও ড্রিফিয়েলডের মাঝামাঝি জায়গায় বিশাল এক দুর্গ-বাড়ির মালিক ছিলেন স্যর হেনরি গ্রিফিথ। তিনি মারা যাওয়ার পর পুরো সম্পত্তি পেল তাঁর তিন কন্যা। মেয়েরা ভেবে দেখল, বিশাল এলাকা নিয়ে এত্ত বড় বাড়ি তাদের ঝামেলা আরও বাড়াবে। তাই ছোট আর নতুন এক বাড়ি বানানোর পরিকল্পনা করল তারা।

বার্টন এগনেস হলের কারুকার্যখচিত প্রবেশদ্বার।

www.blogye.com

১৬২৮ সালে শেষ হল বাড়ির কাজ। বার্টন এগনেস হল নামে পরিচিতি পেল বাড়িটি। এর একটি অংশের নকশা করেন বিখ্যাত স্থপতি ইনিগো জোন্স। বাড়িটার বিশেষত্ব চোখে পড়ে ছাদের নীচের অংশে, সেখানে নিখুঁত ও মোহনীয় সব ভাস্কর্য। দেয়ালে ঝোলানো হলো শিল্পী রুবেন হানজের চিত্রকর্ম।

স্যর হেনরির মেয়েদের ভিতর সবার ছোট অ্যান।

বাড়ি তৈরির কাজ দারুণ আগ্রহ নিয়ে দেখেছে সে। যখন নতুন বাড়িতে উঠবে, তখন কী ভাবে এটাকে সাজাবে এই ভেবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত অ্যান।

বলা চলে গোড়া থেকেই নতুন বাড়ির প্রেমে পড়ে মেয়েটি।

কাজেই যেদিন বাড়ি তৈরি এবং শোভা বর্ধনের কর্মীরা জানাল তাদের কাজ শেষ, খুশি আর ধরে রাখতে পারল না সে। চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা আমাদের! ওহ, নতুন বাড়িতে উঠব আমরা!'

অ্যান মনে মনে ভাবল, বার্টন এগনেস হলে দারুণ কাটবে ওদের সময়।

নতুন বাড়িতে উঠবার পর পরই এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে দাওয়াত পেল অ্যান। একমাইল দূরের হার্পহাম হলে থাকে বান্ধবী। শুরুতে অ্যান না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, কারণ নতুন বাড়িতে অনেক কাজ, কিন্তু তার পরই ভাবল, দাওয়াতটা প্রত্যাখ্যান করবার কোনও মানেই নেই। সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হবে। তা ছাড়া, ইয়র্কশায়ারের সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি বার্টন এগনেস হলকে কী ভাবে মনের মত করে সাজাবে, তাও বান্ধবীদেরকে বলতে পারবে।

দাওয়াতের দিন বিকালে বাড়ি থেকে রওনা হলো সে। বেরুবার সময় দুই বোন পই-পই করে সাবধান করে দিল।

'তোমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে,' একজন বলল, 'এদিকের রাস্তাগুলো মোটেই নিরাপদ নয়।

'তুমি তো জানো, শহরতলীতে বাজে লোক ঘুরে বেড়ায়.'

www.blogye.com

বলল আরেক বোন, 'নিঃসঙ্গ অনেক পথচারী লুঠেরাদের হামলার মুখে পড়েছে, এমন খবরও এসেছে আমাদের কানে।'

'ভয়ের কিছু নেই।' তাদের কথা যেন হেসেই উড়িয়ে দিল আনন্দে টগবগ করতে থাকা অ্যান, 'আমার সঙ্গে প্যাচ যাচ্ছে। ও বদ লোকদেরকে ভড়কে দিতে পারবে। এই এলাকার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কুকুর ও।'

'ও সবচেয়ে ভদ্র ও বিনয়ী,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল প্রথম বোন। 'তোমার একা যাওয়াটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার। সঙ্গে কোনও চাকরকে নিচ্ছ না কেন?'

'এখন বাড়িতে অনেক কাজ— আসবাবপত্র সাজানো, ছবি ঠিকঠাক করা... এসব কাজেই ব্যস্ত থাকুক ওরা।' অধৈর্য হয়ে বলল অ্যান, 'আমি ঠিকই থাকব। এত্তটুকুই তো পথ। মিনিট পনেরোর ভিতর ওখানে পৌঁছে যাব।'

হালকা হলদে-বাদামী পোশাকে অ্যানকে লাগছে পরীর মত সুন্দরী। কাপড়ে ঢেউ তুলে বোনদের কথার থোড়াই কেয়ার না করেই রওনা হলো অবুঝ মেয়েটা। ওর পায়ে পায়ে চলল কুকুরটা।

কোনও ঝামেলা ছাড়াই অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এল ওরা।

বসন্তের আদুরে রোদ ও তাজা বাতাস দারুণ লাগছে অ্যানের।

এসময়ই দুজন লোক বেরিয়ে এল একটা গাছের আড়াল থেকে। আর এসে দাঁড়াল ঠিক তার চলার পথে।

রাস্তাটা এত সরু যে এদেরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কঠিন অ্যানের জন্য।

'দয়া করে আমার কথা একটু শুনবে, ম্যাম,' বলল একজন।

তার কণ্ঠে বিনয় যেন গলে পড়ছে, কিন্তু চাহনিটা অশুভ।

'তোমরা কী চাও?'

'দুই দরিদ্র পথচারীকে সামান্য সাহায্য করবে?'

www.blogye.com

'সাহায্য করবার কোনও আগ্রহ নেই আমার,' চাপা কণ্ঠে বলল অ্যান, 'তা ছাড়া, আমার কাছে কোনও টাকাও নেই। এখন ভদ্রলোকের মত পথ ছেড়ে দাও, আমি নিজ পথে চলে যাই।'

এবার অপর লোকটা বলল, 'কিন্তু ম্যাম, তোমার আঙুলে চমৎকার আংটি দেখছি। ওটা মোটা অঙ্কে বিকোবে।'

রাগে জ্বলে উঠল অ্যানের চোখ। 'এটা আমার মায়ের স্মৃতি। কোনওভাবেই আংটি তোমাদের দেব না। তাড়াতাড়ি পথ ছাড়ো!'

এবার ভদ্রতার মুখোশ পুরোপুরি খুলে ফেলল দুই লুঠেরা।

'ওটা তোমার মায়ের না ফুপুর, তা জানি না। কিন্তু ওই আংটি আমাদের চাই,' কর্কশ কণ্ঠে বলল দ্বিতীয় লোকটা।

লোকদুটো অ্যানের দিকে এগিয়ে এল। ওদের ময়লা, খোঁচা-খোঁচা দাড়িভরা মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল মেয়েটা।

লোকগুলোর কাপড় কতদিন না ধোয়া কে জানে!

বোটকা গন্ধ এসে লাগল অ্যানের নাকে।

প্রথমবারের মত ভয় পেল তরুণী মেয়েটা।

'আমি আমার কুকুরটাকে লেলিয়ে দেব।' আতংক চেপে বলল, 'প্যাচ, ধর্! আচ্ছামত কামড়ে দে!'

দু'জনের একজনের কাছে দৌড়ে গেল কুকুরটা। আর তখনই তার সামনে একটা লাঠি রাখল লোকটা। গলা ফাটিয়ে চেঁচাবার ফাঁকে লেজ নাড়তে শুরু করেছে বেকুব কুকুর। ছোটাছুটি করে খেলবার জন্য তৈরি।

কুকুরকে বশ করে কুৎসিতভাবে হেসে উঠল ডাকাতটা। লাঠিটা অবজ্ঞার সঙ্গে জংলা একজায়গার উপর দিয়ে মাঠের দিকে ছুঁড়ে মারল। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সরল-সিধা কুকুর। এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ছুট লাগাল লাঠির পিছনে।

'তোমার হিংস্র, সাহসী কুকুরের জন্য ওটাই যথেষ্ট।' বিদ্রূপ ঝরল লোকটার কণ্ঠে, 'এবার লক্ষী মেয়ের মত আংটি দিয়ে দাও।'

www.blogye.com

'না!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যান।

হঠাৎই তার গায়ের উপর এসে পড়ল লোকদুটো।

একজন কবজি আঁকড়ে ধরল অ্যানের। ছাড়া পাওয়ার জন্য প্রাণপণ লড়তে চাইছে মেয়েটি। হঠাৎ হাতটা ছুটিয়ে নিয়েই নেমে যাওয়া মেঠো পথ ধরে ঝেড়ে দৌড় দিল ও।

ওর পিছনে জানোয়ারের মত তাড়া করল লোক দুজন।

ঘাড়ে যেন তাদের নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে অসহায় মেয়েটা। আধো ঘুরে দেখল একজন তুলছে ভারি একটা মুগুর। পরমুহূর্তে অসহ্য একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল ওর মাথায়।

তারপর সব আঁধার।

এদিকে হার্পহাম হলে অ্যানের বন্ধুরা তাকে না দেখে চিন্তায় পড়ে গেল। একপর্যায়ে তারা অনুমান করল অ্যান গ্রিফিথের খারাপ কিছু হয়েছে।

অনুসন্ধানী দল পাঠানো হল হার্পহাম হল থেকে অ্যানের বাড়ির দিকে।

অ্যান যেখানে পড়েছিল, সেখানেই তাকে পেল তারা।

রক্ত ও ধুলোয় মাখামাখি হয়ে আছে ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েটি। কয়েক ফুট দূরেই বসে আছে কুকুর জাতির কলঙ্ক প্যাচ, বিস্মিত ও ব্যথামাখা দৃষ্টিতে মনিবকে দেখছে প্রাণীটা।

উদ্ধারকারীরা যখন অ্যানকে আবিষ্কার করল, তখন তার জ্ঞান ছিল। ওকে হার্পহাম হলে নিয়ে যাওয়া হলো। একজন ডাক্তার এলেন। রোগিণীকে দেখে হতাশার সঙ্গে মাথা নাড়লেন। 'আঘাতটা মারাত্মক। আমার ধারণা ওর পরিণতি নিশ্চিত হয়ে গেছে।'

'আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে,' কোনওমতে বলল অ্যান, 'প্লিজ... প্লিজ... আমাকে বাড়ি নিয়ে যাও। যদি মরতেই হয়, তো আমার প্রিয় বাড়িতে মরতে চাই।'

চিকিৎসক মাথা ঝাঁকালেন। 'ও কোথায় থাকবে তাতে আর

www.blogye.com

কিছু যায় আসে না।' অ্যানের বন্ধুদের বললেন তিনি, 'যদি নিজ বাড়িতে যেতে চায়, ওকে পৌঁছে দেয়া উচিত। এর বেশি ওর জন্য আর কীই-বা করতে পারি আমরা?'

কাজেই দেরি না করে বার্টন অ্যাগনেস হলে ফিরিয়ে আনা হলো অ্যানকে। গুরুতর আঘাত নিয়ে আরও পাঁচদিন টিকে রইল সে। বেশিরভাগ সময় জ্ঞান থাকল না। ধীরে ধীরে আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। মৃত্যুর আগে কথা বলল। সম্ভবত প্রবল ইচ্ছাশক্তির কারণেই পারল।

দুর্ভাগা মেয়েটার উপর ঝুঁকে পড়ল দুই বোন, যেন ফিসফিস করা প্রতিটি কথা শুনতে পায়।

'তোমাদেরকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে,' বলল অ্যান, 'জানি খুব শীঘ্রি মারা যাচ্ছি। মৃত্যুর পর আমার শরীর কবর দেয়া হলেও মাথাটাকে এই বাড়িতে রেখে দেবে। আমি আমার প্রিয় বাড়িতে না থাকলে মরেও শান্তি পাব না। পৃথিবীর আর সবকিছুর চেয়ে এ বাড়িকে সবচেয়ে ভালবেসেছি। আমি এখানে থাকতে চাই। তোমরা প্রতিজ্ঞা করো, আমার দেহ যেখানে যাক, মাথাটা এখানেই...'

দুর্বল একটা হাত তুলল অ্যান। তারপর আবারও বলল, 'আর যদি তা না করো, সারাজীবন তোমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াবে আমার আত্মা। এই বাড়িতে কেউ থাকতে পারবে না।'

অ্যানের দুই বোন একে-অন্যের দিকে তাকাল।

দুজনের মাথাতে একই চিন্তা।

অ্যান জানে না কী বলছে, আসলে প্রচণ্ড জ্বরে প্রলাপ বকছে।

এখন তাদের কর্তব্য: যা বলছে তা মেনে ছোট বোনকে শান্তিতে বিদায় নিতে দেওয়া।

'ঠিক আছে আমরা কথা দিলাম,' একসঙ্গে বলল দুজন।

এত যন্ত্রণার মধ্যেও মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল অ্যানের।

তবে স্বাভাবিকভাবেই অ্যান মারা যাওয়ার পর ওর শেষ কথা

www.blogye.com

কিংবা নিজেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার কোনও আগ্রহ দেখাল না বড় দুই বোন।

কে শুনেছে, কেউ মরবার পর তার খুলি বাড়িতে রাখতে হবে!

পারিবারিক সমাধিতে বাবা-মা'র পাশেই সমাধিস্থ হলো মেয়েটা।

অ্যানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কয়েকদিন পরের কথা।

বড় বোন মিস গ্রিফিথ তার ডেস্কে বসে চিঠি লিখছে।

এসময় হঠাৎ উপরে নিজের শোবার ঘরে প্রচণ্ড এক শব্দ শুনল। মনে হয় যেন কোনও আসবাবপত্র পড়ে গেছে। 'বাড়ির চাকরগুলো করছেটা কী?' বিস্মিত গলায় কথাগুলো বলে কলমটা রেখে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে।

কিন্তু উপরে উঠে অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। ঘরে কেউ নেই, এমন কী আসবাবপত্রগুলোও নিজ জায়গায় আছে। নিশ্চিত হতে উপরতলার প্রতিটি কামরা পরীক্ষা করে দেখল সে। কিন্তু কোনও অস্বাভাবিকতা নজরে পড়ল না। বাড়ির চাকর-বাকর সবাই নীচতলায় যে যার কাজ করছে।

গ্রিফিথ নিজ চোখেই তো দেখল, রক্ত-মাংসের কোনও প্রাণী নেই। বেশ অবাক হয়ে নেমে এসে বোনকে খুঁজে বের করে অদ্ভুত ঘটনাটা বলল সে।

পরের রাতে একটার পর একটা কান ফাটানো শব্দে বাড়ির প্রতিটি জনপ্রাণী জেগে উঠল। দড়াম করে কে যেন খুলে বন্ধ করছে দরজাগুলো। ঠক-ঠক ও জোরে ঘা পড়বার আওয়াজ, অনবরত ঘণ্টা বাজছে, কী যেন ধুপধাপ পড়ছে।

আওয়াজে প্রকম্পিত হতে লাগল গোটা বাড়ি। তারপর শোনা গেল ভয়াবহ এক গোঙানি। মনে হচ্ছে যেন বাড়ির প্রতিটি অংশ থেকে উঠে আসছে ওই আওয়াজ।

আতংকিত দুই বোন ও বাড়ির কাজের লোকেরা তন্ন তন্ন করে খুঁজল সব জায়গা।

www.blogye.com

বার্টন এগনেস হল।

কিন্তু শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পেল না। যে কামরায় ঢুকছে, দেখছে তা একেবারেই সুনসান। কিন্তু বেরিয়ে আসবার পর ওই একই কামরা থেকে ভেসে আসছে নানান বিকট আওয়াজ।

বার্টন এগনেস হলের উপর যখন দিনের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ল, তখন থামল আওয়াজ। নীচতলার একটা কামরায় গাদাগাদি করে বসে থাকা দুই বোন ও চাকর-বাকরদের আতংক ধীরে ধীরে দূর হলো। ওদের সবার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসও অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। পিছন পিছন কিছু আসছে কি না বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে নিজেদের কামরায় ফিরল সবাই।

কোনও উপদ্রব ছাড়াই সকাল পেরুল।

নাস্তার সময় দুই বোন একে অপরের মুখোমুখি বসল। সারারাতের অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা ও আতংকে দুজনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'তুমি বুঝেছ কেন এমন ভয়ংকর সব শব্দ আমাদেরকে তাড়া

www.blogye.com

করছে?'

একজন বলতে না বলতে অপরজন বলল, 'হ্যাঁ। অ্যানের আত্মা আমাদেরকে শাস্তি দিতে ফিরেছে।'

'ও বলেছিল, ওর মাথা এখানে না রাখলে বাড়িটা বাসের অযোগ্য করে তুলবে।'

'আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি।'

'কিন্তু অ্যান ঠিকই রেখেছে।'

বড়বোন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আজই গির্জার যাজকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি আমাদেরকে ঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।'

গির্জায় যাওয়ার পর যাজক পুরো ঘটনাটি শুনলেন। তিনি যা বললেন, তা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

'তোমাদের অবশ্যই অ্যানের সমাধি খুঁড়তে হবে,' বললেন তিনি, 'ওর খুলি বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তবেই কেবল এই ভুতুড়ে আওয়াজ থেকে রেহাই মিলবে।'

যাজকের নির্দেশের পর দেরি করল না দুই বোন।

সেদিনই গোর খোদকরা ব্যস্ত হয়ে কবর খুঁড়ল।

পারিবারিক সমাধি খুঁড়ে অ্যানের কফিনের ডালা তোলা হলো, দেখা গেল লাশ মোটামুটি অক্ষত। কিন্তু কী ভাবে যেন ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেছে মাথাটা, ইতিমধ্যে গলে গেছে মাংস-চামড়া, পরিণত হয়েছে করোটিতে।

অথচ কেবল ক'দিন আগেই মেয়েটাকে গোর দেয়া হয়েছে।

তার প্রিয় বাড়িতে আবারও আনা হলো অ্যানের খুলিটাকে। মখমল কাপড়ে মোড়া এক বাক্সে যত্ন করে পুরে ওর শোবার ঘরে এক টেবিলের উপর রাখা হলো। দোর লাগিয়ে বাড়ির সবাইকে ওই কামরায় ঢুকতে নিষেধ করে দেয়া হলো।

যতই দিন গড়াতে লাগল ওই কামরার ভিতর ধুলোবালির পরত বাড়ল। মাকড়সারা মনের সুখে জাল বুনল আসবাবপত্র ও

www.blogye.com

পর্দার উপর।

এদিকে ধীরে ধীরে অ্যানের মর্মান্তিক মৃত্যুর শোকও কাটিয়ে উঠল তার বড় দুই বোন।

বাড়ির সবকিছু আবারও স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

কয়েক বছর পরের ঘটনা।

নতুন এক মেয়েকে কাজে নেয়া হয়েছে বার্টন এগনেস হলে। অ্যান গ্রিফিথের কাহিনি জানবার সুযোগ হয়নি তার। তবে বন্ধ কামরা দেখে বেশ কৌতূহল জাগল মেয়েটার। একটু খোঁজাখুঁজি করে ওই ঘরের চাবিও যোগাড় করে ফেলল।

ঘরে ঢুকে টক-বাসি গন্ধে নাক কুঁচকে গেল তার। কামরা জুড়ে পুরু হয়ে জমা ধুলোর স্তর দেখে চোখ কপালে উঠল তার। ভাবল, এই বাসার লোকগুলো আচ্ছা খবিস!

এমন সুন্দর কামরাকে এমন করে রাখে কেউ!

'হুঁ, এ কামরাকে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে,' আপন মনেই বিড়বিড় করল সে।

জানালার দিকে গিয়ে ফ্যাকাসে, ধুলোয়-ধূসরিত পর্দা এক পাশে সরিয়ে দিল। এসময় টেবিলের উপর রাখা কাঠের বাক্সের দিকে নজর গেল তার। ভিতরে খুলি দেখে মেজাজ আরও খাপ্পা হয়ে গেল তার। এ বাড়ির লোকের প্রতি ভক্তি কমল।

'ওহ্, কী ময়লা আবর্জনা,' রোষের সঙ্গে বলল, 'এটা এখানে কী করছে? আমি এটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলব!'

বোকা মেয়ের একবারও মনে হলো না, কেউ বিনা কারণে ঘরের ভিতর মড়ার খুলি রাখে না।

বহুদিন হাত না পড়া জানালা খুলতে যেতেই ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজে প্রতিবাদ করে উঠল কবাট। তবে একটু জোরাজুরি করতেই খুলে গেল। খুলিটা তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল অপরিণামদর্শী মেয়েটা। আশা করেছিল নীচের নরম মাটিতে গিয়ে পড়বে ভয়ঙ্কর খুলিটা।

www.blogye.com

কিন্তু যতটা জোরে ছুঁড়ে দেয়ার দরকার, তার চেয়ে জোরেই ছুঁড়েছে সে।

ঠিক তখন আস্তাবলের দিকে চলেছে খড় বোঝাই এক ঘোড়ার গাড়ি।

পড়বি তো পড়, খুলি গিয়ে পড়ল একেবারে গাড়ির উপর।

বেরিয়ে আসা চিৎকার থামাতে মুখে হাত চাপা দিল মেয়েটা।

খুলিটা খড়ের বোঝার উপর পড়তেই গাড়িটা থেমে গেছে।

ঘোড়া ও চালক দুজনেই বরফের মূর্তির মত জমে গেছে। যেন দেহে প্রাণ নেই, মার্বেল পাথরের দুই ভাস্কর্য।

চালকের এক হাত লাগামের উপর, অন্য হাত শূন্যে স্থিরভাবে ঝুলছে। এদিকে সামনে এগুনোর ভঙ্গিতে ঘোড়া এক পা উপরে তুলে ছিল, সেখানেই থমকে গেছে।

খুলির শূন্য কোটর যেন অনেক দিন পর বাইরের দুনিয়ার রূপ-রস উপভোগ করছে, আর হলুদ দাঁতগুলো ভেংচি কাটছে।

চাকর মেয়েটা নিজ চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ওহ! ওদের জাদু টোনা করেছে,' আতংকে ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বরে বলল সে, 'ভয়ংকর, অশুভ কিছু ঘটেছে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উড়ে নেমে এল সে। হলে দেখা হয়ে গেল হাউসকিপারের সঙ্গে।

'ওহ্, ম্যাডাম! তাড়াতাড়ি আসুন।' ভয় ও উত্তেজনায় তোতলাতে শুরু করল সে। 'আমি... বন্ধ ঘরে ছিলাম... ওই খুলি... ওটা স্যাম কান্ট আর ঘোড়াটাকে জাদু করেছে... এটা কী করলাম আমি... খুলিটা...'

'কী হয়েছে?' বিস্ময় প্রকাশ করল হাউসকিপার। 'কী বলতে চাইছ?'

ততক্ষণে মেয়েটা বুঝেছে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি বোঝাতে পারবে না।

হাউসকিপার মহিলাকে টেনে সদর দরজা দিয়ে বের করে

www.blogye.com

আনল সে। তারপর বাড়ির বামপাশের কোনা ঘুরে ওদিকে চলে গেল। 'দেখুন!' কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল।

যেন হঠাৎ রক্ত সরে সাদা হয়ে গেল হাউসকিপারের মুখ।

'হায় ইশ্বর!' ফিসফিস করে বলল, 'এখন কী হবে?'

এ সময় পিছনে বাড়ির দিক থেকে প্রচণ্ড শব্দ ভেসে এল। প্রথমে মনে হলো প্রচণ্ড দমকা বাতাস বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে। দড়াম দড়াম করে খুলছে বন্ধ হচ্ছে সমস্ত দরজা।

তারপরই এ শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল কলজে পানি করা এক চিৎকার। ওটা এতই ভয়ঙ্কর, বাইরে দাঁড়ানো ওদের রক্ত যেন জমে গেল। কী করবে বুঝতে না পেরে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল দুজন। পা কাঁপছে থর থর করে, মুখ ছাইবর্ণ।

অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পর বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে ঘোড়ার গাড়ির কাছে চলে এল হাউসকিপার। খুলি যেখানে আছে কষ্টে-সৃষ্টে সেখানে টেনে আনল শরীরটা। দুই চোখ বন্ধ করে, মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে অ্যান গ্রিফিথের বরফ শীতল খুলি স্পর্শ করল মহিলা।

এদিকে বাড়ির ভিতরের চিৎকার এবং শব্দ আরও বিকট হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে একটার পর একটা বাজ পড়ছে ভিতরে।

অথচ আকাশে মেঘের ছিঁটেফোঁটা নেই।

জানালায় চাকর-বাকরদের ভীত, পাণ্ডুর মুখ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত সাহস এক করে খড়ের উপর থেকে খুলি তুলে নিল হাউসকিপার। এমনভাবে সামনে বাড়িয়ে রাখল, যেন শরীরের কোথাও স্পর্শ না লাগে।

গাড়ি থেকে নেমে এসে খুব ধীরে আতংকিতভাবে হাঁটছে সে, যেন ঘুমের ঘোরে।

ওটাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনল সে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওই কামরায় চলে এল।

যেখানে খুলিটা ছিল, সেখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে।

www.blogye.com

খুব সাবধানে মখমল জড়ানো বাক্সে রাখল ওটাকে সে। তারপর ঘোরের মধ্যেই যেন কামরা থেকে বেরিয়ে এল, বন্ধ করে দিল দরজাটা। পর মুহূর্তে সিঁড়ির সামনে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

আর যে মুহূর্তে খুলি তার প্রিয় বাড়ি খুঁজে পেল, সে মুহূর্তে থেমে গেল সমস্ত শব্দ।

বাইরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়া তার সামনের পা মাটিতে নামিয়ে আনল। চালকের শূন্যে ভেসে থাকা হাতটাও স্বাভাবিকভাবে নেমে এল। বুড়ো স্যাম কাণ্ট ফ্যালফ্যাল করে চারপাশে চাইল একবার। তারপর বিমূঢ় দৃষ্টিতে মাথা ঝাঁকিয়ে আস্তাবলের দিকে নিয়ে চলল গাড়িটা।

এদিকে প্রচণ্ড শব্দের পর আকস্মিক নীরবতাকে যেন কান ফাটানো শব্দের মতই ভুতুড়ে ও গা শিউরানো মনে হলো সবার।

বার্টন এগনেস হলের জীবন আবারও স্বাভাবিক নিয়মে চলতে লাগল।

একপর্যায়ে বাড়ির একটা দেয়ালের ইট খুলে ভিতরে পাকাপাকি ভাবে ঢুকিয়ে রাখা হলো খুলিটাকে।

এখন কেউ জানে না ঠিক কোথায় আছে ওটা, কাজেই আবারও বিরক্ত করে জাগিয়ে দেবে, সে আশংকা কমে গেল অনেকখানি।

এভাবেই শান্ত হল অ্যান গ্রিফিথের ভূত।

কিন্তু এখনও প্রিয় বাড়িতে হানা দেয় সে।

উজ্জ্বল বসন্তের দিনে বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়ার দৃশ্য আবারও মঞ্চস্থ হতে দেখে চমকে ওঠেন অনেকেই।

কেউ ক্রুস আঁকেন বুকে। হালকা হলুদ বাদামি পোশাকের ছোটখাট, চিকন এক মেয়েকে বাগানের ভিতর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখেন কেউ কেউ। বাড়ির সদর দরজার সামনে এসেই ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে যায় যে।

www.blogye.com

অ্যান গ্রিফিথ যখন বেঁচে ছিল, তার নতুন বাড়িকে ভারি ভালবাসত সে। সাড়ে তিন শ' বছর পেরুলেও এখনও সে আগের মতই ভালবাসে বার্টন এগনেস হলকে।

এর ভিতর অনেক পরিবারই থেকেছেন ওই বাড়িতে, অনেকে এখানে মারাও গেছেন, কেউ কেউ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁদের কারও কথাই মনে নেই কারও।

কিন্তু অ্যান গ্রিফিথ এখনও আছে।

বার্টন এগনেস হল যতদিন থাকবে, ততদিন তার গল্পও কখনও পুরনো হবে না।

অভিশপ্ত হীরা

কিংবদন্তী অনুসারে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান রত্নের একটি নীল হোপ ডায়মণ্ড বয়ে বেড়াচ্ছে ভয়ঙ্কর এক অভিশাপ আর তাই পৃথিবীর নানা প্রান্তে যেখানেই সে গেছে, রেখেছে মন্দ ভাগ্য ও হিমশীতল মৃত্যুর পদচিহ্ন।

হোপ ডায়মণ্ড কি আসলেই অভিশপ্ত, নাকি এসব নিছকই গালগপ্পো?

সে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আপনার।

তবে তার আগে অভিশপ্ত হীরা এই লেখাটি একবার পড়তে ভুলবেন না যেন।

কাহিনির যখন শুরু, তখন হোপ ডায়মণ্ড ছিল ওয়ালনাটের সমান ১১৫ ক্যারেটের বিশালাকৃতি এক হীরা। ওটা সম্ভবত উত্তোলন করা হয়েছিল ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের গান্তার দিয়াল জেলার 'কয়লা' খনি থেকে। জনশ্রুতি আছে, পরাক্রমশালী এক

www.blogye.com

হিন্দু দেবী মূর্তির দু' চোখের একটিতে বসানো ছিল ওই হীরা।

তারপরই একদিন ভারত ভ্রমণে এল তাভেরনিয়ার নামের এক ফরাসী স্বর্ণকার। দেবীর চোখে হীরা দেখেই মাথা খারাপ হয়ে গেল তার। স্থির করে ফেলল, যেভাবে হোক ওটা হাতাতে হবে। এক পর্যায়ে সবার অলক্ষে হীরা চুরি করে পালিয়েও গেল তাভেরনিয়ার।

এদিকে মন্দিরের পুরোহিতরা যখন বুঝলেন খোয়া গেছে দেবীর চোখের হীরা, অভিশাপ দিলেন তাঁরা।

ভয়ঙ্কর এক অভিশাপ— ওই হীরা যার কাছে থাকবে, সে এবং তার আশপাশের সবাই পড়বে মন্দ ভাগ্যের কবলে, আসবে একের পর এক মৃত্যু।

যে ওটা স্পর্শ করবে, সে হবে হতভাগ্য।

তাভেরনিয়ার হীরা চুরি করে সম্ভবত ১৬৪২ সালে। কী অভিশপ্ত জিনিস বয়ে বেড়াচ্ছে, গোড়ার দিকে টেরও পেল না লোকটা। ফ্রান্সে ফিরল কোনও দুর্বিপাক ছাড়াই। আরও ৪৪টি বড় এবং ১,১১২টি ছোট হীরার সঙ্গে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে দিল হোপ ডায়মণ্ড ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের কাছে।

তারপর টাকা-পয়সা নিয়ে রওনা হলো রাশার উদ্দেশে। কেন ওদিকে গেল, নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হয়তো ওখানেও মূল্যবান কোনও রত্নের খোঁজ পেয়েছিল। কিন্তু ততদিনে কাজ শুরু করেছে ভয়ঙ্কর অভিশাপ পথেই প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলো তাভেরনিয়ার। কয়েকদিনের মধ্যে মারা গেল ওই জ্বরেই। এখানেই শেষ নয়, উদ্ধার করা সম্ভব হলো না তার মৃতদেহ গোটা দেহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলেছে হিংস্র নেকড়ের পাল।

এভাবেই শুরু হলো অভিশপ্ত এক রক্তাক্ত ইতিহাস।

এদিকে তাভেরনিয়ারের কাছ থেকে যখন হীরা কিনলেন রাজা চতুর্দশ লুই, তখন ওটা আকৃতিতে বিশাল হলেও তত নিঁখুত ছিল

www.blogye.com

তাভেরনিয়ারের হীরা। ১১৫ ক্যারেট।

চতুর্দশ লুইয়ের ফ্রেঞ্চ ব্লু। ৬৯ ক্যারেট।

না। তাই সম্রাটের নির্দেশে হীরা কেটে নিঁখুত করা হলো।

১৬৭২ সালের ঘটনা।

নতুন কাটা রত্ন হলো ৬৯ ক্যারেট। ফরাসী রাজ পরিবারে এর পরিচয় ছিল: 'ফ্রেঞ্চ ব্লু'।

www.blogye.com

চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর রত্নটি এল পঞ্চদশ লুইয়ের হাতে। তাঁর মৃত্যুর পর ওই হীরা এল ষষ্ঠদশ লুই এবং তাঁর স্ত্রী মেরী আঁতোয়ানেত'র কাছে। আর তাঁদের হাতে আসতেই আবারও সেই পুরনো অভিশপ্ত খেলা শুরু করল নীল হীরা।

ইভালিন ম্যাকনিলের হোপ ডায়মন্ড। ৪৫.৫২ ক্যারেট।

ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রথমে কারারুদ্ধ এবং পরে শিরচ্ছেদ করা হলো ষষ্ঠদশ লুই ও তাঁর স্ত্রী মেরী আঁতোয়ানেতের।

অনেকের ধারণা হোপ ডায়মণ্ডের অভিশাপেই এমন করুণ পরিণতি হয়েছে ষষ্ঠদশ লুই ও তাঁর রাণীর।

হোপ ডায়মণ্ডসহ সমস্ত রাজকীয় রত্ন আটক করল নতুন সরকার। কিন্তু সেখান থেকে চুরি গেল রত্নগুলো। এর বেশিরভাগই পরে খুঁজে পেলেও হোপ ডায়মণ্ড উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি ফরাসীদের পক্ষে।

উনিশ শতকে ইংল্যাণ্ডে আসবার আগে অনেকের দখলে ছিল হোপ ডায়মণ্ড। তাঁদের কেউ যেমন একে ধরে রাখতে পারেননি, তেমনি রেহাই পাননি এর সর্বনাশা প্রভাব থেকে। হীরার মায়া

www.blogye.com

কাটাতে না পেরে মরলেন উইলহেম ফলস, হীরাটা চুরি করার সময় তাঁর ছেলে হেনড্রিক ফলস তাঁকে খুন করল।

পরে হেনড্রিক নিজেও আত্মহত্যা করল।

একসময় ওই হীরার মালিক হন সাইমন ফ্রাঙ্কেট। তারপরই চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েন তিনি। সাইমন যাঁর কাছ থেকে ওটা কিনেছিলেন, সেই জ্যাক কলট করেন আত্মহত্যা। সাইমনের হাত ঘুরে হোপ ডায়মণ্ড এল রাশান যুবরাজ কাতিন নউস্কির হাতে। ধারণা করা হয়, তিনি এটা ধার দিয়েছিলেন ফরাসী বান্ধবী লরেন্স ল্যাদুকে। তারপরই প্রিয় বান্ধবীকে গুলি করে মারলেন যুবরাজ। তবে রেহাই পেলেন না নিজেও। খুন হলেন বিপ্লবীদের হাতে।

অভিশপ্ত হীরার পরবর্তী বলি স্বর্ণকার সাইমন মনদারিডেজ। সপরিবারে হত্যা করা হলো তাঁকে।

অনুমান করা হয়, এই হীরার কারণেই সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হন তুরস্কের অধিপতি আব্দুল হামিদ, এর আগে হোপ ডায়মণ্ডের জন্য সম্রাট হত্যা করেন তাঁর অনেক সভাসদকে।

এরপর অনেকদিন খবর ছিল না হোপ ডায়মণ্ডের। তারপর হঠাৎই করেই বিশাল আকারের একটা ব্লু ডায়মণ্ডের খোঁজ মিলল ইংল্যাণ্ডে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, ৪৫.৫ ক্যারেটের এই পাথরটি সেই 'ফ্রেঞ্চ ব্লু'-র খণ্ডিত রূপ।

১৮৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত হোপ পরিবারের এক সদস্য কিনে নিলেন রত্নটি। তখন থেকেই এর নাম হলো হোপ ডায়মণ্ড। দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়ল না হোপদের। পারিবারিক সূত্রে ওই হীরার মালিক হওয়ার পরই লর্ড ফ্রান্সিস হোপকে ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর স্ত্রী। আর দেনার ভারে জর্জরিত হয়ে এক পর্যায়ে ওই হীরা বিক্রি করতে বাধ্য হলেন লর্ড ফ্রান্সিস। তবে হোপদের ছেড়ে গেলেও তাঁদের নাম এখনও বহন করে চলেছে ওই হীরা।

কয়েক বছর বাদে ওই হীরা কিনে নিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী

www.blogye.com

পিয়েরে কার্টিয়ার। কার্টিয়ার এটা নিজের জন্য কেনেননি, বরং ওটা বিক্রি করে টাকা কামানোই তাঁর উদ্দেশ্য। কার্টিয়ার জানেন, কোটিপতি এভালিন ম্যাকলিন রত্ন ভালবাসেন, আর যেসব রত্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মন্দ ভাগ্য ও অভিশাপ, সেগুলো সংগ্রহ করবার ইচ্ছা তাঁর দুর্বার। অতএব রসিয়ে রসিয়ে হোপ ডায়মণ্ডের অভিশাপের কাহিনি তাঁকে শোনালেন কার্টিয়ার।

এভলিন ওই গল্প শুনলেন, সে সঙ্গে গিললেন টোপ। চড়া দামে কিনলেন হীরাটা। কিন্তু যে অভিশাপের কথা শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে কিনলেন, তা রেহাই দিল না তাঁকেও। অকালে মরল তাঁর দুই সন্তান। ছেলেটা মারা গেল মাত্র ৯ বছর বয়সে, গাড়ি দুর্ঘটনায়। এবং মাত্র ২৫ বছর বয়সে আত্মহত্যা করল সুন্দরী মেয়েটা। মানসিকভাব. অসুস্থ হয়ে পড়লেন এভলিনের স্বামী। এবং প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কটে পড়লেন কোটিপতি এভলিন।

১৯৫৮ সালে ওই হীরা কেনেন জেমস টড নামের এক ভদ্রলোক। তবে কিনবার পর এর কীর্তি কাহিনি শুনে সাহস রাখতে পারলেন না টড। দান করে দিলেন ওয়াশিংটন ডি.সি.র স্মিথসনিয়ান ইন্সটিটিউটে। এখন ওটা ওখানেই। তবে এতেও শেষ রক্ষা হলো না। একবছরের মধ্যে মারা গেলেন টডের স্ত্রী, আর আগুনে পুড়ে গেল তাঁর বাড়িটা।

হোপ ডায়মণ্ড অভিশপ্ত মানতে একেবরেই নারাজ 'হোপ ডায়মণ্ড: দ্য লিজেণ্ডারি হিস্টরি অভ আ কার্সড্ জেম' বই-এর লেখক রিচার্ড কারিন।

এদিকে তাভেরনিয়ার সত্যি হীরাটা দেবীর চোখ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন কি না, তা নিয়েও আছে বিস্তর মতভেদ।

কোনও কোনও সূত্রের দাবী: বুড়ো হয়ে চুরাশি বছর বয়সে রাশায় মারা গেছে তাভেরনিয়ার।

আবার ষষ্ঠদশ লুই হীরার অশুভ প্রভাবের শিকার হলেও

www.blogye.com

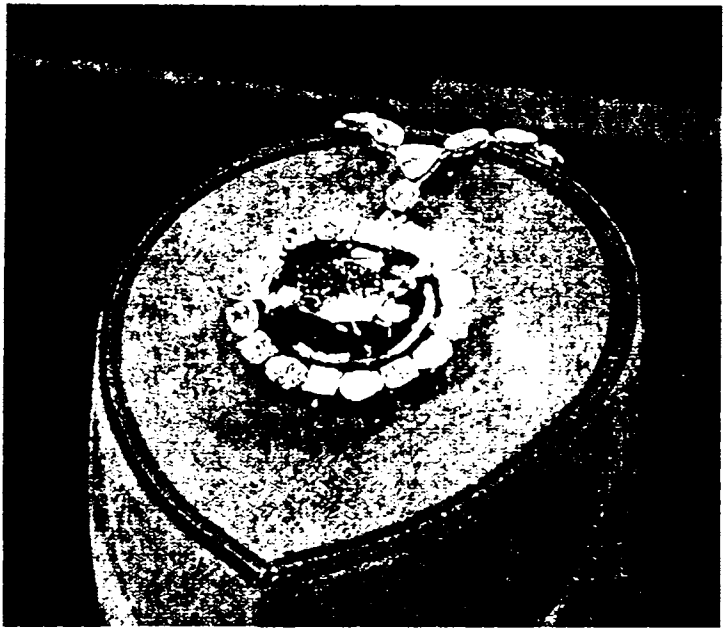

স্মিথসনিয়ান মিউজিয়ামে হোপ ডায়মন্ড।

চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ লুই-এর ক্ষতি কেন করল না হোপ ডায়মণ্ড, তাও এক প্রশ্ন।

চতুর্দশ লুই তো প্রায়ই রিবনে ঝুলিয়ে গলায় পরে থাকতেন ওই হীরা।

এদিকে ষষ্ঠদশ লুই-এর হাতছাড়া হওয়ার পর ফ্রান্স থেকে চুরি যাওয়া এবং ইংল্যাণ্ডে পৌঁছবার মাঝে যেসব মানুষ এর অভিশাপের শিকার হয়েছেন বলা হয়েছে, ইতিহাস তাঁদের অনেকের অস্তিত্বও স্বীকার করে না।

কেউ কেউ এ-ও দাবী করেছেন, হোপ ডায়মণ্ডকে ঘিরে জন্ম নেয়া ঘটনাগুলো নিছক কাকতালীয় বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু এতগুলো কাকতালীয় ঘটনা কি ঘটা সম্ভব?

www.blogye.com

মমি ভয়ংকর

ইলিয়ট ও'ডনেল তাঁর বিখ্যাত এক বইয়ে এই কাহিনিটি লিখেছেন। সেবার ফ্রান্সের প্যারিসে ফরাসী এক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। ভদ্রলোক তখন সবে প্রাচ্য থেকে এসেছেন।

ও'ডনেল জানতে চাইলেন, 'সেখান থেকে ফুলদানি, মন্ত্রপূত কবচ, শবভস্ম রাখবার পাত্র, এসব কিউরিও এনেছেন?'

'হ্যাঁ, প্রচুর,' বললেন ভদ্রলোক, 'পুরো দুই বাক্স। তবে তার ভিতর কোনও মমি নেই। নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, কেন? আপনার যদি শুনবার ধৈর্য থাকে, সেক্ষেত্রে বলতে পারি রোমাঞ্চকর একটা কাহিনি।'

ভদ্রলোকের সে বর্ণনা তুলে ধরছি এখানে:

'কয়েক বছর আগে নীলের উজানে অ্যাসিউট পর্যন্ত যাওয়ার সৌভাগ্য হয় আমার। তখনই থিবেসের রাজকীয় ধবংসাবশেষে গেলাম। আরও নানারকম অ্যান্টিকের সঙ্গে সেখান থেকে কিনলাম একটা মমিও। ঢাকনি ছাড়া বিশাল এক শবাধারের ভিতর ছিল ওটা। পাশেই ছিল শেয়াল দেবতা অনুবিসের ভাঙা এক মূর্তি। অ্যাসিউটে ফিরে মমির জায়গা হলো আমার তাঁবুতে। তারপর ওটার কথা বলতে গেলে ভুলেই গেলাম।

'সে রাতে হঠাৎ করেই কেন যেন ভেঙে গেল ঘুম। কী কারণে জানি না, ঘুরে চাইলাম মমিটার দিকে।

'বছরের এ সময়ে সুদানের রাত এককথায় দারুণ। মরুভূমির যে-কোনও জিনিসকে প্রায় দিনের মতই দেখা যায়। তবে মমির

সাদা অবয়ব যেন আমার চোখ কেড়ে নিয়েছে। ওটার মুখ আমার মুখের ঠিক উল্টো পাশেই। দেবতা আমেন-রার পূজারিণী এক নারী মেট-ওম-কারেমার মমি ওটা।

'শরীর ঢাকা সাদা কাপড় বা ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে গেছে কোথাও কোথাও, আলগা হয়ে গেছে। নারীদেহের অবয়ব পরিষ্কার ধরা পড়ছে। সুগঠিত শরীর, গোল বাহু, ছোট হাত। বুড়ো আঙুল পাতলা। প্রতিটি আঙুল লম্বা, সরু, আলাদাভাবে ব্যাণ্ডেজে মোড়া। ভরাট গলা, বাঁকানো নাক, খাড়া চিবুক। চোখ, ভুরু ও ঠোঁট নকল।

'তাঁবুর খোলা দরজা গলে চাঁদের আলো এসে পড়েছে হাজার বছরের পুরনো নারীদেহের উপর। অদ্ভুত এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাঁবুর ভিতর। আমি একা। অ্যাসিউটে আমার সঙ্গে যে একমাত্র ইউরোপীয় আছেন, তিনি শহরে থাকছেন। আর আমার তাঁবু থেকে শ' খানেক গজ দূরে বিছানা বিছিয়ে ঘুমাচ্ছে চাকর-বাকরেরা।

'মরুভূমিতে বহু দূরের শব্দ শোনা যায়। কিন্তু এখন চারপাশ একেবারেই নীরব। কান খাড়া করে এক রত্তি শব্দও শুনলাম না। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে দুনিয়ার সব মানুষ, জানোয়ার ও পোকামাকড়। অস্বাভাবিকরকম নীরব চারপাশ। কিন্তু বাতাসে অস্বস্তিকর কিছু আছে, সন্দেহ নেই।

'অদ্ভুত, স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা প্যারিসের ভূ-গর্ভস্থ সমাধিগুলোর কথা মনে পড়ল। বুঝলাম না কেন এমন লাগল। ঠিক এমন সময় গোঙানির আওয়াজ পেলাম— মৃদু কিন্তু স্পষ্ট!

'আতংকের একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল বুকে।

'এমনটি হওয়া রীতিমত অস্বাভাবিক ও অসম্ভব! মাথা থেকে জোর করে সরিয়ে দিলাম দুশ্চিন্তা। কিন্তু মন থেকে দূর করতে পারলাম না ভয়। আবারও ভেসে এল শব্দটা। মৃদু গোঙানি। ঘাড়ের চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল আমার। সন্দেহ নেই, জেগে

www.blogye.com

উঠছে মমিটা!

'কিন্তু এ অবিশ্বাস্য! ভীত-বিহবল চোখে চাইলাম। নড়ছে না মমির দেহ। কিন্তু শব্দ আসছে ওটার ভিতর থেকেই! শ্বাস ফেলছে! মনে হলো, মমির বুক ফুলে উঠে আবারও সমান হলো।

'আতংক অবশ করে দিতে চাইল আমাকে। ভৃত্যদের চিৎকার করে ডাকতে চাইলাম, কিন্তু টুঁ শব্দ বেরুল না গলা থেকে। চোখের পাতা বন্ধ করতে চাইলাম। কিন্তু ওগুলো যেন আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইলাম মমির দিকে। আবারও গোঙানির শব্দ এল, তারপর ফেলল দীর্ঘশ্বাস। আমার চোখের সামনেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিহরন বয়ে গেল কয়েক হাজার বছরের পুরনো নারীদেহে। নড়তে শুরু করেছে এক হাত। বাতাস খামচে ধরতে চাইল আঙুলগুলো। ধীরে ধীরে তালুর ভিতর বাঁকা হয়ে ঢুকে পড়ছে। আবারও হঠাৎ সোজা হলো সব আঙুল, খামচি দিয়ে খুলতে লাগল ব্যাণ্ডেজের সাদা কাপড়।

'চোখের সামনে ব্যাণ্ডেজ টেনে খুলতে লাগল। আঙুলগুলোর ভিতর অস্বাভাবিক কিছু আছে, কখনো ভুলব না তখন কেমন লেগেছে আমার।

'দু'জন মানুষের হাত কখনও একরকম হয় না। আর ওই সাদা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো আঙুলগুলো, তার গোলাকার গাঁট, নীল শিরা— সব কেমন পরিচিত। ধীরে ধীরে উপরে উঠছে হাত, গলায় পৌঁছাল. ব্যস্ত হলো সাদা ব্যাণ্ডেজ খুলতে।

'ততক্ষণে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আমার আতংক।

'বিশ্বাস করতে মন চাইছে না, কিন্তু অবিশ্বাস্য ঘটনা চোখের সামনেই তো ঘটছে!

'এখান থেকে সরে পড়বার সুযোগও নেই আমার। এক ইঞ্চি নড়বার ক্ষমতা হারিয়েছি।

'পৈশাচিক ব্যাণ্ডেজ উন্মোচন পর্ব চলছে মাত্র এক গজ দূরে।

'একটার পর একটা আবরণ খসে পড়ছে। চামড়ার ঈষৎ

www.blogye.com

দ্যুতি প্রায় মার্বেলের মত ফ্যাকাসে সাদা। গোটা নাক বা উপরের ঠোঁট ধবধবে সাদা। দাঁত ঝকঝকে। কিন্তু এখানে ওখানে সোনা দিয়ে বাঁধানো। সোনা ঝিলিক দিচ্ছে। নীচের ঠোঁট সরু।

'এই মুখ কোথাও দেখেছি! কিন্তু তা সম্ভব নয়! তবে কি স্বপ্ন দেখছি? এ কী কল্পনা না বাস্তব!

'একে একে খসে পড়ছে হাজারো বছর আগের ব্যাণ্ডেজ। মেয়েলী ধারালো চিবুক, কপালের উপর অংশে কালো, মসৃণ দীর্ঘ চুল। কপাল সাদা। ভুরু কালো, হালকা পেন্সিলের আঁচড় তাতে। সবশেষে দেখা গেল চোখ জোড়া!

'আমার বিস্মিত চোখদুটোর সঙ্গে মিলিত হলো ওই দুই চোখ, যেন হেসে উঠল। পরিষ্কার চিনলাম। ওগুলো আমার মায়ের চোখ। ছোটবেলায় আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন চিরতরে। সীমাহীন উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ল আমার শরীরে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে মমি, মুখোমুখি হলো আমার। হাত বাড়ালাম তাঁকে জড়িয়ে ধরবার জন্য। পৃথিবীর তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছি, সত্যি বলতে একমাত্র নারী যাঁকে আমি এখনও ভালবাসি। কিন্তু আমার স্পর্শ এড়ানো জন্য তাঁবুর একপাশে সরে গেলেন।

'তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলাম, চুমু দিলাম পায়ে।

'কিন্তু কার পায়ে চুমু দিলাম?

'আমার মা'র পা নয়, বহুকাল আগে কবর হওয়া এক মৃতদেহের পায়ে চুমু দিয়েছি!

'ঘৃণা ও ভয় অসুস্থ করে তুলল আমাকে, চট্ করে মুখ তুলে চাইলাম। ঝুঁকে আছে সে, পরিষ্কার চিনলাম— হাজারো বছর আগেই পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেয়া এক মৃতদেহের চামড়া-মাংসহীন, ক্ষয়ে যাওয়া মুখ ওটা!

'ভয়ে, আতংকে কাঁপতে কাঁপতে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলাম, পালাতে হবে আমাকে। আবারও চোখ গেল মমিটার দিকে। কিন্তু

www.blogye.com

এবার দেখলাম, ওটা শুয়ে আছে মাটিতে, স্থির। শরীরে আগের মতই সাদা ব্যাণ্ডেজ। আর তার উপর ঝুঁকে শিয়ালের মত চোখ নিয়ে ক্রুর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অনুবিস, ভয়াল এবং অশুভ!

'এমন সময় রাতের নীরবতা ভাঙল। আমার ভৃত্য আসছে এদিকেই। আর ঠিক সে মুহূর্তে বিদায় নিল ভৌতিক ছায়ামূর্তি।

'তাঁবুতে যথেষ্ট থেকেছি, আজ রাতে আর এখানে থাকতে চাই না, ছিটকে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

'সকাল পর্যন্ত জ্বলন্ত সিগার ঠোঁটে বাইরে হাঁটলাম। এরপর কোনওমতে নাস্তা শেষে মমিটা ফিরিয়ে দিয়ে এলাম থিবিসে।

'না, মিস্টার ও'ডনেল, এখনও নানা কিউরিও সংগ্রহ করি, তবে মমি আর নয়!'

www.blogye.com

ভুতুড়ে বাড়ি

অতিপ্রাকৃত কাণ্ডের জন্য দুর্নাম রয়েছে এমন বাড়ির অভাব নেই। কোনও কোনওটাতে রীতিমত বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন অনেকে। অশরীরীর উপস্থিতি থেকে শুরু করে খুন-জখমের মত ঘটনা ঘটেছে এসব বাড়িতে। বাধ্য হয়ে এমন অনেক বাড়ি থেকে শেষমেষ পালাতে বাধ্য হয়েছেন বাসিন্দারা। তেমন কিছু বাড়ি নিয়েই এই আয়োজন।

৫০ বার্কলে স্কয়ার

বার্কলে স্কয়ারের ভীতিকর সব কাণ্ড ভবঘুরেদের ওখান থেকে দূরে রাখার জন্য ছিল যথেষ্ট।

উনিশ শতকের ঘটনা।

লণ্ডনে আশ্রয়হীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে গিয়ে বার্কলে স্কয়ারে ঢুকে পড়ল দুই নাবিক। এসময়ই তাদের নজরে পড়ল পঞ্চাশ নম্বর দালানে 'টু-লেট' ঝুলছে। রাতের মত ঠাঁই মিলল ভেবে বেআইনী ভাবে ভিতরে ঢুকে পড়ল তারা। এক নাবিকের পকেটে একটা মোমবাতি ছিল। ওটা জ্বেলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল দুজনে। শীতের হাত থেকে বাঁচতে ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরাল তারা। তারপর শোবার ঘরের বিশাল খাটে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়তেও দেরি হলো না।

বড়জোর ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছে, এমনসময় সিঁড়ি বেয়ে দরজার দিকে উঠতে থাক' পদশব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাদের। আওয়াজটা কোনও মানুষের পায়ের নয়, আবার কোনও জানোয়ারেরও মনে হলো না তবে ভীতিকর সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল তারা। কিন্তু কামরা থেকে বেরুবার আগেই দরজার খিল আটকে দিল কে যেন। তারপরই কামরার ভিতর হামাগুড়ি দেয়া, হাঁসফাঁস করবার ও পা ঘষ্টে চলবার আওয়াজ পাওয়া গেল। তবে এবার কেমন কর্কশ আওয়াজ শুরু হলো, অনেকটা ধারালো নখ দিয়ে আঁচড় কাটবার শব্দের মত। এক নাবিক পিছু হটে জানালার কাছে চলে গেল। আর তখনই তার উপর কী যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। আতংকে চেঁচিয়ে উঠল নাবিক। জানালার কাঁচ ও

কাঠের ফ্রেম ভাঙবার আওয়াজ হলো। এদিকে সঙ্গীর চিৎকারে আতংকিত অপর নাবিক দরজার দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল। ভাগ্য ভাল, এবার দরজাটা খোলাই পেল সে। কোনওভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল নাবিক।

সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করল টহলে বের হওয়া এক পুলিশ। দুজন আবারও বাড়িতে ঢুকে দোতলার ওই কামরায় গেল।

ঘর খালি।

কিন্তু বিধ্বস্ত জানালা দিয়ে বাইরে চাইতেই দেখা গেল, বাগানের চারপাশ ঘেরা লোহার শিকে গেঁথে আছে অপর নাবিক, ভয়ঙ্কর ভাবে মারা পড়েছে।

ভেঙে গেছে তার ঘাড়।

এরা ধারণা করল, লোকটি হয়তো ভীষণ ভয়ে লাফ দিয়েছিল। কিংবা কেউ ধাক্কা দিয়েও ফেলে দিয়ে থাকতে পারে।

তবে বিষয়টি এখানেই শেষ হলো।

৫০ বার্কলে স্কয়ারে এর পর এলেন এক ভাড়াটে, মিস্টার বেন্টলে ও তাঁর দুই কন্যা।

ছোট মেয়েটি প্রথমেই ওই বাড়ি অপছন্দ করল। চিড়িয়াখানায় বন্যপ্রাণীর খাঁচায় যেমন গন্ধ থাকে, তেমন বিশ্রী গন্ধ পেল ওখানে। শুধু তাই নয়, কানে এল কারও চাপা কান্নার আওয়াজ।

এদিকে ওর বড় বোনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ক্যাপ্টেন ক্যানফিল্ডের। এখানে ক'দিন কাটাবার জন্য আসবার কথা তাঁর। ক্যাপ্টেন ওখানে পৌঁছবার আগের রাতে গৃহপরিচারিকা গেল ওই কামরা গোছগাছ করতে। একটু পরেই তার আর্তচিৎকারে সবাই ছুটে গেল ওই কামরায়।

মহিলাকে পাওয়া গেল মেঝের উপর, চিত হয়ে পড়ে আছে, হুঁশ নেই। পরদিন সকালে সেন্ট জর্জ হাসপাতালে মারা গেল হতভাগ্য মেয়েটি। তার শেষ কথা ছিল: 'ওটা যেন আমাকে

www.blogye.com

ধরতে না পারে!'

এদিকে কথামত বেড়াতে এলেন ক্যাপ্টেন ক্যানফিল্ড। দুর্দান্ত সাহসী এক তরুণ, গতরাতের ঘটনা শুনবার পর ওই কামরাতেই রাত কাটাবার ঘোষণা দিলেন তিনি।

মাঝরাতের কয়েক মিনিট পর বেন্টলে ও তাঁর মেয়েরা কলজে কাঁপানো চিৎকার এবং গুলি চালাবার কান ফাটানো শব্দ শুনলেন। দৌড়ে গিয়ে দেখলেন, মাটিতে পড়ে আছেন ক্যাপ্টেন। আগের রাতে গৃহপরিচারিকা ওভাবেই পড়ে ছিল। তাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত এবং মাথার নীচে সেনাবাহিনীর খালি পিস্তল।

কিন্তু ক্যাপ্টেনের শরীরে বুলেটের ক্ষত পাওয়া গেল না। প্রচণ্ড ভয় পেয়েই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

ডাক্তার আসবার পর মন্তব্য করলেন মিস্টার বেন্টলে, 'ভীষণ আতংকে মারা পড়েছে।' তারপর বললেন, 'এখানে ভয়ের কী থাকতে পারে যে কারও চেহারায় এমন আতঙ্ক ফুটে উঠবে?'

'তা পৃথিবীর কিছু নয়,' একমত হলেন চিকিৎসক। তারপর বললেন, 'আমি কি ভাবছি বলব না, নইলে ভাববেন আমি পাগল হয়ে গিয়েছি।'

বার্কলে স্কয়ারের ভুতুড়ে ঘটনার এখানেই শেষ নয়।

ঘাগরা পরা ছোট এক শিশুর ভূত চোখে পড়ে প্রায়ই, উপর তলায় বাচ্চাদের খেলার ঘরে ভয় পেয়ে মৃত্যু হয়েছিল তার।

এক তরুণীর আত্মাকেও দেখা যায়। এক পুরুষ আত্মীয়ের আক্রমণের শিকার হয়ে উপরতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল মেয়েটি। তাকে দেখা যায় জানালার নীচের তাক ধরে চিৎকার করতে। নীচের বাগানে পড়ে মারা যাওয়ার আগে এভাবেই চিৎকার করেছিল সে।

আর এতসব ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই ৫০ বার্কলে স্কয়ার পরিণত হলো লণ্ডনের সবচেয়ে ভুতুড়ে বাড়িগুলোর একটিতে।

www.blogye.com

৫০ বার্কলে স্কয়ার।

শহরের নানা প্রান্ত থেকে একপলকের জন্য একে দেখতে আসতে লাগল অনেকে।

কেউ আবার রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একবারের জন্য হলেও কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে যায় ওটার উপর। তবে লর্ড লিটলটন সে জনাকয়েক সাহসী মানুষের একজন, তিনি ওই বাড়ির উপরতলার সবচেয়ে ভুতুড়ে কামরায় স্বেচ্ছায় এক রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

অশুভ শক্তিকে মোকাবিলা করবার পূর্বপ্রস্তুতিও নেন লর্ড বারুদ ও রূপার গুলিভরা এক ব্লাণ্ডারবাস সঙ্গে রাখলেন তিনি। ওই সেকেলে বন্দুকে একসঙ্গে অনেক গুলি করা যায়। আর অনেকেই বলে, মায়ানেকড়ের মত অশুভ শক্তিকে মারতে হলে কেবল রূপার গুলি কাজ করে।

www.blogye.com

কিন্তু মধ্য রাতে আঁধারে কিছু ঝাঁপিয়ে পড়ল লর্ডের উপর। দেরি না করে গুলি ছুঁড়লেন তিনি। একটা কিছু মাটিতে পড়েছে বুঝতে পারলেও সকালে ওটার কোনও নাম-নিশানা পেলেন না।

উনিশ শতকের শেষদিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে ৫০ বার্কলে স্কয়ারে তাদের সদরদপ্তর সরিয়ে নেন খ্যাতিমান বই বিক্রেতা ম্যাগস ব্রাদার্স। তখন থেকেই অজানা কোনও কারণে বন্ধ হয়ে গেল ওখানকার সব ভুতুড়ে কাণ্ড।

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে: আকৃতিহীন, ভীতিপ্রদ কিছু ঢুকে পড়ে ওই বাড়িতে, এবং দুই নাবিক ও অনেককে আক্রমণ করেছে?

দুটো ব্যাখ্যা আছে এর।

একটি হলো: ১৮৫৯ সালে মিস্টার মিয়ের্স বাড়িটা ভাড়া নেন ভালবাসার কনেকে বাড়িতে তুলবার জন্য। কিন্তু তরুণীটি অজানা কোনও কারণে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। তারপর থেকেই নিঃসঙ্গ জীবন শুরু হয় মিয়ের্সের। অন্য কোনও নারীকে কাছে ভীড়তে দিতেন না ভদ্রলোক। প্রায় সারাদিন ঘুমাতেন এবং রাতে উপরের তলায় ঘুরে বেড়াতেন মোমবাতি হাতে। বাইরে থেকে জানালায় তাঁর ছায়া দেখা যেত রাতভর। অনেকের ধারণা, মৃত্যুর পরও ওই কামরায় ভর করে রয়েছে অসুখী এ ভদ্রলোকের আত্মা।

আবার অন্যদের ধারণা একদল জালিয়াত তাদের আখড়া তৈরি করে ওখানে, আর ধন-সম্পদ লুকানোর জন্য ব্যবহার করত ওই বাড়িকে। তারাই নানান শব্দ ও অদ্ভুতুড়ে ছায়ামূর্তির ভেল্কি দেখিয়ে লোকদের এখান থেকে দূরে রাখত।

কিন্তু কোন্ মত আসলে সঠিক, নিশ্চিত হওয়া কঠিন।

তবে ১৮৭৯ সালের ২ আগস্ট প্রকাশিত নোটস অ্যাণ্ড কুয়েরিজে ৫০ বার্কলে স্কয়ারের আরও কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনা তুলে ধরা হয়।

www.blogye.com

এক কিশোরী এমনই ভয় পেয়েছিল, এ বাড়িতে এসে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায় সে। লর্ড লিটলটন যে কামরায় রাত কাটিয়েছিলেন, সে কামরায় সাহস করে রাত কাটিয়েছিলেন এক লোক।

পরদিন সকালে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় তাঁর।

লেখক তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন: এ বাড়িতে অন্তত একটি কামরা আছে, যেখানে অতিপ্রাকৃত কারণে প্রাণ হারায় মানুষ।

রহস্যময় মহিলা

ডাবলিনের সংগীত মহলে নাম-ডাক ছিল মিসেস জি. কেলির। এ অভিজ্ঞতা তাঁর। উনিশ শতকের শেষদিকের ঘটনা।

মিসেস কেলি প্রথম ভূতটাকে দেখেন বেশ নাটকীয়ভাবেই।

বাড়ির কিচেনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এসময়ই এক মহিলা, পরে যাকে বহুবার দেখেছেন, সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন।

পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনে বিচলিত হলেন না মিসেস কেলি। অবশ্য কে এল দেখবার জন্য ঘাড় ফেরালেন। এসময়ই পোক্ত গড়নের লম্বা, বয়স্ক এক মহিলার উপর নজর পড়ল তাঁর।

তার পরনে পুরনো আমলের লম্বা এক কোট ও থুতনি ফিতা দিয়ে বাঁধা এক টুপি। চুল ধূসর, চোখের দৃষ্টি নরম।

একে অপরের দিকে যতক্ষণ চেয়ে রইলেন, তার ভিতর এক-দুই করে বিশ পর্যন্ত গুণে ফেলা সম্ভব।

শুরুতে ভয় পাননি মিসেস কেলি। কিন্তু মহিলার দিকে চেয়ে থাকবার সময় একটা অস্বস্তি হলো তাঁর, ধীরে ধীরে ওটাই পরিণত হলো আতংকে। ভয়ে পিছাতে পিছাতে একসময় দেয়ালের সঙ্গে

www.blogye.com

পিঠ ঠেকে গেল তাঁর।

এসময়ই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল নারী-মূর্তি।

পরে যতবার তাকে দেখেছেন, এই আতংক বারবার মনে ফিরেছে।

পরবর্তী দশবছরে অন্তত পনেরোবার ওই প্রেতাত্মাকে দেখেছেন [redacted]স কেলি, বাড়ির প্রতিটি কামরায়।

এ রহস্যময় আগন্তুকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনও বিশৃঙ্খলা, অসামঞ্জস্য দু-চোখে দেখতে পারত না। এমন কী বাড়ির সাধারণ নিয়মের কোনও বদল ঘটলে মেজাজ বিগড়ে যেত তার।

বাড়িতে রাত কাটাবার জন্য অতিথি এলেই হয়েছে। এটা যে তার অপছন্দ তা বুঝিয়ে দিত অতিথিকে। যে কামরায় উঠত অতিথি, সে ঘরের চেয়ার উল্টে ফেলত।

একবার ভীষণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হলো কেলি দম্পতিকে।

তাঁদের এক অতিথি সন্ধ্যায় কিছু ফেলে এসেছে বলে আবারও তাঁর কামরায় ঢুকলেন। তারপরই সিঁড়ি বেয়ে আবারও নেমে এসে বললেন, 'বাহ! তোমাদের আসবাবপত্র সাজাবার রীতি অন্যদের চেয়ে আলাদা দেখছি! উল্টে রাখা চেয়ারে পা বেধে আরেকটু হলে পা ভাঙতাম!'

কিন্তু তাঁর কথায় খুব বিস্মিত হলেন না কেলি দম্পতি। কারণ সকাল থেকে এ পর্যন্ত দু-দুবার ওই চেয়ার সোজা করেছেন তাঁরা। অবশ্য অতিথি ভড়কে যাবেন ভেবে তাঁকে বিষয়টি খুলে বললেন না।

প্রায়ই কেলিদের গোটা পরিবারকে বিরক্ত করেছে অদ্ভুত এক টোকা বা ধাক্কা দেয়ার শব্দ। বাড়ির প্রায় প্রতিটি ঘরে এমনই ঘটত।

বিশেষ করে দেয়াল, দরজায় করাঘাত হতো। তাঁরা যেখানে

www.blogye.com

বসতেন, তার খুব কাছেই শুরু হতো ওই আওয়াজ। আর আওয়াজ মোটেই আস্তে হতো না।

একদিন এক প্রতিবেশী মিস্টার কেলির কাছে জানতে চাইলেন, দেয়ালে ছবি ঝুলাবার জন্য এমন অদ্ভুত সময় কেন বেছে নেন তাঁরা।

আরেকটা ঘটনা প্রায়ই ঘটত।

ভোদড়ের চামড়ার পোশাকের সেট পেয়েছিলেন মিসেস কেলি। কিন্তু ওটার ছিল অস্বস্তিকর গন্ধ।

সাধারণত রাতে জামাকাপড় রাখবার আলমারি থেকে বের করে ওটা বসবার ঘরের এক চেয়ারে রেখে দিতেন তিনি।

তাঁদের শোবার ঘরের পাশেই ওই কামরা।

একদিন সকালে বসবার ঘরে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। চামড়ার হাত মোজা কামরার এক কোনায়, আরেক কোনায় কাঁধের খাটো চাদর।

এর পিছনে অস্বাভাবিক কিছু থাকতে পারে তা প্রথমে তাঁর মাথায় এল না।

বাড়ির কাজের মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, এ বিষয়ে কিছুই জানে না।

এমন কী সকালে এ ঘরে ঢোকেওনি সে।

ওই পোশাকের কারণে মাথায় জেদ চেপে গেল মিসেস কেলির। বেশ রাত করে কাপড়গুলোকে বসবার ঘরে চেয়ারে রাখলেন। আর এমন ব্যবস্থা করলেন, সকালে তিনি ঢুকবার আগে কেউ এ ঘরে ঢুকবে না।

কিন্তু সকালে বসবার ঘরে গিয়ে দেখলেন, আজও ওসব পোশাক জায়গা বদলেছে।

মিসেস কেলিকে মেনে নিতে হলো, ওই ভূত তার পছন্দের বাইরে কোনও কাজ হলে প্রতিবাদ করবেই।

কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই একসময় দেখা দেয়া বন্ধ করল

www.blogye.com

সে।

তখন কেলি দম্পতি মাত্র এক অনুষ্ঠান থেকে ফিরেছেন, সেখানে গান গেয়েছেন মিসেস কেলি।

সময় নিয়ে তাঁরা রাতের খাবার সারলেন, আলাপ করছিলেন সন্ধ্যার ঘটনাগুলো নিয়ে। তারপর কামরা ছাড়বার জন্য উঠে দাঁড়ালেন মিসেস কেলি, গিয়ে ডাইনিং রুম থেকে বেরুবার দরজা খুললেন। তখনই দেখলেন, বুড়ো মহিলা গালিচার উপর দাঁড়িয়ে দরজায় ঝুঁকে আছে। কান পাতবার ভঙ্গি তার।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস কেলি।

পাশে দৌড়ে এলেন তাঁর স্বামী।

কান পেতে শুনতে গিয়েই ধরা খেয়ে ভীষণ লজ্জা পেল বয়স্কা মহিলা, তখনই তাঁদের চোখের সামনেই উধাও হলো সে!

অপদেবতার আস্তানা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ঘটনা।

তখন বার্মায় (এখনকার মায়ানমার) ভারতীয় সেনাদের সামরিক পর্যবেক্ষক ছিলেন জেমস লিয়াসর। ভদ্রলোক জাতে ইংরেজ। সেনাদের খাবার-বাসস্থানে কোনও সমস্য হচ্ছে কি না, তারা ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে কি না, বার্মার যুদ্ধের অবস্থা— এ নিয়ে প্রবন্ধ লিখে দিস্তার পর দিস্তা কাগজ ভরাতে

www.blogye.com

হতো তাঁকে। তবে এই কাজের কারণে বেশ একটা সুবিধাও পেয়ে যান লিয়াসর। দেশটির কোনও জায়গায় যেতেই বাধা ছিল না তাঁর। কর্তৃপক্ষ শুধু নিয়মিত তাঁর পাঠানো রিপোর্ট পেলেই খুশি।

এ সময় বার্মার এক বন্ধুর চিঠি মারফত জানতে পারলেন, শান রাজ্যে হপ্তাহখানেক কাটিয়ে এসেছেন তিনি। জায়গাটা দারুণ স্বাস্থ্যকর। এ ক'দিনেই স্বাস্থ্যের চমৎকার উন্নতি হয়েছে বন্ধুটির। কেন যেন ওই জায়গায় যাওয়ার জন্য মন উচাটন হয়ে উঠল জেমস লিয়াসরের। কথায় বলে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। সেখানে যাওয়ার একটা কারণ খুঁজে বের করতেও কষ্ট হলো না তাই।

বাক্স-পেটরা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দিন কয়েকের জন্য। ১৯৪৫-এর গ্রীষ্মকাল। লিয়াসরের ড্রাইভার অজিত সিং তুখোড় গাড়ি চালায়। কয়েক ঘণ্টায় পেরিয়ে গেল অনেক রাস্তা। তারপর লিয়াসর রাতের মত থিতু হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন পিয়াবোতে।

বোমায় বেহাল দশা মাইকতলা শহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে এ জায়গাটি। পরদিন সকালে আবার যাত্রা। একসময় চলে এলেন শান রাজ্যের সীমানায়। এখান থেকে দুর্গম এক রাস্তা সাপের মত পেঁচিয়ে শান পাহাড় কেটে পাঁচ হাজার ফুট উঠে গেছে। সরু পথ। কখনও একপাশে পাহাড়, অপর পাশে খাদ। কখনও আবার দু'পাশেই খাদ। নীচে চাইলে দেখা যায় কেবল কালিগোলা অন্ধকার। একটু এদিক-সেদিক হলেই কয়েক হাজার ফুট নীচে গিয়ে পড়তে হবে গাড়ি সমেত।

এদিকে সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি। পাহাড়ি নদী ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। বন্য প্রাণীর মৃতদেহ, গাছপালা ভেসে যাচ্ছে স্রোতের তোড়ে।

কিন্তু নিরাপদেই পাহাড়ের শেষ বাঁক পেরিয়ে ক্যালে পৌঁছে গেলেন লিয়াসর।

শান রাজ্যের প্রধান শহর ক্যাল। এখানে যখন পৌঁছলেন

www.blogye.com

তখন ভরদুপুর।

এমনিতেই দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন দুজনে। তারপর এসেই শুনলেন আরেক হতাশাজনক খবর। এক বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়-পত্র এনেছিলেন স্থানীয় এক অফিসারকে দেয়ার জন্য। ইচ্ছা ছিল ওটা দেখিয়ে ভদ্রলোকের বাসায় দু-চারদিনের জন্য ঠাঁই নেয়া। কিন্তু ক্যালে পা রাখতে না রাখতেই জানলেন, ওই অফিসার ক'দিন আগে বদলি হয়ে গেছেন ইয়েমলো শহরে। মেজাজ রীতিমত খাপ্পা হয়ে গেল জেমসের।

ক্লান্ত শরীর নিয়েই ক্যালের চারপাশে এক চক্কর ঘুরে এসে বুঝলেন, এখানে রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলবার সম্ভাবনা খুব কম। তার উপর তাঁকে সঙ্গী হিসাবে চাইবে এমন লোক পাওয়া মুশকিল। মূল সমস্যা তাঁর টাইপরাইটার। রাতের গভীরে হারিকেনের আলোয় খটর-খটর শব্দ করবে ওই যন্ত্র, কেই বা সহ্য করবে বা জায়গা দেবে তাঁকে!

ধুত্তোরি ছাই, ভাবলেন জেমস। ঠিক করলেন ইয়েমলোতে কপাল ঠুঁকে দেখবেন। অজিত সিঙের হাসি এ-কান ও-কান হলো এ সিদ্ধান্তে। ওর এক-বন্ধু চাকরি করে ওখানে, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে।

একঘণ্টার মত লাগল ইয়েমলোতে পৌঁছতে। কয়েকদিন হলো কেবল ইংরেজরা দখল নিয়েছে শহরের। এখনও নিয়ম-শৃঙ্খলার বালাই নেই। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হদিস বের করা যেন খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার মতই।

যাই হোক, খোঁজও মিলল না সেই অফিসারের। হতাশ হয়ে ফিরছেন এমনসময় পরিচিত এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লিয়াসরের। রেঙ্গুনে পরিচয় হয়েছিল এঁর সঙ্গে। এটা-সেটা টুকটাক আলাপের পর থাকবার জায়গার সমস্যার কথা পাড়তেই কুঁকড়ে গেলেন ভদ্রলোক। অপরাধী কণ্ঠে বললেন, 'ভাই, এটা এ শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কেবল দিনকয়েক হলো

www.blogye.com

ইয়েমলোতে ঘাঁটি গেঁড়েছি আমরা। নিজেই থাকছি মাল বোঝাই এক ট্রাকের পিছনে, এক বন্ধুর সঙ্গে গাদাগাদি করে। তবে একটা বাড়ির কথা শুনেছি, ওখানে বোধহয় উঠতে পারবেন। গত রাতে কয়েকজন সামরিক অফিসার ছিলেন সেখানে। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা যে সেখানে হবে, সন্দেহ নেই। যদি দেখেন সুবিধের নয়, কাল না হয় অন্য কোথাও চলে যাবেন। ওটা বেশি দূরেও নয় এখান থেকে, এই দেড় মাইলটাক।'

ভদ্রলোক বিদায় নেবার সময় আশ্বস্ত করে গেলেন বাড়িটা খুঁজতে মোটেই বেগ পেতে হবে না।

তবে তাঁর কথায় খুব যে ভরসা পেলেন জেমস লিয়াসর, তা নয়। একে নতুন জায়গা, তার উপর আবার রাস্তার কিছুই চেনেন না। এ ছাড়া আর কোনও উপায় যখন নেই, ঈশ্বরের নাম নিয়ে উঠে পড়লেন জীপে।

হাওয়ার বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল অজিত সিং। তবে সত্যি বাড়িটা পেয়ে গেলেন কোনও ঝামেলা ছাড়াই। দশ মিনিটও লাগল না পৌঁছতে। সামনে বেশ খোলা জায়গা। আগাছা ও বুনো ঝোপ দখল নিয়েছে জমির। আর আছে বড় বড় কয়েকটা গাছ। বাড়ি ঢাকা পড়ে আছে ঘন জঙ্গলের আড়ালে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার। ফটক বলতে একটা কিছু যে একসময় ছিল, তা বোঝাও মুশকিল। খুঁটিগুলো বোধহয় জ্বালানী কাঠ হিসাবে বহু আগেই পুড়েছে। কাদায় গাড়ির চাকার দাগ। সম্ভবত কালরাতে এখানে আসা সামরিক অফিসারদের গাড়ি হবে। কাদার ভিতর দিয়েই দ্রুত গতিতে সামনে বাড়ল অজিত সিঙের গাড়ি।

বাড়ির চারপাশের ফুলের বাগান দীর্ঘদিনের অযত্নে পরিণত হয়েছে জঙ্গলে। ওদিকে চাইলেই কেমন অস্বস্তি দানা বাঁধে মনে।

গাড়ি দাঁড় করাল অজিত সিং। না নেমেই পরিস্থিতি ঠাহরের চেষ্টা করলেন জেমস।

একতলা কাঠের বাড়ি। কয়েকটা খুঁটি দিয়ে মেঝে উঁচু করা।

www.blogye.com

সামনের দিকে টানা বারান্দা। তবে বারান্দার খুঁটির বেশিরভাগ গায়েব।

বাড়ির চেহারা দেখে খুশি হওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না জেমস। তবে সারাদিনের ভ্রমণে ভেঙে পড়ছে শরীর। তার উপর আবার ভিজে একসা। এখনও টিপটিপ করে পড়ছে বৃষ্টি। বাইরে বৃষ্টিতে ভিজবার চেয়ে ভিতরে অন্তত ভাল থাকব, ভাবলেন।

জীপের ইঞ্জিন চলছিল। উদ্দেশ্য, বাড়ির ভিতর কেউ থাকলে এ শব্দে বেরিয়ে আসবে।

একটু পরে সত্যি এক ইংরেজ অফিসার বেরিয়ে এলেন তড়িঘড়ি করে।

'ভেবেছি মালপত্র নিতে আমার চাপরাশি এল,' রেলিঙে ভর দিয়ে জেমসের দিকে চেয়ে বললেন ভদ্রলোক। 'এখানে আর এক রাতও কাটাতে চাই না।'

অফিসারকে দেখে উদ্ভ্রান্ত মনে হলো। গলার স্বরে স্পষ্ট আতংকের ছাপ। চোখ দুটো কেমন অস্থির।

কালরাতে এখানে ছিলেন কি না জানতে চাইলে বললেন, তাঁরা চারজন ছিলেন। বাকিরা চলে গেছেন। এখন আছেন কেবল তিনি। শিউরে উঠে বললেন, 'ওহ! কী ভয়ংকর ছিল গতরাত।'

জেমসের বুঝতে দেরি হলো না কিছু আতংকিত করে রেখেছে ভদ্রলোককে। সম্ভবত গতরাতে ভয়ংকর কিছু ঘটেছে বাড়ির ভিতর। রাতে ঝড়-বৃষ্টি ঘরে ঢুকেছে কি না জানতে চাইলেন জেমস।

ভদ্রলোক বললেন, সেরকম কোনও সমস্যা হয়নি। পিছন দিকের এক কামরায় রাত কাটিয়েছেন তাঁরা। ঠিক গা ঘেঁষে উঠে গেছে খাড়া এক পাহাড়। স্থানীয় লোক বলে ইওমাজি পাহাড়। কামরায় ঢুকবার পরই অস্বস্তিকর অনুভূতি আঁকড়ে ধরেছিল

www.blogye.com

তাঁকে।

তাঁদের মনে হয়েছিল, যেন অলক্ষে কেউ নজর রাখছে। বারবার ঘুম ভেঙেছে। ভয় লেগেছে পাহাড়ের উপর থেকে অজানা কিছু হামলে পড়বে তাঁদের উপর। ভদ্রলোক হয়তো আরও কিছু বলতেন। রাতের আসল কাহিনি সম্ভবত শুরুই করেননি। কিন্তু তারপরই শব্দ এল একটা ইঞ্জিনের। একটু পরেই বড় একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল। গাড়ির চালক ও অজিত সিং মিলে মালসামান সব তুলে দিল।

অফিসারটি এক মুহূর্ত আর থাকতে চাইলেন না। বললেন, 'এ বাড়ি ছেড়ে কেটে পড়তে পারলে বাঁচি। কুয়াশার কারণে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন না এখন। তবে যখন চেহারা দেখাবে, এখানে এসেছেন বলে আফসোস করবেন।'

অফিসারের কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন জেমস। ঠিক তখনই উঁচু পাহাড়টাকে ঘিরে রাখা কুয়াশার পর্দা সরে গেল হঠাৎ, যেন অদৃশ্য কারও আঙুলের ইশারায়। মেঘলা আকাশের পটভূমিতে ওটার চেহারা দেখেই বুক কেঁপে উঠল জেমসের। গাছপালা দিয়ে ঢাকা পাহাড়টা যেন অশুভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাড়ির দিকে।

কেঁপে উঠলেন অফিসারটি। বললেন, 'কী, ঠিক বলেছি না? একটু পরেই স্নায়ুর উপর চাপ পড়বে আপনার। যদি ভাল চান, এখানে রাত কাটাবার চিন্তা বাদ দিয়ে শহরে চলুন।' তারপর কথা না বাড়িয়ে এক ছুটে উঠে পড়লেন ট্রাকে। একটু পরেই হারিয়ে গেল ওটা দৃষ্টির আড়ালে। একটু পর ইঞ্জিনের শব্দও পাওয়া গেল না।

অশুভ একটা অস্বস্তি জেঁকে ধরল জেমস লিয়াসরের বুকে।

অজিত সিংকে পেলেন বাড়ির পিছনে। চেহারা মলিন, বলল, 'খুব খারাপ জায়গা, স্যর। চলেন কেটে পড়ি। শহরে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির আড্ডায় গেলে খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা হবে না।

www.blogye.com

কোনওমতে রাতও কাটিয়ে দেয়া যাবে। এখানে আছে শুধু ওই পাহাড়, একেবারে দৈত্যের মত দেখতে।' মাথা তুলে আতংকমাখা দৃষ্টিতে তাকাল সে পাহাড়টার দিকে।

অজিত সিঙের কথায় কান না দিয়ে তাকে মালপত্র নামিয়ে গোছগাছের নির্দেশ দিলেন জেমস। নিজে বাড়ি ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলেন। যতই দেখলেন, এখানে এসেছেন বলে নিজের উপর রাগ হতে লাগল।

বাড়ির প্রতিটি জিনিসের আয়ু শেষের পথে।

হেঁটে যাবার সময় মচ মচ শব্দ তুলছে কাঠের মেঝে। মনে হয় তক্তা ভেঙে পা ভিতরে আটকা পড়বে।

কেবল একটা দরজার কপাট আছে। ওটা লাগাতে যেতেই দড়াম করে খুলে পড়ল মেঝের উপর।

ঘরের ভিতর পচা, ভ্যাপসা গন্ধ। বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে দম। হঠাৎ মনে হলো বাইরে থেকে তাঁর নাম ধরে কেউ ডাকছে। জেমস দৌড়ে গিয়ে কাউকে পেলেন না। ভাবলেন, মনের ভুল, এ জায়গা গোড়াতেই অপছন্দ করেছেন বলে মনের উপর চাপ পড়ছে।

ইতিমধ্যে মোটামুটি ঘর গোছগাছ করে ফেলেছে অজিত সিং। সামনের ঘরে জেমসের থাকবার ব্যবস্থা, পিছনের এক ঘর বাছাই করেছে নিজের জন্য।

হাতঘড়ি দেখলেন জেমস।

এখুনি বেরিয়ে পড়া উচিত।

ছয়টায় কর্নেল ব্যারোর সঙ্গে দেখা করবার কথা।

অজিত সিংকে বললেন, লঙ্গরখানা থেকে খাবারের ব্যবস্থা করতে। তারপর জীপ নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়লেন।

কর্নেলের অফিস খুঁজে নিতে ঝামেলায় পড়তে হলো না মোটেই।

কর্নেলের কাছে তাঁর কার্ড পাঠিয়ে এ অফিসের এক কর্মচারীর

www.blogye.com

সঙ্গে গল্প জমালেন। কোথায় উঠেছেন জিজ্ঞেস করতে জানালেন, জঙ্গলের ধারের বাড়ির কথা।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অস্থিরভাবে জানতে চাইলেন, 'ওখানে যেতে কে বলল?' হয়তো আরও কিছু বলতেন, এমন সময় চাপরাশী এসে জানাল কর্নেল ডেকেছেন।

পরে জেমসের বারবার মনে হয়েছে, ওই কর্মচারীর সব কথা শুনলে হয়তো আরও শক্তভাবে সামলাতে পারতেন পরিস্থিতি।

সবাই যে ওই বাড়িকে অপদেবতার আস্তানা মনে করে, কাছে-ধারে ভেড়ে না, সে তথ্যটাও হয়তো পেয়ে যেতেন।

কর্নেল ব্যারোর কাছ থেকে যখন বিদায় নিলেন, ততক্ষণে নেমে এসেছে আঁধার। হাওয়া বইছে শোঁ-শোঁ, কিছুটা বিরতি দেয়ার পর আবারও মুষলধারে শুরু হয়েছে বৃষ্টি।

জীপের হুড তুলতে গিয়ে ভিজে একসা হয়ে গেলেন।

বাড়ির সামনে যখন এলেন, ঘড়িতে রাত নয়টা।

কাদা ঠেলে সাবধানে এগুলেন গাড়ি নিয়ে। এসময় চোখ গেল বারান্দায়। রেলিঙে ভর দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে এক ছায়ামূর্তি। এ আর যাই হোক, অজিত সিং নয়।

অজিঁত লম্বা, চিকন। আর এ বেঁটে, বেশ মোটাসোটা শরীর।

তা হলে ও কে? চমকে উঠলেন জেমস। এতই অবাক হলেন, কখন ইঞ্জিন থামিয়ে দিয়েছেন, টেরও পাননি। সম্বিত ফিরতে আবারও চালু করলেন ইঞ্জিন। আর তা করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন, চোখ ফেরাতেই দেখলেন লোকটা অদৃশ্য হয়েছে। হেডলাইটের রশ্মিতে বন্যা বইছে সামনের দিক। কিন্তু লোকটাকে দেখা গেল না কোথাও।

হঠাৎই শীত লেগে উঠল জেমসের, রীতিমত কাঁপুনি ধরে গেল সারাশরীরে।

গাড়ি থামালেন বারান্দার সিঁড়ির সামনে। গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন অজিত সিংকে।

www.blogye.com

একটু পরে বন্দুক হাতে বেরিয়ে এল সে। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে মাথায় পরেছে একটা টুপি। হেডলাইটের আলোয় চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগল একটু। তারপর জেমসকে দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে।

'বারান্দায় কে ছিল? কে এসেছে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন জেমস।

মাথা নাড়ল সিং। বোঝা গেল অবাক হয়েছে। যেন একটু ভয়ও পেয়েছে। আর যাই হোক, এ বাড়িতে চোর-ডাকাত আসবার কোনও কারণ নেই।

অস্বস্তি বাড়ছে দুজনেরই।

এতক্ষণে আকাশে চাঁদ থাকবার কথা। হয়তো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে। অথবা পাহাড়ের চূড়ার ওপাশে আছে, ভাবলেন জেমস।

বাড়ির ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। হেডলাইটের আলোয় বারান্দায় উঠে এলেন। ঘরে ঢুকে বুঝলেন এত অন্ধকারের কারণ কী।

হারিকেন জ্বালা হয়নি এখনও।

একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'আলো জ্বালোনি কেন?'

'বাতি তো জ্বলেনি, সাহেব,' হতাশার সুরে বলল অজিত।

তা কী ভাবে সম্ভব, অবাক হয়ে ভাবলেন জেমস। টর্চ জ্বেলে চারদিকে দেখলেন। মেঝের উপর হারিকেন। আশপাশে অন্তত গোটা ত্রিশ ম্যাচের কাঠি

অজিত সিং কসুর কম করেনি।

পরীক্ষা করে দেখলেন হারিকেন কেরোসিনে ভর্তি, সলতেও নতুন।

তা হলে আলো জ্বলল না কেন?

জেমস কোনও উত্তর পেলেন না মন থেকে।

বন্দুক হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা অজিত সিংকে দেখে মনে

www.blogye.com

হলো কোনও অমঙ্গলের আশংকা করছে।

কেন যেন শরীর কেঁপে উঠল তাঁরও।

জীপের আলো নিভিয়ে ইন্সপেকশন ল্যাম্প ও ব্যাটারি খুলে আনবার নির্দেশ দিলেন।

ল্যাম্পটা রাতে আলো দেবে।

অজিত সিং অদৃশ্য হতেই টর্চ নিভিয়ে দিলেন জেমস। ওটার ব্যাটারি শেষ হলে মুশকিলে পড়তে হতে পারে।

আলো নিভে যেতেই অন্ধকারের একটা কালো চাদর যেন ঢেকে দিল তাঁকে। ঢোক গিললেন বারবার। মনের ভয় কাটাবার জন্য ছাদ থেকে টপ্-টপ্ শব্দে পড়া বৃষ্টির ফোঁটা গুনবার চেষ্টা করলেন। এমনসময় কিছু উড়ে এসে পড়ল মাথার উপর। আতংকে চেঁচিয়ে উঠলেন জেমস, লাফিয়ে পড়লেন একপাশে।

এসময় ফিরল অজিত সিং। আর তখনই নিজ বোকামি ধরতে পেরে হেসে উঠলেন জেমস। আরে, ওটা বাদুড়! এমন পোড়ো বাড়িতে বাদুড়ের আড্ডাখানা হবে এই তো স্বাভাবিক!

ব্যাটারির সংযোগ দিতেই পুরো ঘর ভেসে গেল আলোর বন্যায়। প্রথমবারের মত যেন একটু স্বস্তির পরশ পেলেন দুজনে। মেঝে থেকে ফুট আষ্টেক উঁচুতে, দেয়ালে মরচে পড়া একটা পেরেক। ওখানে ল্যাম্প লটকে দেয়া হলো।

এবার ক্যাম্প খাটের উপর সুস্থির হয়ে বসলেন জেমস। টেনে নিলেন টাইপ রাইটার। শুরু হলো খটর-খট-খট।

বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। বারান্দার পাশেই একটা নালা। ওদিক দিয়ে তুমুল বেগে বইছে বৃষ্টির পানি।

একটা সিগারেট ধরাতে না পেরে মেঝেতে বসে জেমসের কাজ দেখতে লাগল হতাশ অজিত সিং। ভাব দেখে মনে হলো, এ কামরা ছেড়ে নিজের ঘরে যেতে নারাজ, ভয় পেয়েছে।

অবশ্য অজিত সিং এখানে রাত কাটালে জেমস অখুশি হবেন না। সত্যিই তাঁর মধ্যেও অশুভ অনুভূতি ছড়িয়ে দিয়েছে এ বাড়ি।

www.blogye.com

রাত দশটা বাজতে না বাজতেই দেখলেন কাজে মন দিতে পারছেন না। অযথা কাগজ নষ্ট না করে কাজ থামিয়ে উঠে চলে গেলেন দরজার দিকে।

বহু আগে লোপাট হয়েছে আসল দরজা। ঝড়-জলের হাত থেকে রেহাই পেতে একটা গ্রাউণ্ডশিট ঝুলিয়েছে অজিত, ওটা কাজ করবে পর্দার।

বাইরে উঁকি দিলেন জেমস। ঘন অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ছে না। অবিরাম বৃষ্টির শব্দ।

আবারও ফিরলেন ক্যাম্প খাটের ধারে।

অজিত সিং ইতিমধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুম দিয়েছে।

মশারির ভিতর ঢুকতে যাবেন জেমস, এমনসময় পিছনের দরজায় জোর করাঘাতের শব্দ হলো।

দরজার কপাট খুলে পড়েছিল, পরে দুজনে মিলে মালপত্র ঠাঁসা দুটো কাঠের বাক্স দিয়ে ভাঙা দরজা সোজা করে দাঁড় করিয়ে নিয়েছেন।

শব্দটা বেশ জোরাল।

ঘুমন্ত অজিতও জেগে উঠেছে। লাফ দিয়ে উঠে বন্দুক বাগিয়ে ধরল সে।

'দরজা খুলবেন না, সাহেব,' আতংকিত কণ্ঠে বলল।

'আরে, এত ভয় কীসের? হয়তো পুরনো কড়িকাঠ খুলে পড়েছে, এখন দেয়ালে ঘা দিচ্ছে বাতাসের ঝাপটা লেগে। কিংবা বারান্দায় যে নাদুস নুদুস লোকটাকে দেখেছিলাম, সে এখন ঠাঁই চাইছে।' হেসে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলেন জেমস।

'আপনি যাকে দেখেছেন ও মানুষ না, কোনও প্রেত। কেউ মরতে আসবে না এই ঝড়ের রাতে।'

ওর কথা শেষে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

কী করবেন, স্থির করতে পারলেন না জেমস। এমনসময় বিকট শব্দে কপাট ভিতর দিকে আছড়ে পড়ল, কাঠের বাক্সদুটোও

www.blogye.com

ছিটকে গেল— ঘরের ভিতর বয়ে গেল ঝড়ো হাওয়া। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হলো ল্যাম্পের বাল্‌ব্। আঁধারে ঢেকে গেল কামরা। তখনই অস্বাভাবিক অনুভূতি হলো জেমসের। মনে হলো, চুপিসারে ভিতরে ঢুকেছে কেউ। চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু উপস্থিতি ঠিকই টের পাওয়া গেল— জিনিসটা ভীষণ অশুভ।

ভয়ে সারাশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল জেমসের।

অজিত সিংয়ের চিৎকার শোনা গেল, তার পরই কান ফাটানো শব্দে ফুটল গুলি।

দেরি না করে টর্চের সুইচ টিপলেন জেমস, পাজামার পকেট থেকে বের করে ফেলেছেন রিভলভার। পিছনের দরজার দিকে টর্চের আলো ফেলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যদি কেউ থাকো, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, নইলে গুলি করব।'

কিন্তু প্রত্যুত্তর এল না কোনও।

ঝড়ো হাওয়ার শুধু শোঁ-শোঁ ও বৃষ্টির টুপটাপ।

কবাট নেই, পিছনের ঘর এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টর্চের আলোয়। ফাটলে ভরা ছাদ, দেখা যাচ্ছে মেঘ ভরা আকাশ।

ভাগ্য ভাল যন্ত্রের বাক্সে অতিরিক্ত একটা বাল্‌ব্ ছিল। অজিত সিং বুদ্ধি করে ওটা আগেই এনে রেখেছে।

তাই আবারও বাতি জ্বলল

এবার রাইফেল বাগিয়ে ধরে গার্ড দিলেন জেমস, আর অজিত সিং ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে কপাট বসিয়ে দিল চৌকাঠে। তারপর আগের কাঠের বাক্সদুটো ঠেস দেয়া হলো।

ক্লান্তিতে দেয়ালে হেলান দিয়ে হাঁফাতে লাগল অজিত সিং। বেচারার করুণ অবস্থা দেখে মায়া হলো জেমস লিয়াসরের। হুইস্কির বোতল থেকে একটুখানি দিলেন ওকে। এতে অজিত কিছুটা চাঙ্গা হলো।

একটুকরো শক্ত কাঠ খুঁজে নিয়ে কপাটের উপর ওটা শক্তভাবে পেরেক দিয়ে লাগিয়ে দিলেন জেমস। আশা করা যায়

www.blogye.com

কেউ খুব জোরে ধাক্কা না দিলে আর খুলবে না দরজা।

কী মনে করে দরজার উপর ফুটো করে পেরেক দিয়ে টাঙিয়ে দিলেন একটা কাপড়। সামনের দরজা যেখানে ছিল, অর্থাৎ যেখানে এখন অজিত সিংয়ের গ্রাউণ্ডশিট ঝুলছে, ওখানেও একটা কাপড় ঝুলিয়ে দিলেন। এখন আর কেউ তাঁদের অগোচরে ঢুকতে পারবে না।

এবার আশ্বস্ত হলেন জেমস। মশারির ভিতর ঢুকে পড়লেন আবার, বালিশের নীচে রাখলেন রিভলভার। বাতি না নিভিয়েই ঘুমাতে গেলেন দুজনে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন বলতে পারবেন না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জেমসের। চোখ খুলে কিছুই দেখলেন না, ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিভে গেছে আলো। কয়েক মুহূর্ত বিছানায় পড়ে রইলেন তিনি, তারপর টর্চের আলো ফেললেন ল্যাম্পের উপর।

প্রথম বালবের মতই পরেরটাও ভেঙে গেছে।

ঘরের বাইরে কোনও আওয়াজ নেই, সুনসান

আগেই থেমে গেছে ঝড়।

এবার টর্চের আলোয় আশ্চর্য বিষয়টি আবিষ্কার করলেন জেমস। কাপড়ের দুই টুকরো আছে আগের মতই, অর্থাৎ কামরায় কোনি কেউ

তা হলে কী ভাবে ভাঙল বাল্‌ব?

ভেবে কূলকিনারা পেলেন না জেমস।

টর্চের আলোয় দেখলেন অজিত সিং ঘুমোচ্ছে। বেচারার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আর ডাকতে ইচ্ছা হলো না তাকে। জেমস ঠিক করলেন, বাকি রাত জেগে কাটিয়ে দেবেন। বিছানায় এলিয়ে দিলেন শরীর। হাতের কাছে থাকল রিভলভার, কান খাড়া।

বাইরে আশ্চর্যরকম নীরব। এমন কী ব্যাঙ বা ঝিঁঝিঁর ডাক নেই।

www.blogye.com

তারপর টের পেলেন, ভীষণভাবে শিউরে উঠলেন— কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। শব্দ আসছে দূর থেকে, স্পষ্ট শোনা যায় না কথাগুলো, তবে পৈশাচিক কিছু যে এগিয়ে আসছে গুটি-গুটি পায়ে, সন্দেহ নেই!

মিনিট দশেক ভুতুড়ে ফিসফিস শুনলেন। কারও গলায় কফ জমলে যেমন হয়, অনেকটা তেমন ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠ। একেবারে কাছে এল না, বুঝলেন না একটা শব্দও, তারপর থেমে গেল হঠাৎ করেই, যেমন শুরু হয়েছিল।

পিছন দরজায় আবারও আওয়াজ পেলেন করাঘাতের। তারপর হুড়মুড় করে নামল বৃষ্টি। বইতে শুরু করল ঝড়ো হাওয়া।

আরও অপেক্ষা করবার সাহস হলো না, অজিত সিংকে ডেকে তুললেন তিনি। কু গাইছে তাঁর মন— এবার ঘটবেই ঘটবে কোনও অঘটন!

মনের উপর যে অসহনীয় চাপ পড়ছে, বুঝিয়ে বলতে পারবেন না কাউকে।

এবার রাইফেল হাতে পর্দা দেয়া দরজার সামনে পাহারায় থাকল অজিত সিং। পিছনের দরজার দিকে রিভলভার তাক করে নজর রাখলেন জেমস। ঠিক তখনই মাথার উপর উড়তে শুরু করল বাদুড়গুলো। যেন ভয়াবহ কিছুর উপস্থিতি টের পেয়েছে ওরা। ঝমঝম বৃষ্টি ঝরছে, গুরুগম্ভীর শব্দে ডাকছে মেঘ। হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানিতে আলোকিত হয়ে উঠছে কামরা।

অবশ্য, আর কোনও অঘটন ছাড়াই ভোর এল।

দরজার ফাঁক গলে আলোর মৃদু রেখা আসতেই হাঁফ ছাড়লেন দুজনে। বিছানায় এলিয়ে দিলেন ক্লান্ত দেহ।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল জেমসের, তখন বাজে সাতটা।

দিনের আলোয় অনেকটা কেটে গেল ভয়।

কিন্তু অজিত সিং ইতিমধ্যে গোছগাছ শুরু করেছে। বোঝা

www.blogye.com

গেল এখানে আর থাকতে চায় না সে।

নাস্তা খাওয়া শেষে ভাল করে পিছনের ঘর পরীক্ষা করলেন জেমস। পুরনো, বিধ্বস্ত ঘর। কড়িবরগা ঝুলছে। কিন্তু এমন ভাঙা তক্তা বা কাঠ পেলেন না, যেটা দরজায় আওয়াজ করতে পারে।

অবশ্য দিনের আলোয় মনে হলো, রাতে যেসব ঘটনা অলৌকিক লেগেছে, হয়তো সেসবের কোনও ব্যাখ্যাও থাকতে পারে।

অনেকটা ঠাট্টার ছলে অজিত সিংকে কথাটা বলতেই সে এত জোরে মাথা নাড়ল, যেন মাথা খসে পড়বে।

'না, সাহেব, আর একরাতও এখানে না,' বলল সে।

জীপে মালপত্র ভরা হতেই বেরিয়ে পড়লেন দুজনে।

ভাগ্য ভাল, শহরে আসতেই যে অফিসারের কাছে পরিচয়-পত্র দিয়ে তাঁর বাড়িতে উঠতে চেয়েছিলেন, তাঁর খোঁজ পেয়ে গেলেন জেমস।

এরপর দেরি না করে ভদ্রলোকের কোয়ার্টারে উঠে পড়লেন।

সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে অফিসারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন জেমস। এসময় গতরাতের অভিজ্ঞতার কথা বললেন তাঁকে।

দারুণ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। একপর্যায়ে প্রস্তাব দিলেন, 'চলুন রাতে ভুতুড়ে বাড়িটা একবার দেখে আসি।'

একটু অনিচ্ছা নিয়ে রাজি হয়ে গেলেন জেমস।

সত্যি বলতে রাতে ওই বাড়িতে যেতে বুক কাঁপবে তাঁর।

অফিসার খুশি হয়ে বললেন, 'সঙ্গে দেশলাইয়ের কাঠি নেব, পরীক্ষা করে দেখব জ্বলে কি না।'

অজিত সিংকে কোনওভাবেই রাজি করানো গেল না। তাঁরা যেন ওই ভুতুড়ে বাড়িতে না যান, সেজন্য পই-পই করে নিষেধ করল সে।

কিন্তু রাবারের জুতো পরে দুজনে তাঁরা উঠে পড়লেন জীপে। দুজনেরই সঙ্গে রিভলভার। রহস্যময় বাড়ির উদ্দেশে যখন ছেড়ে

www.blogye.com

দিলেন জীপ, তখন রাত সাড়ে আটটা।

তবে ওই বাড়িতে পৌঁছবার আগেই তাঁদেরকে চমকে দিল ওটা।

আলো জ্বলছে ওখানে।

বিস্ময়ে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন তাঁরা।

তবে কি আবারও কোনও আগন্তুক উঠেছে ওই বাড়িতে?

যদি তাই হয়, নিশ্চয়ই কিছু না জেনেই উঠেছে অভিশপ্ত বাড়িতে, ভাবলেন জেমস। হেডলাইট বন্ধ করে এগুলেন গাড়ি নিয়ে।

কিন্তু সামনে যেতেই দেখলেন গোটা বাড়ির কোথাও লেশমাত্র আলো নেই।

'আশ্চর্য!' বিস্মিত গলায় বললেন অফিসার, 'মিনিটখানেক আগে না আলো জ্বলছিল, এরই ভিতর বাতি নিভিয়ে দিল?'

জীপ থেকে নেমে পুরো বাড়ি ঘুরলেন দুজন।

কারও টিকির চিহ্ন পেলেন না।

এমন কী কোনও গুপ্ত কামরাও নেই।

সন্দেহ করবার মত কিছুই চোখে পড়ল না।

সারাক্ষণ অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো দুজনের— যেন কেউ নজর রাখছে তাঁদের উপর, আর ভয়ংকর কিছু ঘটবে যে-কোনও সময়।

অফিসার প্রতিটি কামরায় দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সামান্যতম স্ফুলিঙ্গ তৈরি করা গেল না, আগুন ধরল না একটা কাঠিতেও। এমন কী সিগারেট লাইটার দিয়েও জ্বলল না শিখা।

কিন্তু বাইরে বাগানে দেশলাই ও লাইটার, দুটোই জ্বলল।

ওই বাড়িতে কোনও জনপ্রাণী নেই, সে বিষয়ে নিশ্চিত হলেন দুজনে। আর কারও পায়ের ছাপও নজরে এল না।

বাড়ির রহস্যভেদ না করেই দুজনে ফিরলেন জীপে। ঘড়ির

www.blogye.com

দিকে তাকালেন জেমস— রাত দশটা।

গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন। বাড়ির সামনের মোড় কেবল ঘুরছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর সঙ্গী চেপে ধরলেন জেমসের হাত। তাঁর দৃষ্টি পিছনে, বাড়ির দিকে।

গাড়ির হুইলে হাত রেখেই ঘুরে চাইলেন জেমস লিয়াসর। আশ্চর্য জনশূন্য বাড়িতে আবারও জ্বলে উঠেছে আলো!

অনাহূত অতিথি

এবারের কাহিনিটি সিংগাপুরের এক তরুণী স্কুল শিক্ষিকার। শুনব তাঁর মুখ থেকেই।

'আমাদের বাড়িতে অপ্রাকৃত কিছুর উপস্থিতি আমরা টের পাই অনেক সময়। তবে ওটা কখনও কোনও ক্ষতি করেনি আমাদের।

'কিন্তু কী কারণে জানি না, আমার এক খালার প্রতি মোটেই সদয় ছিল না ওটা।

'আমাদের বিপদে-আপদে সবার আগে যিনি এগিয়ে আসতেন, তিনি ওই খালা। তবে রাতে আমাদের বাড়িতে থাকতে তাঁর ছিল ঘোরতর আপত্তি।

'একবার তাঁকে এ বাড়িতেই রাত কাটাতে হলো। পরদিন পারিবারিক অনুষ্ঠান। প্রচুর প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল। এ অবস্থায় আমাদেরকে ছেড়ে নিজের বাড়ি ফিরে যাওয়া রাতে সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।

www.blogye.com

'কাজ গুছিয়ে শুতে শুতে বেশ রাত হয়ে গেল। আমার ছোট্ট শোবার ঘরে আমি, খালাসহ আরও ক'জন গাদাগাদি করে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে সবার শরীর।

'এদিকে অনুষ্ঠানের কাজ বেশিরভাগই গুছিয়ে নেয়ায় মনে মনে বেশ খুশি সবাই। তো এমন পরিশ্রমের পর বিছানায় গিয়ে ঘুমাতে দেরি হওয়ার কথা নয়। আমাদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হলো না।

'এভাবে ক'ঘণ্টা ঘুমিয়েছি জানি না। তারপরই ঘটল ঘটনাটি।

'সম্ভবত ভোরের প্রথম ভাগ। হঠাৎ ভয়ঙ্কর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমার। ঘড়-ঘড় শব্দ হচ্ছে। মনে হলো যেন জোর করে শ্বাসরোধ করে খুন করবার চেষ্টা করছে কে কাউকে। শিউরে উঠলাম। চোখ খুলবার সাহসও হারিয়েছি।

'শেষমেষ সাহস করে চোখ খুলে চাইলাম। দেখলাম ঘুমের ভিতর বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন খালা। আর ঘড়-ঘড় শব্দ করছেন, যেন বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছেন। সবচেয়ে ভীতিপ্রদ বিষয় হলো, তাঁর দু-হাত নিজের গলার উপর। মনে হচ্ছে কেউ যেন টিপে ধরেছে খালার গলা, আর তিনি মরণপণ লড়ছেন রেহাই পাওয়ার জন্য।

'কী করব বুঝতে না পেরে পাথরের মত বসে রইলাম। এদিকে ঘড়-ঘড় শব্দ এত বেড়ে গেছে, পাশের কামরা থেকে ছুটে এসেছেন বাবা-মা।

'তাঁদের অবস্থা আমার মতই, ভীষণ অবাক। আমাদের সামনে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটছে। আমরা দেখছি, কেউ গিয়ে সাহায্য করতে পারছি না খালাকে। মনে হলো যেন অজানা কোনও শক্তি সম্মোহন করে ফেলেছে আমাদেরকে।

'শেষপর্যন্ত হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন খালা। তাঁর দুই চোখ যেন বেরিয়ে আসবে আতংকে। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে

www.blogye.com

মুখ।

‘ “ও ঈশ্বর,” ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বরে যখন বলতে শুরু করলেন, শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। “কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল। কোনওভাবেই ছাড়াতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল আজই আমার জীবনের শেষ দিন।”

‘তাঁর কথা অবিশ্বাস করবার সুযোগ নেই। নিজ চোখে তাঁকে ওভাবে বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে দেখেছি।

‘কিন্তু এমনটা কেন হলো কিছুই বুঝলাম না। এমন অভিজ্ঞতা আর কখনোই হয়নি আমাদের কারও।

‘তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম আমরা। যদিও নিজেদেরই আতংকে আর ঘুম এল না।

‘তারপর থেকে আর কখনও আমাদের বাড়িতে রাত কাটাননি খালা।’

www.blogye.com

সাগরে ভূত

সাগরে কখনও জাহাজের নাবিককে চমকে দেয় ভুতুড়ে কোনও জাহাজ। কখনও আবার জাহাজেই হানা দেয় অশরীরী। আবার কোনও কারণ ছাড়াই হয়তো হারিয়ে যায় জলজ্যান্ত মানুষ কোনও লাইটহাউস থেকে।

সাগরের এমনি সব কাহিনি পাবেন এই অধ্যায়ে।

বাতিঘরের রহস্য

পশ্চিম স্কটল্যাণ্ডের হেবরিডসের বিশ মাইল দূরে ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জ।

১৯০০ সালের ডিসেম্বরে এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যান বাতিঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা তিনজন কর্মকর্তা। কখনোই আর তাঁদের খোঁজ মেলেনি।

এক শ' বছরের বেশি পেরিয়ে গেলেও আজও রহস্যপ্রেমীদের মনে উত্তেজনার জন্ম দেয় ওই ঘটনা।

ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের ধাঁধাতে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে গল্প, কবিতা, গান এমন কী অপেরাও।

সেন্ট ফ্লাননান নামের সপ্তম শতাব্দীর এক আইরিশ যাজকের নামে ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের নাম। বাতিঘর-তৈরির আগে, এমন কী পরেও, লোকের বসতি ছিল না দ্বীপগুলোতে। লাইট হাউস বাদে ওই খুদে দ্বীপগুলোর একমাত্র স্থাপনা বলতে ছিল ছোট্ট এক গির্জার ধ্বংসাবশেষ।

যাজক সেন্ট ফ্লাননানকে উৎসর্গ করে তৈরি হয় ওই গির্জা।

হেবরিডসের লোকদের মনে সবসময়ই কুসংস্কারের জন্ম দিত এই দ্বীপগুলো। দিনের বেলায় ভেড়া চরালেও তারা বিশ্বাস করত, এখানে রাত কাটানো ভীষণ অশুভ।

এইলেন মোর (বিগ আইল্যাণ্ড) নামের ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে বিংশ শতকের শেষ দশকে বাতিঘর নির্মাণ শুরু হয়। পুরো কাঠামো দাঁড় করাতে লেগে যায় পাক্কা চার বছর।

একে তো দ্বীপে নির্মাণসামগ্রী নিরাপদে নামানো মোটেই

সহজ কাজ ছিল না, তার উপর আবার এদিকটায় আটলান্টিক যেন সবসময়ই থাকে উগ্র মেজাজে।

ফ্লাননান দ্বীপের বুকে বাতিঘর।

অবশ্য, শেষপর্যন্ত ১৮৯৯ সালের ৭ ডিসেম্বরে উদ্বোধন হলো বাতিঘরের। ওটার সঙ্গে কোনওধরনের যোগাযোগ বা তারের ব্যবস্থা ছিল না। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল গোলাকার কিছু বলের মত জিনিস। মেঘহীন দিনে হেবরিডস থেকে ওগুলো পরিষ্কার দেখা যেত।

রহস্যের শুরু ১৯০০ সালের ১৫ ডিসেম্বরে।

স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম তীরের পোর্ট অভ গ্রীননকের দিকে ফিরছিল ছোট্ট ফ্রেইটার জাহাজ ফেয়ারউইণ্ড। দক্ষিণ-পশ্চিমে লুইস নামের একটি দ্বীপ পেরুবার সময় ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের বাতিঘরের পথ নির্দেশ করা আলোর সংকেত দেখতে পেল না জাহাজটির ক্যাপ্টেন।

www.blogye.com

ইউরোপের নিঃসঙ্গ লাইট হাউসগুলোর একটি ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের ওই বাতিঘর। সাগরের বেশ খানিকটা বিপজ্জনক এলাকায় পথ নির্দেশ করবার দায়িত্ব ওটার।

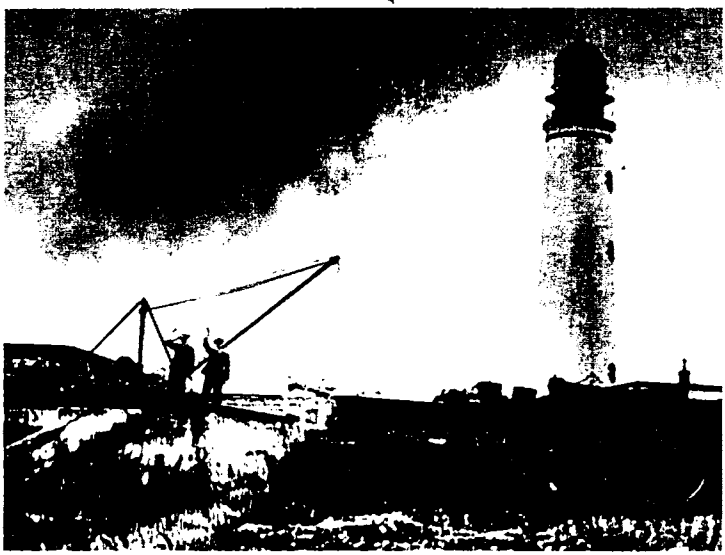

অতিথিদের বিদায় জানাচ্ছেন বাতিঘরের দুইজন রক্ষক।

কাজেই ওটার তরফ থেকে কোনও সংকেত না পেয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তে হলো জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নাবিকদের।

বন্দরে পৌঁছে ক্যাপ্টেন বাতিঘরের আলো না দেখা যাওয়ার বিষয়টি রিপোর্ট করলেন।

কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও, স্কটিশ লাইট হাউস বোর্ড তখনই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিল না। হয়তো বা কর্তৃপক্ষ ভেবেছে, কিছুদিন অপেক্ষা করাই ভাল। কয়েকদিন বাদে ২০ ডিসেম্বর রসদবাহী জানাজ হেসপেরাস এমনিতেও দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছুবে।

কিন্তু বাধ সাধল বৈরি আবহাওয়া।

www.blogye.com

বক্সিং ডে-র আগে যাত্রা শুরু করতে ব্যর্থ হলো রসদ বোঝাই জাহাজটি।

অর্থাৎ ফেয়ারউইণ্ড বাতিঘরের আলো না দেখবার এগারো দিন পর ২৬ ডিসেম্বর ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের দিকে রওনা হলো হেসপেরাস।

ক্যাপ্টেন হারভের ওই জাহাজে করে রসদ ছাড়াও দ্বীপে পৌঁছে দেবেন বাতিঘরের সহকারী রক্ষক জোসেফ মোরকে।

জাহাজে ফিরিয়ে আনবেন মোরের বদলি হিসাবে কাজ করা লোকটিকে।

দ্বীপে এখন থাকবার কথা তিনজনের— প্রধান রক্ষক জেমস ড্যুকাট, প্রথম সহকারী টমাস মার্শাল এবং সহকারী জোসেফ মোরের বদলি হিসাবে দায়িত্বরত ডোনাল্ড ম্যাকআর্থারের।

এদিকে হেসপেরাস জাহাজে খুব অস্থির হয়ে পড়লেন সহকারী বাতিঘরের রক্ষক জোসেফ মোর।

বাতিঘরের বাতি না জ্বলবার কারণ খুঁজে না পেয়ে সঙ্গীদের জন্য দুশ্চিন্তা ক্রমেই বাড়ছে তাঁর। অস্থিরভাবে বারবার ডেকে এসে দূরের দ্বীপের দিকে চাইতে লাগলেন। এমন কী সকালের নাস্তাও সারলেন না।

মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কটল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলীয় এলাকার আবহাওয়া রূঢ় থাকলেও বড় দিনের দু'দিন আগে মোটামুটি শান্ত হয়ে গেল সাগর। কোনও বিপদ ছাড়াই দ্বীপের এক মাইলের ভিতর পৌঁছে যেতে পারল হেসপেরাস। নোঙর ফেলে একটা নৌকা নামাতে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন হার্ভে।

বয়া মাস্টার ম্যাকডোনাল্ড দ্বীপের চারপাশের ন্যাভিগেশন বাতি ঠিক আছে কি না দেখবার জন্য জাহাজের ব্রিজে উঠলেন। তখনই চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তাঁর কপালে। অস্বাভাবিক বিষয় চোখে পড়েছে তাঁর। হার্ভের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন, 'তীরে জনপ্রাণীর সাড়া নেই। এটা অস্বাভাবিক লাগছে না আপনার?'

www.blogye.com

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। জানালেন, এই যে রসদ নিয়ে জাহাজ এসেছে, এখন একজন তত্ত্বাবধায়ক এসে তাঁদেরকে স্বাগত জানাবার কথা। কিন্তু বাতিঘরের সামনে কেউ নেই। হয়তো বা বাতিঘরের তিন রক্ষক কোনও জরুরি কাজে ব্যস্ত। জাহাজটার উপস্থিতি নজর এড়িয়ে গেছে তাদের।

এই ভাবনা থেকে আকাশে একটা রকেট ছোঁড়া হলো হেসপেরাস থেকে।

কিন্তু লাইট হাউসের কেউ তা দেখেছে কি না বোঝা গেল না, কোনও পাল্টা সংকেতও এল না।

বাতিঘরের সহকারী রক্ষক মুর নৌকায় চড়ে রওনা হলেন।

হার্ভে এবং অন্যরা জাহাজ থেকে তাঁকে বাতিঘরে উঠে অদৃশ্য হতে দেখলেন। কিন্তু একটু পরেই দ্রুত নৌকা নিয়ে ফিরে এলেন মুর। তাঁর চেহারাই বলে দিল, বড়সড় গণ্ডগোল হয়েছে কোথাও। মুখ থেকে সরে গেছে রক্ত। একটু সুস্থির হয়ে যা বললেন তা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হলো ক্যাপ্টেন ও অন্যদের।

ফ্লাননান দ্বীপ পরিত্যক্ত করে কোথায় যেন চলে গেছেন বাতিঘরের তিন রক্ষক।

কিন্তু লাইট হাউসে ভিতরের সব কিছুই স্বাভাবিক। বাতিগুলো ঝকঝকে তকতকে, বিছানা এলোমেলো হয়ে আছে যেন কেবলই বিছানা ছেড়ে কোথাও গিয়েছেন লাইট হাউসের সবাই। উনুনে ঠাণ্ডা ছাই, এমন কী একটা চেয়ারও উল্টে পড়ে আছে রান্নাঘরে। শোবার ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিছু খাবার।

সব দেখে মনে হয়, হঠাৎ কোনও খবর পেয়ে জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছে সবাই।

ম্যাকডোনাল্ড আর হারভে মাথা ঝাঁকালেন। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না তাঁরা। তবে কিছু যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই... কিন্তু সেটা কী?

দ্রুত স্থির করা হলো ম্যাকডোনাল্ড, নাবিক ল্যামন্ট আর

www.blogye.com

ক্যাম্পবেল দ্বীপে উঠবেন মুরের সঙ্গে। বাতিঘরের হারিয়ে যাওয়া রক্ষকদের খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কিংবা পুরো বিষয়টা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবেন তাঁরা।

দ্বীপে নেমে দেরি না করে বাতিঘরে অনুসন্ধান শুরু করলেন তাঁরা।

এসময়ই আশ্চর্য একটি বিষয় নজর কাড়ল তাঁদের।

বাতিঘরের সবগুলো ঘড়ি থেমে আছে।

আর কেবল একটা অয়েলস্কিন (পানি নিরোধক পোশাক) আছে ঘরে। অর্থাৎ বাতিঘরের সবাই কোথাও বেরিয়েছিলেন।

কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই বৈরী আবহাওয়ায় নিজের অয়েলস্কিন গায়ে চাপাননি কেন শেষজন?

এভাবে সবার গায়েব হয়ে যাওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। তার চেয়ে বড় কথা, নর্দার্ন লাইট হাউস বোর্ডের নিয়ম ভেঙে তিনজন দায়িত্ববান ব্যক্তি একইসঙ্গে বাতিঘর খালি রেখে চলে যাবেন, এ কী করে হয়!

বাতিঘরের লগবুক খুঁজে পেতে সময় লাগল না। কিন্তু ওতে পাওয়া নথিগুলো ধোঁয়াশা আরও বাড়াল।

পাঠক, বুঝবার সুবিধার জন্য বাতিঘরের রক্ষক টমাস মার্শালের রেকর্ডগুলো নীচে তুলে ধরলাম:

ডিসেম্বর ১২।

উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিমে বইছে তুমুল হাওয়া। সাগর ভীষণ উত্তাল। কখনও দেখিনি এমন ঝড়। বিশাল সব ঢেউ। যেন আছড়ে পড়ছে বাতিঘরের উপর। অবশ্য ভিতরে সবকিছু পরিপাটি। কিন্তু অকারণেই রেগে উঠছে ড্যুকাট।

এ দিন আবার লেখা হয়েছে: থামেনি ঝড়। প্রবল বাতাস আগের মতই, ভীষণ ঝোড়ো। বাতিঘর অতিক্রম করছে একটা জাহাজ। বাজানো হলো ফগ-হর্ন। চোখে পড়ল জাহাজের কেবিনের বাতি। ড্যুকাট শান্ত। কাঁদছে ডোনাল্ড ম্যাকআর্থার।

www.blogye.com

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাগর থেকে ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের বাতিঘরে ওঠা মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়।

ডিসেম্বর ১৩।

রাত ভর ঝড় হয়েছে। এখনও চলছে। বাতাস দিক পাল্টে পশ্চিম থেকে উত্তরে বইছে। ড্যুকাট শান্ত। ম্যাকআর্থার প্রার্থনা করছে। আমি, ড্যুকাট আর ম্যাকআর্থার একইসঙ্গে প্রার্থনা করলাম।

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে লগবুকের পাতায় কোনও এন্ট্রি নেই।

ডিসেম্বর ১৫।

দুপুর একটা। শেষ হয়েছে ঝড়। সাগর শান্ত। সহায় হোন ঈশ্বর।

১৫ তারিখ সন্ধ্যায় এক জাহাজের ওয়াচের চোখে পড়ে বাতিঘরের আলো জ্বলছে না। তার মানে, বাতিঘরের রক্ষকরা

www.blogye.com

অদৃশ্য হয়েছে লগ বুকের শেষ এণ্ট্রি এবং সন্ধ্যা নামবার আগের ওই কয়েক ঘণ্টার ভিতর।

বাতিঘরের মূল গ্যালারিতে উঠলেন মুরসহ অন্যরা।

লণ্ঠন ঝকঝকে-তকতকে করে রাখা হয়েছে। আলো জ্বেলে সংকেত দেয়ার জন্য পুরো প্রস্তুত। তেলও আছে প্রচুর। সন্দেহ নেই, পনেরো তারিখ সকালেও ওটার ঠিকঠাক তদারকি করা হয়েছে।

তারপর এমন কী হলো যে তিন তিনজন মানুষ বাতিঘর ছেড়ে বেমালুম গায়েব হয়ে গেলেন?

হেসপেরাস জাহাজ ফিরে যাওয়ার পর ফুল স্কেলের তদন্ত হলো ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের লাইটহাউসের তিন তত্ত্বাবধায়কের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে।

তদন্ত শেষে যে রিপোর্ট দেয়া হলো, তা সংক্ষেপে তুলে দেয় হলো:

তাঁদের অদৃশ্য হওয়ার সময়কালীন দশদিন ওই এলাকার আবহাওয়া যে খুব বৈরী ছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে।

আর এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়, ঝড়ে বাতিঘরের মূল অংশ এবং বাতির কী ক্ষতি হয়েছে তা দেখবার জন্য গ্যালারিতে ওঠেন তিনজন। এসময় বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে তাঁদের উপর ওটার তোড়েই সাগরে ভেসে গিয়ে মারা যান তাঁরা।

সংবাদপত্রগুলো নিছক দায়সারাভাবেই ছাপল ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের বাতিঘরের ঘটনা। আর যতই দিন গড়াতে লাগল, নানা কাহিনির ভিড়ে পত্রিকাগুলোর মনোযোগ হারাল উত্তর স্কটল্যাণ্ডের নিঃসঙ্গ বাতিঘর এবং তার হারানো রক্ষকদের রহস্য।

কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের কুসংস্কারে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের মন থেকে এত সহজে হারিয়ে গেল না ঘটনাটি।

তারা নিজেরা তর্ক করে ওই বিষয়ে।

কেন ড্যুকাট, মার্শাল এবং ম্যাকআর্থারের মত তিনজন পোড়

www.blogye.com

খাওয়া বাতিঘর রক্ষক একে একে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছিলেন, সে প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়ায় তারা।

সাগর কী পরিমাণ উন্মত্ত হয়েছিল তা তিন রক্ষকের চেয়ে আর কারও বেশি জানবার কথা নয়। এমন কী দুজন জায়গা ছেড়ে গেলেও অন্তত একজন তাঁর পোস্টে থাকবার কথা। আর তাই আশপাশের এলাকার লোকদের মনে একটা বিশ্বাস পাকাপোক্ত হতে লাগল: একটা জাহাজকে ঝড়ের কবলে পড়ে বিপদ সংকেত দিতে দেখেন তাঁদের একজন। সম্ভবত দলনেতা ড্যুকাট তদন্ত করতে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ঝড়ের ভিতর বের হন। তিনি ফিরে না এলে দ্বিতীয়জন ওই একই জাহাজের সংকেত দেখতে পান, তারপর তিনিও অদৃশ্য হন। আর বিস্মিত, আতংকিত তৃতীয় সহকর্মীও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

পরে লগবুকের লেখাগুলো নিয়েও বিস্তর তর্ক হয়েছে।

কারণ লগবুক কোনও ব্যক্তিগত দিনপঞ্জি নয়। ওখানে থাকবার কথা বাতিঘরের লাইটের অবস্থা এবং আবহাওয়ার খবর।

কিন্তু লগবুকে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির কিছু বিষয় চলে এসেছিল, যা অস্বাভাবিক।

বিশেষ করে সেখানে লেখা: 'ড্যুকাট অকারণেই রেগে যাচ্ছে'

মনে রাখতে হবে পদমর্যাদায় ড্যুকাট মার্শালের উপরে। অফিশিয়াল লগবুকে কেউ তাঁর বসের মেজাজ খারাপ লিখবে কেন, এ বিশাল এক প্রশ্ন। সন্দেহ নেই সব ঠিকঠাক মত চললে নর্দার্ন লাইট হাউসের বোর্ডের কাছে এ জন্য মার্শালকে জবাবদিহি করতে হতো। তা ছাড়া, খুব শান্ত ও স্থির স্বভাবের মানুষ বলে ড্যুকাটের সুনাম ছিল। অকারণে খেপে ওঠা মোটেই তাঁর স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। যদিও বৈরি পরিস্থিতিতে খুব শান্ত মানুষের মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়াও খুব অস্বাভাবিক নয়।

'ম্যাকআর্থার কাঁদছে।' 'এই' এন্ট্রি অবিশ্বাস্য। মনে হয় যেন

www.blogye.com

ম্যাকআর্থার কোনও ছিঁচকাঁদুনে ছেলে।

অথচ তাঁর সম্পর্কে যাঁরা জানেন, এক বাক্যে বলেছেন: পোড় খাওয়া দুর্ধর্ষ নাবিক তিনি। বরং মেইনল্যাণ্ডের লোকেরা তাঁকে একটু একগুঁয়ে হিসাবেই চিনত। এমন চরিত্রের লোক কেন হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে দিলেন, তাও এক প্রশ্ন।

লগবুকের শেষ কথা রীতিমত অবিশ্বাস্য।

বাতিঘরে উপস্থিত তিন রক্ষকের কেউ খোদা ভীরু হিসাবে পরিচিত ছিলেন না। তাঁরা ধর্ম-কর্ম করেছেন এমন কোনও প্রমাণও মেলেনি। তাঁরাই কি না প্রার্থনা করতে শুরু করলেন।

পরে বিষয়টি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা এক লেখক দাবি করেন, লগবুকের লেখাগুলো বানানো, আর এগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ১৫ তারিখের পরে।

সত্যি যদি তা-ই হয়, তবে কেন?

এর কোনও সঠিক উত্তর জানা নেই কারও।

কিন্তু অজানা এক জাহাজ সংকেত দিয়ে তাঁদের মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়ার মত আরও নানা গুজব ডাল-পালা ছড়াল দিনে দিনে।

কেউ বলে কোনও সাগর-দানো মানুষগুলো হারিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী।

তবে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য গুজবটি হলো: যে রাতে বাতিঘরের আলো নিভল, সে রাতে একদল অশরীরীকে দেখা গেছে বড় নৌকায় চেপে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগর পেরুতে। তারাই নাকি বাতিঘরের রক্ষকদের নিয়ে নৌকা চালিয়ে চলে যায়।

যাই হোক, ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের হারানো তিন বাতিঘর রক্ষকের হারিয়ে যাওয়ার রহস্যের যুক্তিযুক্ত কোনও সমাধা আজও মেলেনি।

শেষ করছি নর্দার্ন লাইট হাউস বোর্ডের সুপারইনটেনড্যান্ট ম্যুরহেডের একটি বক্তব্য দিয়ে। ১৯০১ সালের ৮ জানুয়ারিতে

www.blogye.com

অফিশিয়াল রিপোর্টে তিনি বলেছেন: '৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যার দিকে বাতিঘরের তিন রক্ষককে দেখতে যাই। বিষণ্ন মনে স্মরণ করতে হচ্ছে, আমিই শেষ ব্যক্তি, যে কি না তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করেছি ও বিদায় জানিয়েছি।'

এফডি ১২

ভীষণ দামামা বাজল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে একসময় শেষও হলো।

যুদ্ধপরবর্তী মন্দায় তখন বিপর্যস্ত ইউরোপের দেশগুলো।

দরিদ্রসীমার নীচে বাস করছে এমন লোকের সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে সর্বোচ্চসীমায়।

এ সময়েরই একদিনের কথা।

এপ্রিলের এক চমৎকার সন্ধ্যা।

আইসল্যাণ্ডের রিকজভিকের পোর্ট অফিসার ক্রিশ্চান জনাসন অলস সময় কাটাবার জন্য কামরা থেকে বেরুলেন। জাহাজের দড়ি বাঁধবার এক লোহার বোলার্ডের উপর পা রেখে সাগরের দিকে তাকালেন।

এসময় চোখে পড়ল দুটো নৌযান ধীরে ধীরে উপকূলের দিকে আসছে। এদের একটা স্থানীয় মাছ ধরবার বড় ট্রলার, ওটা টেনে আনছে একটা রো বোটকে।

একটু ভালভাবে খেয়াল করলে বুঝতে পারলেন জনাসন, ওই ট্রলারের পিছনে ওটা আসলে ভেসে যাওয়া কোনও নৌকা। ছোট ডেকে দুজনকে দেখতে পেলেন। একজনের পরনে সাদা অয়েলস্কিনের সুট, অপরজনের কাপড় কালো রঙের।

www.blogye.com

ধীরে-সুস্থে হেঁটে তাঁর ছোট্ট অফিসে ফিরলেন জনাসন। টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন হারবার পাইলটের সঙ্গে। তাঁকে পরামর্শ দিলেন, যেন বন্দরের চিকিৎসক তৈরি থাকেন। দ্বিতীয় নৌযানের লোক দুজন অসুস্থ হয়ে থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের সাহায্য লাগবে তাদের।

কিন্তু একটা বিষয় জনাসনকে বেশ অবাক করেছে।

ওই ছোট নৌকা, ওটাকে আগে কখনও রিকজভিকে ভিড়তে দেখেননি তিনি।

হারবার পাইলট জানতে চাইলেন, নৌকার গায়ে পরিচয়বহনকারী কোনও চিহ্ন আছে কি না।

জনাসন জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ আছে, এফডি।'

যার অর্থ: ওটা ফাগলেফজোর্ড বন্দর থেকে নিবন্ধন করা হয়েছে। কিন্তু ওটার যে সংখ্যাটি দিয়ে চেনা যেত, তা সম্ভবত মুছে গেছে।

পনেরো মিনিট পর।

সাগর লাগোয়া জনাসনের অফিস কামরায় প্রবেশ করলেন বন্দর চিকিৎসক ও হারবার পাইলট

আঙুল ঝাঁকিয়ে ট্রলারের পিছন পিছন আসা নৌযানটাকে দেখালেন জনাসন।

দেরি না করে একটা পুলিশবোটে উঠে পড়লেন তিনজন। সচল হয়ে উঠল ইঞ্জিন। কিন্তু একটু এগুতে না এগুতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল এফডি অক্ষরদুটো বহন করা নৌকা

অবিশ্বাস্য এ ঘটনা রীতিমত হতবাক করে দিল জনাসন ও তাঁর দুই সঙ্গীকে।

তীরে ভিড়েই কোপেনহেগেনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তাঁরা।

জবাবে ওঁরা যা জানালেন, তা রীতিমত অবিশ্বাস্য

জনাসনদের বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন কোনও নৌকা বা মাছ

www.blogye.com

ধরবার নৌযান ফাগলেজফোর্ড কিংবা রিকজভিকের চৌহদ্দিতে নেই।

ফ্লাননান দ্বীপপুঞ্জের ট্র্যাজেডির সাতাশ বছর পর, ১৯২৭ সালে এ ঘটনা।

এবং এর ঠিক ১০ বছর পর স্কটিশ বাতিঘর রক্ষক অ্যাঙ্গু ব্ল্যাক, স্থির মাথার জন্য সুনাম ছিল যাঁর, একটি জাহাজ দেখেন যার গায়ে পরিচয়বহনকারী সংকেত হিসাবে এফডি অক্ষরদুটো লেখা।

অ্যাঙ্গু জীবনে একটা জিনিস বড্ড ভয় পেতেন, তা সংবাদপত্রের শিরোনাম হওয়া।

ইনচকেপ রক বাতিঘরের প্রধানরক্ষক ছিলেন তিনি।

সারাক্ষণ বিশাল সব ঢেউকে বুকে পেতে নেয়া এ বাতিঘরটিকে বেল রক নামে অমর করে দেন কবি স্যুথে 'রাফ দ্য রোভার' এবং 'অ্যাবট অভ অ্যাবারব্রথক' রচনা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ব্রিটিশ রণতরী আরগিল তলিয়ে গেল, তখন জাহাজের সাড়ে নয় শ' যাত্রীর অনেককেই উদ্ধারে সহায়তা করেন অ্যাঙ্গু। কিন্তু সংবাদমাধ্যমকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন তখনও।

পরে ইনসকেপ থেকে বদলি হয়ে স্কটল্যাণ্ডের একেবারে উত্তর সীমার পেন্টল্যাণ্ড স্কেররিজ নামের একটি বাতিঘরের দায়িত্ব পান তিনি।

এদিকের সাগর এতই উত্তাল এবং ঢেউ এত প্রচণ্ড যে অনেক জাহাজ এ এলাকায় প্রবেশের পর তলিয়ে যায়।

১৯৩৬-এর শীতের এক ঝোড়ো রাত।

এসময় হঠাৎ করেই বাতিঘর থেকে দূর-সাগরে বিপদসংকেত দেখলেন অ্যাঙ্গু।

জাহাজের বাতি টিম টিম করে জ্বলছে, তারপর মিলিয়ে গেল, আবারও জ্বলল। একটা ট্রলারের ডেক থেকে আসছে সংকেত।

www.blogye.com

ঝড়ের ভিতর যে কোনও সময় তীরে আছড়ে পড়তে পারে ওটা।

রেডিওতে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন অ্যাণ্ডি। কিন্তু কোনও জবাব পেলেন না।

অপারেটর তাঁর কাজের পালা শেষ হওয়ায় চলে গেছেন।

ভোরের দিকে যখন যোগাযোগ করা সম্ভব হলো, ততক্ষণে গ্রিমসবি নামের ওই ট্রলার ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের আঘাতে পাথুরে তীরে আছড়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। মারা গেছে সব ক'জন নাবিক।

এ দুর্ঘটনা মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত করে তুলল অ্যাণ্ড্রু ব্ল্যাককে। কিন্তু এবারও আড়ালে রয়ে গেলেন, সাংবাদিকদের ধরা দিলেন না।

এর বারো মাস পর রাশান এক রণতরী অ্যাণ্ড্রুর বাতিঘরের সামনে বিপদে পড়ল। উত্তাল সাগরে বুক সমান পানি অতিক্রম করে ভোর পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন ব্ল্যাক, যতক্ষণ না জাহাজের সবাইকে নিরাপদে তীরে আনা সম্ভব হলো।

এবারও খবরের নেশাগ্রস্ত সংবাদকর্মীদের সব আবদার এক কথায় উড়িয়ে দিলেন, একটা কথাও বলবেন না তাদের সঙ্গে তিনি।

আসলে ব্ল্যাকের কাছে একজন সীম্যান হিসাবে এসবই ছিল দায়িত্ব। এ জন্য কেউ তাঁর পিঠ চাপড়ে দেবে বা সংবাদপত্রে ছবি ছাপা হবে, এসব ছিল তাঁর দারুণ অপছন্দের। আর মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার এ অভ্যাস শেষপর্যন্ত কাল হলো বাতিঘর রক্ষক অ্যাণ্ড্রু ব্ল্যাকের।

সেদিন দমকা বাতাসে ফুঁসে উঠেছে সাগর।

বিশাল সব ঢেউ আছড়ে পড়ছে বাতিঘরের উপর।

বাতিঘরের গ্যালারিতে চড়ে নাইট গগলস চোখে দিয়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরের দিকে চাইলেন অ্যাণ্ডি। একমুহূর্তের জন্য নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো না তাঁর।

একটা জাহাজ, সাদা আলোর বিপদসংকেত দিচ্ছে। পাহাড়ের

www.blogye.com

মত ঢেউয়ের মাঝ দিয়ে লাফিয়ে চলেছে, যেন তীরের কঠিন পাথরে বিসর্জন দেয়াই একমাত্র লক্ষ্য।

এমন রাতে, কোনও জাহাজের এ পথে চলবার কথা নয়, কিন্তু সত্যিই চলেছে ঝোড়ো সাগরের বুকে।

শুধু তাই নয়, ওটার বিপদসংকেত আলোও দেখছেন তিনি।

গ্যালারি থেকে হুড়মুড় করে নেমে এলেন অ্যাঞ্জু ব্ল্যাক। তাঁর দুই সহকারীকে বললেন কী দেখেছেন। মন্তব্য করলেন, 'সম্ভবত কোনও ট্রলার, যদিও ওটার আকার ও আকৃতি ভাল দেখতে পাইনি।'

দুজনকে ওখান থেকে নড়তে নিষেধ করলেন তিনি, তারপর অয়েলস্কিনের কোট গায়ে জড়িয়ে চলে গেলেন ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাতকে থোড়াই কেয়ার করে।

এরপর পানির কাছে যেতেই হঠাৎ করে অদৃশ্য হলেন তিনি।

স্কেররিজ বাতিঘরের চৌহদ্দিতে কোনও ট্রলার, এমন কী অন্য কোনও জলযান আসেনি ওই রাতে।

কোনও নাবিক বা জাহাজের ক্যাপ্টেন সতর্ক সংকেত হিসাবে আলোও জ্বালেননি।

পরে যখন বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত হলো, অ্যাণ্ডির প্রধান সহকারী জানান, তিনি দেখেছেন হারিকেন ঘোরাতে ঘোরাতে ব্ল্যাক ধীরে ধীরে সাগরের কিনারে পৌঁছে যাচ্ছেন— যেন অদেখা কোনও শক্তি অ্যাণ্ডিকে টেনে নিয়ে চলেছে। তারপর খুব উঁচু ক'টা ঢেউ এল। সেগুলো সরে যাওয়ার পর দেখা গেল অ্যাণ্ডি নেই।

চারদিন বাদে ওরকনেজে পাওয়া গেল অসমসাহসী কিন্তু হঠকারী এই বাতিঘর রক্ষকের মৃতদেহ।

স্থানীয়রা এবং নাবিকরা বলল, ব্ল্যাককে টেনে নেয়া ওই ট্রলারের গায়েও লেখা ছিল দুটো অক্ষর: এফডি।

অস্তিত্ব ছিল না এমন এক জাহাজকে সাহায্য করতে গিয়ে উধাও হন ব্ল্যাক।

www.blogye.com

এর একবছর পরের ঘটনা।

মাছ ধরবার ট্রলারের একটি ব্রিটিশ বহর 'সাউণ্ড অভ আইলে'র ভিতর দিয়ে চলেছে।

তখন মধ্যরাত।

আবহাওয়া চমৎকার।

সাগর পুকুরের মতই শান্ত।

হুইলে বসা মেটের জন্য কফি এনে রাঁধুনি বলল, 'অপরিচিত এক ট্রলার আমাদের বহরের দিকে আসছে। মেট, আপনি কি ওটাকে দেখেছেন?'

মাছ ধরবার নৌবহরের ট্রলারের সবাই ভুতুড়ে ওই নৌযানটাকে দেখেছে।

ওই ট্রলারের ধোঁয়া উঠবার চিমনিতে একটি সুপরিচিত মাছ শিকারী কোম্পানির কাল-সাদা-লাল চিহ্ন।

তবে নৌযানটিতে কোনও মানুষ চোখে পড়েনি না কারও।

ট্রলার বহর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওটার রেজ্রিস্ট্রেশন নাম্বার পরিষ্কার চোখে পড়ল:

এফডি ১২।

মাছ ধরবার ট্রলার বহরটিকে পেরুবার একটু পরেই গায়েব হয়ে গেল ওটা এতগুলো লোকের চোখের সামনে থেকে।

যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে ওই ট্রলার।

অবশ্য, পরে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল আশ্চর্য এক তথ্য।

ওই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের কোনও জাহাজ বা নৌযান ইউরোপের কোনও কোম্পানির নেই।

www.blogye.com

সুগন্ধি ভূত

জর্জ ম্যানলে অলরিজ ও প্যাডেল-চাকার প্রাক্তন ডাক সরবরাহ-কারী জাহাজ ফারির ভিতর ছিল মাত্র একটা মিল।

তা তাদের বয়সে।

ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ইতিহাসের এক কঠিন সময়ে দুজনেরই জন্ম।

বেশ ক'টি যুদ্ধের ধকল সামলে উঠছে তখন দেশ।

সাগরে ব্রিটিশদের ভবিষ্যত রীতিমত অনুজ্জ্বল ও নিরাশাজনক মনে হচ্ছিল।

পনেরোতম জন্মদিনের ঠিক পরের দিন রাজকীয় নৌবাহিনীর চাকরিতে যোগ দেন অলরিজ। পরের বছর নৌবাহিনীর জরিপ বিভাগে বদলি করা হলো তাঁকে।

যে ক'টা বছর চাকরি করেন, নৌবাহিনীতেই কাটান অলরিজ।

এবার আসা যাক ১১২ টনের জাহাজ ফারির কথায়। ওটার ইঞ্জিন ১২০ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন। ৮৯ ফুট ৭ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের জাহাজ প্রস্থে ১৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। গভীরতা খুব বেশি নয়, ৮ ফুট এগারো ইঞ্চি।

মোটের উপর ছোটখাটো জাহাজই বলা চলে। হাডসন নদীতে চলাচল করা এক টাগবোট থেকে সামান্য বড়। ডাক বহনকারী জাহাজ হিসাবে রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল ওটার।

রিনস অভ গ্যালোওয়ে নামে পরিচিত উপকূলে হাতুড়িমাথা চেহারার এক এলাকার পশ্চিম অংশে স্কটল্যাণ্ডের উইগটাউন-শায়ারের বন্দর প্যাট্রিক। ওই আইরিশ সাগরে চিকন এক জমির ফালি ডোনাগহাডি এবং বন্দর প্যাট্রিকের মাঝের ৪৭ মাইল সমুদ্রপথে নিয়মিত ডাক ও ক'জন যাত্রী নিয়ে পাড়ি দিত ছোট জাহাজ ফারি।

পুরনো দিনের নাবিকরা ঘৃণায় নাক কুঁচকে বলত, 'টিনের কেতলি।'

এদিকে বন্দরের অনেকে বলত, জাহাজটার বয়স হয়েছে, আর ওটার গা থেকে জীবাণুর গন্ধ পায় তারা।

কিন্তু বাষ্পচালিত জাহাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখত যারা, তাদের আবার ভারী প্রিয় ছিল ওই ফারি।

তারা ওই জাহাজের দিকে তাকাত শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে। ওটা এমন একসময়ে তৈরি হয়েছে, যখন পালকে পিছু হটিয়ে রাজত্ব কায়েম শুরু করেছে বাষ্পচালিত নৌযান।

আবারও আসা যাক অলরিজের প্রসঙ্গে।

১৮৩৬ সালের জুনে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট হিসাবে পদোন্নতি হলো অলরিজের। এজন্য সাতটি বছর শিক্ষানবিশ হিসাবে নৌবাহিনীতে কঠিন ও কষ্টকর সময় পার করতে হয়েছে তাঁকে।

সাগরবিদ্যা এবং নৌ জরিপে দারুণ দক্ষ কর্মকর্তায় পরিণত হন অলরিজ এ সময়ে।

একের পর এক পরীক্ষা উৎরে যান, যে কারও মনে হতে পারে, এ তরুণের জন্মই হয়েছে এ ধরনের কাজ করবার জন্য।

অবশ্য কেউ বলবেন না অলরিজ খুব প্রতিভাধর।

এটা বলা যায়, তিনি ক্রমেই নির্ভরযোগ্য লোক হিসাবে পরিচিতি পান। যে-কোনও কাজ দিলে ভরসা করা যেত তাঁর উপর।

১৮৩৭ সাল।

www.blogye.com

অলরিজের বয়স তখন ২২ বছর।

নৌবাহিনীর হাতে প্যাডেল-চাকার জাহাজটিকে হস্তান্তরের প্রস্তাব দিল ব্রিটিশ ডাক বিভাগ।

সানন্দেই রাজী হয়ে গেল নেভি।

জাহাজের নতুন নাম হলো: এইচ.এম.এস. অ্যাসপ।

জরিপ বিভাগে যোগ দেয়ার আগে সব ঠিকঠাক আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য জাহাজ পাঠানো হলো মেরামত কারখানায়।

কিন্তু জাহাজের ভিতর অস্বাভাবিক কিছু ছিল।

ব্যাখ্যা করা যায় না এমন কিছু।

জাহাজটির ইতিহাস যাঁদের জানা আছে, তাঁরা এ বিষয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করতেন না।

১৮৫০ সালে অলরিজ লেফটেন্যান্ট হিসাবে পদোন্নতি পাওয়ার ছয় বছর পর, জাহাজের অধিনায়কের দায়িত্ব দেয়া হলো তাঁকে।

তল্পিতল্পা গুটিয়ে লণ্ডনের বাড়ি থেকে পেমব্রোকে নৌবাহিনীর ডক ইয়ার্ডে চলে এলেন তিনি। প্রথম কোনও জাহাজের দায়িত্ব পেয়ে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন।

অবশ্য জাহাজটাকে প্রথমবার দেখে দীর্ঘশ্বাস বেরুল তাঁর বুক চিরে। অ্যাসপ কোনও যুদ্ধজাহাজ নয়। কোনও অস্ত্র বা গোলাবারুদ বহন করছে না। চেহারার ভিতর মোটেও দুর্ধর্ষ ভাব নেই। বোকার মত অলরিজ আশা করেছিলেন রণতরী পাবেন।

অ্যাসপ কেবল প্যাডেল-হুইলার, যৌবন পেরিয়ে গেছে, অবশ্য মোটের উপর শক্তপোক্ত গড়নের ছোট জাহাজ।

অবশ্য জরিপের কাজে ব্যবহার করা জাহাজ এমনই তো হওয়ার কথা, নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন অলরিজ।

আগাগোড়া অকৃপণভাবে সবুজ রং করা। বেসামরিক জাহাজের পতাকার জায়গায় এখন রাজকীয় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর

www.blogye.com

পতাকা। অবশ্য কেউ সহজে বুঝবে না ওটা সরকারী জাহাজ।

নোঙর ফেলা জাহাজটাকে আরেকবার দেখে নিয়ে ডক ইয়ার্ডের সুপারইনটেনড্যান্টের অফিসে ঢুকে পড়লেন অলরিজ। তারপর নিজের পরিচয় দিতেই অপর প্রান্ত থেকে যা শুনলেন, তা রীতিমত চমকে দিল তাঁকে।

ভদ্রলোক দাবি করলেন, অলরিজকে যে জাহাজ দেয়া হয়েছে, ওটা ভীষণ ভুতুড়ে জাহাজ।

ওই দিন থেকে ১৮৭০ সালের ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত হলিহেড ও ডাবলিনের ভিতর যাতায়াত করেছে তাঁর ওই জাহাজ।

লিভারপুল, মিলফোর্ড হেভেন, ব্রিজওয়াটার থেকে শুরু করে অ্যান'স হেড, স্টেপোল হেড, ব্রান্সটেপল বে, ডেভনসহ আশপাশের সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় জরিপসহ নৌযানের গতিবিধির খবর সংগ্রহ করাই ছিল অলরিজের দায়িত্ব।

জমকালো কিছু নয়, নৌবাহিনীর সাধারণ জরিপের অংশ হিসাবে এ কাজ করা হতো। যদিও পরবর্তী বছরগুলোতে বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ ধরনের জরিপ সাগরে বিচরণ করা সব জলযান আর এর নাবিকদের প্রধান রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে।

অলরিজ ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পাওয়া এবং রাজকীয় নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকায় নাম ওঠাবার তিনবছর আগের একটি দিন।

জ্যাকেট খুলে আরাম কেদারায় শরীর ছেড়ে দিলেন অলরিজ, ছড়িয়ে দিলেন লম্বা পাদুটো। সেদিন সকালে পাওয়া চিঠি আবারও পড়তে শুরু করলেন। গার্ডিয়ান পত্রিকার এক সাংবাদিক একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার চেয়েছেন।

বেশিরভাগ নাবিকের মতই প্রচার ও সাংবাদিক দুটোই অপছন্দ অলরিজের। তবে মনের তাগিদে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে আপত্তি নেই তাঁর। কাগজের একটা তোড়া টেনে নিয়ে, কালিতে

www.blogye.com

কলম চুবিয়ে শুরু করলেন চিঠিটা লিখতে।

উপরে দিলেন সেদিনের তারিখঃ মার্চ ১৫, ১৮৬৭।

'স্যর, আপনার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, আমার জাহাজের ব্যাখ্যাতীত সে প্রেতাত্মা সম্পর্কে যতটুকু জানা আছে, তা প্রকাশ করতে কোনও আপত্তি নেই আমার। একে ভূত, আত্মা কিংবা যা ইচ্ছা বলতে পারেন, তবে এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, যা ঘটেছে তা আমি এখানে বর্ণনা করছি। সত্যি কথা বলতে ভূত, আত্মা এসবের গল্পে আমি নিজেও ছিলাম ঘোরতর অবিশ্বাসী।

'প্রাকৃতিক কারণে অনেক কিছু আবার হারিয়ে গেছে স্মৃতির অতলে। তা ছাড়া, এ জাহাজের দায়িত্ব পাওয়ার পর অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে। সঠিকভাবে প্রতিটি তারিখ তাই মনে রাখা কঠিন। তবে স্মৃতি হাতড়ে যতটুকু মনে পড়ছে, তা স্মরণ করছি এখন।

'১৮৫০ সালে জরিপ কাজ চালানোর একটি জাহাজ হিসাবে আমাকে অ্যাসপ জাহাজটি দেয়া হয় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে ওটার দখল বুঝে নিতে গেলাম যখন, ডক ইয়ার্ডের সুপারইনটেনড্যান্ট ভদ্রলোক বললেন, "আপনার কি জানা আছে, আপনার এ জাহাজটি ভুতুড়ে? এটার কাজ করার জন্য ডকের কোনও লোককে দীর্ঘ সময়ের জন্য পাবেন না।"

'জবাবে আমি হেসে বললাম, "আমি ভূত-প্রেত এসবকে ভয় করি না।"

'অ্যাসপকে পুরোপুরি কাজের উপযোগী করে তুলবার জন্য কিছু সংস্কার তখনও বাকি। জাহাজ নির্মাতাদের এতে লাগিয়ে দিলাম দেরি না করে। কিন্তু সপ্তাহখানেক কাজ করবার আগেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এল তারা, অদ্ভুত এক আবদার করল। জাহাজটাকে যেন সাগরে না নামাই। কারণ ওটা ভুতুড়ে। এর পক্ষে মন্দভাগ্য ছাড়া আর কিছু বয়ে আনা সম্ভব নয়। তবে একসময় জাহাজের সারাই শেষ হলো। নিরাপদে যখন ওটাকে ডি

www.blogye.com

নদীতে নামানো হলো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'এখান থেকেই নতুন দায়িত্ব শুরু করবে অ্যাসপ।

'সন্ধ্যায় চা পানের পর সাধারণত নিজের কেবিনে বসি। হয় নিজে কিছু পড়ি, নতুবা চোখকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য আমার এক অফিসারকে বলি যেন জোরে জোরে (এখন ম্যাজিশিয়ান জাহাজের ক্যাপ্টেন।) কিছু পড়ে শোনায়।

'যদিও পরে এ পড়বার বিষয়টি বেশ ঝামেলাকর হয়ে উঠল।

'প্রায়ই এ সময় অদ্ভুত শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম আমরা। প্রায় মনে হতো কোনও মাতাল ওই শব্দের জন্য দায়ী। টলোমলো পায়ে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেলে এমন আওয়াজ হয়। আর শব্দের উৎস যেন পাশের কেবিন।

'দুটো কেবিন পরস্পর আলাদা করা জাহাজের মই দিয়ে। কেবিনের দরজা মুখোমুখি। ফলে আমার কেবিনে বসেই ওদিক দেখতে পেতাম। দুই কেবিন এবং জাহাজের বাকি অংশের সঙ্গে মই ছাড়া আর কোনও সংযোগ নেই। ওই মই বেয়ে কেউ উঠতে কিংবা নামতে গেলে আমার চোখে পড়বেই।

'ডি নদীতে আমাদের পৌঁছবার দু-একদিন পরের এক সন্ধ্যা।

'কেবিনে বসে আছি। একটু আগে যে অফিসারটির কথা লিখেছি, সে বই পড়ে শোনাচ্ছে। এসময় ওদিকের কেবিন থেকে প্রচণ্ড টানা শব্দের নীচে চাপা পড়ে গেল অফিসারের কণ্ঠ। সে প্রথমে কাণ্ডটা স্টুয়ার্ডের ভেবে বলল, "এখানে শব্দ করবে না!"

'তারপরই থেমে গেল আওয়াজ। কিন্তু যখনই আবার পড়া শুরু করল অফিসার, শোনা গেল সেই একই শব্দ।

"স্টুয়ার্ড, তোমার কি মাথা খারাপ? কী ব্যাপার, এমন চিৎকার করছ কেন!" রাগে চেঁচিয়ে উঠল অফিসার।

'তারপরই আমার টেবিল থেকে বাতি নিয়ে পাশের কামরার দিকে ছুটে গেল সে। তবে যত দ্রুত গিয়েছিল তার চেয়েও দ্রুত ফিরল।

www.blogye.com

'কোনও জিনিস বা কাউকে দেখেছে কি না জানতে চাইলে বলল, কিছুই দেখেনি। তাকে বেশ বিচলিত মনে হলো। একটু দ্বিধা করে আবারও পড়তে শুরু করল সে। কিন্তু আবার সেই রহস্যময় আওয়াজ এসে বাধা দিল।

'আমি নিশ্চিত হলাম ওই কেবিনে ঢুকেছে কোনও মাতাল। তাড়াহুড়ার কারণে অফিসারের চোখ এড়িয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে এবার নিজেই কেবিনের দিকে রওনা হলাম। আর ওটায় ঢুকেই চমকে গেলাম, কেবিন শূন্য। কোনও জনপ্রাণী নেই সেখানে।

'সে সন্ধ্যার পর থেকে নিয়মিত হতে লাগল শব্দ। তবে এর চরিত্র আর মাত্রায় হেরফের থাকল। কখনও মনে হলো আলমারির দেরাজ জোরে বাড়ি খাচ্ছে, কখনও মনে হলো পানপাত্রগুলো রাগে আছড়ে ভাঙছে কেউ।

'প্রথম যখন সমস্যাগুলো হলো, জাহাজ ছিল তীর থেকে প্রায় একমাইল দূরে। কাজেই বাইরে থেকে এসে কেউ এ কাজ করবে তা অবিশ্বাস্য।

'এক সন্ধ্যার ঘটনা। আমি এবং আগে উল্লেখ করা অফিসার চা পানের দাওয়াতে গিয়েছি চেস্টারের কুইন'স ফেরির কাছের এক বন্ধুর বাড়িতে। কুয়ে গির্জার ধারে এক জায়গায় নদীতে নোঙর করে রাখা জাহাজটি। রাত আনুমানিক দশটার দিকে ফিরে এলাম দুজন। মই বেয়ে নামছি এমন সময় পরিষ্কার শুনলাম, কেউ একজন অপর কেবিন থেকে আমার কেবিনের দিকে ছুটে গেল। আমার পিছনে মইয়ের উপরে থাকা অফিসারকে ফিসফিস করে বললাম, "তুমি এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। মনে হয় এবার হারামীটাকে ঠিকই ধরব।" তারপর আমার কামরায় নেমে গিয়ে বিছানার পাশে ঝুলানো তলোয়ারটা তুলে নিলাম। উপরে উঠে অফিসারের হাতে তলোয়ার ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "তোমার পাশ দিয়ে কাউকে যেতে দেবে না। পালাবার চেষ্টা করলে দু'টুকরো করে ফেলবে। সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার।"

www.blogye.com

'কেবিনে ফিরে বাতি জ্বেলে তন্নতন্ন করে চারপাশ খুঁজলাম। কিন্তু রহস্যময় শব্দের কোনও উৎস খুঁজে পেলাম না। শান্ত কণ্ঠে অফিসারকে বললাম, "এ কামরায় কাউকে পাব যত নিশ্চিত ছিলাম, জীবনে আর কোনও বিষয়ে এত নিশ্চিত ছিলাম না।" কাজেই অন্তত শ'খানেক বার লোকেরা যা বলেছে, তাই বলা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না, "হ্যাঁ, আমার এই জাহাজে ভূত আছে।"

'রাতে যখন বিছানায় শুয়ে থাকতাম, প্রায়ই কাছে-ধারেই শব্দ হতো। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খোলা-বন্ধ করবার, কেবিনের ওপরে রাখা পানির বড় পাত্র উপরে তুলবার আর ধপ করে নামাবার, আমার কামরার বাইরে রাখা বিছানা টেনে সরানোর—এমন নানা শব্দ।

'কোনও সন্ধ্যায় কেবিনে বসে থাকা অবস্থায় একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেতাম, মনে হতো আমার মাথার পাশে কোনও পারক্যুশান ক্যাপ খুলছে কেউ। অনেক সময় অদেখা অস্তিত্বের উপস্থিতি টের পেতাম পাশে। কখনও ওটা যেখানে আছে বলে মনে হচ্ছে, সেখানে হাত রাখতাম। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো, এখন বলতে গিয়ে অবাকই লাগছে, এতসব ঘটনা ঘটলেও আমার মধ্যে কোনও ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হতো না। যেন যা শুনছি বা যার উপস্থিতি টের পাচ্ছি, সে বিষয়ে মোটেই জানি না।

'একরাতের ঘটনা। মার্টিন রোডস এলাকায় নোঙর ফেলেছে জাহাজ। হঠাৎ জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার ঘুম থেকে ডেকে তুলল আমাকে। তার সঙ্গে ডেকে যাবার অনুরোধ করল। তারপর জানাল প্রহরী নাবিক নীচের ডেকে দৌড়ে এসে জানিয়েছে, প্যাডেল-চাকার ঢাকনির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে এক নারী-মূর্তিকে। একটা আঙুল আকাশের দিকে তাক করা মহিলাটির।

'এমন অদ্ভুত কথা শুনে মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেল আমার।

www.blogye.com

রেগে-মেগে কোয়ার্টার মাস্টারকে বললাম, সে যেন আবারও ডেকে প্রহরীকে ফিরে যেতে বলে। দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত সেখানেই থাকতে হবে তাকে। কিন্তু আমার কথা শুনতে গিয়ে প্রহরীর সঙ্গে ভয়ানক তর্কে জড়িয়ে পড়তে হলো কোয়ার্টার মাস্টারকে। বাধ্য হয়ে আমাকেই ডেকে উঠতে হলো। সকাল পর্যন্ত সেখানেই থাকলাম।

'ভৌতিক ছায়া-মূর্তিটিকে এরপর থেকে মাঝে মাঝেই দেখা যেতে লাগল। সবাই জানাল, তাকে ওই একই ভঙ্গিতে আকাশের দিকে আঙুল উঁচু করে থাকা অবস্থায় দেখেছে।

'এক রবিবার বিকালে লরেনির উল্টো পাশে হেভারফোর্ড-ওয়েস্ট নদীতে দাঁড়িয়ে ছিল জাহাজ। নাবিকেরা সবাই তখন তীরে, আর আমি গিয়েছিলাম গির্জায়। জাহাজে লোক বলতে কেবল স্টুয়ার্ড। মই বেয়ে নামবার সময় একটা কণ্ঠ শুনতে পেল সে, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। শূন্য থেকেই যেন আসছে শব্দটা ভয়ে জ্ঞান হারাবার অবস্থা তখন তার। যখন জাহাজে ফিরলাম, ওকে দেখে চমকে উঠলাম, কী ভয়ঙ্কর ভয়ে নীল হয়ে গেছে! যখন কথা বলবার মত সুস্থির হলো, চাকরি ছাড়বার অনুমতি চাইল অনুরোধ করল, যতদ্রুত সম্ভব তীরে নামিয়ে দিতে। কোনওভাবেই আর একরাতও থাকতে রাজি হলো না। শেষে বাধ্য হয়ে তাকে নামিয়ে দিতে হলো তীরে

'আমার জাহাজ যে ভুতুড়ে, এ গল্প ছড়িয়ে পড়ল তীরেও। একদিন লরেনির যাজক জাহাজে এসে বিনীতভাবে আমার লোকদের প্রশ্ন করবার অনুমতি চাইলেন। এখানকার নাবিকদের সঙ্গে কথা বলবার পর, যাজক যে গোটা বিষয়টাকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন, তা তাঁর কথা শুনেই বুঝলাম। জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার আগে ভদ্রলোক বললেন, "সন্দেহ নেই অতৃপ্ত কোনও আত্মা জাহাজ ছেড়ে যেতে পারছে না।"

'অ্যাসপে যে বছরগুলো চাকরি করেছি, বেশকিছু লোক

www.blogye.com

হারাতে হয়েছে আমাকে। অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়েও তাদেরকে চাকরিতে রাখা যায়নি।

'অবশ্য আমি বুঝতে পারি বিষয়টা। এতই আতংকিত হয়ে পড়েছিল যে এই জাহাজে চাকরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সবার গল্প একই, রাতে স্বচ্ছ দেহের এক নারীকে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। একজনের পর একজন নাবিক জাহাজ ছেড়ে দেয়ায় আমাকে বেশ বিপাকে পড়তে হলেও অনেকগুলো বছর হেসে আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বিষয়টাকে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমি দেখেছি, সন্ধ্যার পর অফিসাররা জাহাজ ছাড়বার পর একজন নাবিকও কেবিনের ভিতর উঁকি দেয়ার স্পর্ধা দেখাত না।

'একরাতে ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কী কারণে ঘুম চটে গেল। একটা হাত আলতোভাবে পড়ে আছে আমার পায়ের উপর। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে জিনিসটার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। তারপর আঁকড়ে ধরলাম ওটাকে, কিন্তু কিছুই ধরতে পারলাম না। বেল চেপে কোয়ার্টার মাস্টারকে ডাকলাম। একটা লণ্ঠন হাতে একটু পরেই হাজির হলো সে। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলাম না আমরা। এমন অভিজ্ঞতা বেশ কয়েকবার হয়েছে আমার। তবে একবার সীমা ছাড়িয়ে গেল।

'সেবার ঘটল জেগে থাকবার সময়। ঘুম আসছিল না, বিছানায় শুয়ে আছি চুপচাপ। হঠাৎ কপালে শীতল এক হাতের স্পর্শ। মাথার সব ক'টা চুল খাড়া হয়ে গেল আমার, সম্ভবত জীবনে এই প্রথম। লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। কিন্তু তারপর আর ওটার উপস্থিতির কোনও চিহ্ন পেলাম না। এমন কী একটা শব্দও নয়।

'এর আগ পর্যন্ত ভূত-প্রেত কিংবা যেসব নামে এদের আপনারা ডাকেন, এসবে বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না আমার। বরং

www.blogye.com

সত্যি বলতে, নানা অদ্ভুত শব্দ শুনতে বেশ লাগত। কখনও আওয়াজটা খুব চড়া হলে বেল বাজিয়ে প্রহরীকে ডাকতাম। তারপর কান পেতে রাখতাম পায়ের আওয়াজ কিংবা ছুটে পালানোর শব্দ শুনবার জন্য। কিন্তু কখনোই এমন কিছু শুনতে পাইনি। বরং জায়গা ছেড়ে প্রহরীর কেবিনের দিকে এগিয়ে আসবার আওয়াজ পেতাম একটু পরেই। তখন বাতাসের অবস্থা, আবহাওয়া ইত্যাদি সব রুটিন প্রশ্ন করে চলে যেতে বলতাম তাকে।

'১৮৫৭ সালে, জাহাজটার কিছু সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে। পেমব্রোকে ডকের প্রাচীর ঘেঁষে ওটাকে রাখবার নির্দেশ দিই তখন। কাণ্ডটা ঘটে প্রথম রাতেই। জাহাজের ধারেই তীরে পাহারা দিচ্ছিল এক সৈনিক। এসময় তার নজরে পড়ল প্যাডেল-চাকার ঢাকনির উপর দাঁড়িয়ে আছে এক নারী, তার ডান হাত উঁচু হয়ে আছে আকাশের দিকে।

'এই দেখে সৈনিকের এমনিতেই ভীষণ ভয় লাগছিল, তার উপর দেখল ডাঙায় নেমে আসছে ভয়াবহ সেই ছায়ামূর্তি। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো না লোকটার, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওটা তারই দিকে হাতের মাস্কেট বন্দুকটা তুলেই চেঁচিয়ে উঠল সে, "কে? কে... যায়?"

'কিন্তু ভুতুড়ে মূর্তি বুক পেতে সোজা বন্দুকের দিকেই চলেছে। এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না সৈনিক, বন্দুক মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে গার্ড হাউসের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল।

'এদিকে দ্বিতীয় সৈনিক সবই দেখছিল। এবার সঙ্গীর আতঙ্ক সংক্রামিত হলো তার মধ্যে। অবশ্য, মাথা ঠাণ্ডা রাখল সে। ঘুমন্ত প্রহরীদের জাগিয়ে তুলবার জন্য বন্দুক তুলে ফাঁকা গুলি করল সে। পেটের ওল্ড চার্চের ধ্বংসাবশেষের ধারে পাহারায় ছিল তৃতীয় সৈনিক। ভুতুড়ে ছায়ামূর্তি তার পাশ দিয়ে ভেসে ভেসে যেতে দেখল লোকটা। তারপরই গির্জার গোরস্থানের এক সমাধির

www.blogye.com

উপর চড়ল ওটা, এক আঙুল আকাশমুখী। কয়েক মুহূর্ত এভাবেই থাকল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

'গুলির শব্দে কী ঘটেছে দেখবার জন্য ছুটে এলেন প্রহরীদের সার্জেন্ট। ভীত-সন্ত্রস্ত সৈনিকরা তাঁকে জানাল কী ঘটেছে। তারা এতই আতংকিত হয়ে পড়ল, প্রহরীর সংখ্যা দ্বিগুণ করবার পর কেবল ডক ইয়ার্ডের আশপাশের এলাকায় পাহারায় পাঠানো গেল তাদেরকে।'

এবার অলরিজের চিঠি থেকে একটু সময়ের জন্য অন্য দিকে দৃষ্টি সরানো যাক। যে সন্ধ্যায় স্টুয়ার্ড অ্যাসপে একা ছিল, তখনকার কথা এটি। আশ্চর্য একটা শব্দ শুনে আওয়াজ কীসের পরীক্ষা করতে কেবিনে নেমে আসে সে। ডেকে ফিরে যাওয়ার আগে চুপচাপ স্থির দাঁড়িয়ে চারদিকে শেষবারের মত চোখ বোলায়, আর ওই নীরবতার মাঝে অদ্ভুত ও রীতিমত অস্বাভাবিক একটি শব্দ কানে আসে তার।

দূর থেকে ভেসে আসবার শব্দ ওটা। যেন কোনও নারী পট পট শব্দ করে শীতের রাতে আঁচড়াচ্ছে চুল।

পরিষ্কারভাবে চিরুনি চুলের উপর বুলানোর আওয়াজ।

আতংকিত হয়ে পালাবার একমুহূর্ত আগে, মাতাল করা মিষ্টি এক সুগন্ধির সুবাস পেল সে, সাধারণত নাচবার সময় এমন সুগন্ধি ব্যবহার করে মেয়েরা।

যখন পড়িমরি করে ডেকের দিকে ছুটছে স্টুয়ার্ড, তখনই মৃদু কিন্তু বিদ্রূপাত্মক হাসির আওয়াজ শুনল সে। তারপর ধস্তাধস্তি ও তীক্ষ্ণ চিৎকার, আর এর শেষ হলো গা শিউরানো ঘড়ঘড় শব্দে। তারপর শান্ত হয়ে গেল চারপাশ।

আবার অলরিজের চিঠিতে ফিরে আসছি:

'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সৈনিকদের সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার

www.blogye.com

রাতের পর থেকে অ্যাসপে আর দেখা গেল না নারীমূর্তিকে। তাকে সত্যি যদি দেখা যেত, কেউ না কেউ নিঃসন্দেহে খবরটা কানে তুলত আমার। এমন কী যন্ত্রণাদায়ক নানা শব্দও আর শুনতে পেলাম না।

'অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমার জাহাজ ভুতুড়ে হওয়ার রহস্যের সঙ্গে যোগ থাকতে পারে, এমন একটা সূত্রই কেবল বের করতে পেরেছি। তাই এখন লিখছি।

'আমার দখলে আসবার কয়েক বছর আগে পোর্ট প্যাট্রিক এবং ডোনাগহেডির মধ্যে ডাক আনা নেয়ার কাজ করত অ্যাসপ। সেসময় একইসঙ্গে কিছু যাত্রীও বহন করত জাহাজটি। এমন এক ভ্রমণ শেষে, সব যাত্রীকে নামিয়ে দেয়ার পর, একজন স্টুয়ার্ড মেয়েদের কেবিনে ঢোকে। ওটার ভিতরে প্রবেশ করেই আঁতকে ওঠে সে। সুন্দরী এক যুবতী পড়ে আছে এক স্লিপিং বার্থের ওপর, কেউ নির্মমভাবে ফাঁক করে দিয়েছে তার গলা, ভেসে যাচ্ছে চারপাশ রক্তে। সন্দেহ নেই, কিছু সময় আগেই মারা গেছে সে, আর মৃত্যুটা নিঃসন্দেহে ছিল প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক। কী ভাবে তার মৃত্যু হয়েছে বা কারা এর পিছনে ছিল, তার কিছুই জানা যায়নি। যদিও বেশ দ্রুত তদন্তকারী কর্মকর্তারা মাঠে নেমেছিলেন। সবচেয়ে অবাক বিষয়, মেয়েটার পরিচয় কী, কোথা থেকেই বা এসেছে, এর কিছুই জানা যায়নি।

'এমন কাণ্ডের পর ঘটতে শুরু করে একের পর এক ভুতুড়ে ঘটনা। রীতিমত আলোড়ন তোলে। মানুষের মধ্যে নানা কানাঘুষা শুরু হয়। বাধ্য হয়ে স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে ডাক আনা নেয়ার কাজ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় অ্যাসপকে। নাম বদলে জাহাজটা রাজকীয় নৌবাহিনীর জরিপ বিভাগে আমার অধীনে দেয়ার আগ পর্যন্ত এটা আর সাগরে নামানো হয়নি।

'এখানেই আমার কাহিনি শেষ। আবারও বলছি, আমার প্রতিটি কথা নির্জলা সত্যি। সন্দেহ নেই, এমন ভুতুড়ে কাহিনি

www.blogye.com

বিশ্বাস করে বসায় আমার জন্য করুণা হতে পারে অনেকের। কিংবা উপহাসের হাসি হাসতে পারেন তাঁরা। তবে চাইলেই তাঁরা অ্যাসপের বিভিন্ন সময়ে চাকরি করা নাবিক, অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে এইচ.এম.এস., অ্যাসপে ঘুরে বেড়ানো ভুতুড়ে নারীমূর্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন।'

জর্জ মেনলে অলরিজ অবসর নেয়ার পর স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন ডেভনশায়ারের পেউগনটনে, সেখানেই ১৯০৫ সালের ২১ মার্চ মারা যান।

দীর্ঘদিন নৌবাহিনীর জরিপের অংশ হিসাবে অ্যাসপ জাহাজে কাজ করবার পর চাথাম ডক ইয়ার্ডের সংস্কার কাজ তদারকির দায়িত্ব পালন করেন, ১৮৬৯-৮০ সাল পর্যন্ত।

ওখানেই ১৮৮১ সালে চাকরি থেকে অবসর নেন।

দড়ি নামাও!

১৬৬৪ সাল।

সোসাইটি নামের একটি জাহাজ চলেছে ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন থেকে আমেরিকার ভার্জিনিয়ার উদ্দেশে।

জাহাজের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন রজার্স।

যাওয়ার সময় অনেকটা খালি যাচ্ছে জাহাজ, তার কারণ ফিরতি পথে ভার্জিনিয়া থেকে তামাক বোঝাই করবে।

একদিন পরীক্ষা-নীরিক্ষা শেষে জাহাজের মেট এবং অন্য অফিসাররা আমেরিকার উপকূলের কতটা কাছে আছেন বুঝবার জন্য লগ বই এনে হিসাব-নিকাশ মেলালেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে।

www.blogye.com

সবাই একমত হলেন, ভার্জিনিয়া অন্তরীপ থেকে এক শ' লীগ দূরে আছেন এখন।

তবে দড়ি ফেলে (সাধারণত ভারী সীসার ওজনদার জিনিস দড়িতে বেঁধে সাগরের গভীরতা মাপা হয়) এক শ' ফ্যাদমের ভিতর কোনও মাটি পাওয়া গেল না। অতএব একজনকে ডেকে পাহারায় বসিয়ে ক্যাপ্টেন ফিরে গেলেন তাঁর কেবিনে।

চমৎকার আবহাওয়া।

উপকূল থেকে মাঝারি গতির বাতাস বইছে।

আশা করা যায়, রাতে বারো থেকে তেরো লীগ অতিক্রম করবে জাহাজ।

এসব ভেবে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় গেলেন ক্যাপ্টেন।

ঘণ্টা তিনেক উপদ্রব ছাড়া ঘুমালেন। যখন ঘুম ভাঙল, একটু সময় স্থির হয়ে রইলেন। আওয়াজ শুনে বুঝলেন, সেকেণ্ড মেট পাহারার দায়িত্ব ছেড়ে ডেক থেকে ফিরছে।

জাহাজের ফার্স্ট মেট তাঁর জায়গা নিতে যাওয়ার সময় ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন সব ঠিক আছে কি না।

মেট জানালেন, চমৎকার চলছে সব, কোথাও সমস্যা নেই অবশ্য গতি বেড়েছে বাতাসের, দারুণ গতিতে চলেছেন তাঁরা।

বাতাস স্বাভাবিক, রাতও চমৎকার এবং শান্ত।

এসব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে আবারও ঘুমিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছেন, এমনসময় স্বপ্নে দেখলেন কেউ তাঁকে ধাক্কা দিচ্ছে, ঘুম থেকে তুলে বাইরে গিয়ে দেখতে বলছে।

মানুষ তো কত স্বপ্নই দেখে। এগুলোকে পাত্তা দিলে চলে?

আবারও ঘুমিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন।

কিন্তু আবার ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল তাঁকে কেউ। মনে হলো, আগের স্বপ্ন আবারও দেখেছেন।

এভাবে কয়েকবার একই স্বপ্ন দেখলেন তিনি। কেন এমন হচ্ছে, বুঝলেন না ক্যাপ্টেন। তারপরও ঘুমাবার চেষ্টা করলেন।

www.blogye.com

কিন্তু আবারও দেখলেন স্বপ্নে কেউ তাঁকে বলছে: 'ঘুম থেকে ওঠো, বের হয়ে দেখো।'

অস্বস্তিকর আধ-ঘুম আধ-জাগা অবস্থায় প্রায় দু'ঘণ্টা কাটালেন ক্যাপ্টেন। শেষমেষ দুত্তোরি ছাই বলে উঠে পড়লেন। তারপর মোটা কোট গায়ে চাপিয়ে ডেকে বেরিয়ে এলেন।

চমৎকার চলছে জাহাজ।

সুন্দর, পরিষ্কার রাত।

ডেকের লোকগুলো অভিবাদন জানাল ক্যাপ্টেনকে।

'কোন দিকে চলেছে জাহাজ?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে দক্ষিণে,' জবাব দিলেন মেট। 'তীরের দিকে। পুব থেকে উত্তরে বইছে বাতাস।'

'খুবই ভাল,' বলে আবারও কেবিনে ফিরবার জন্য রওনা হবেন ক্যাপ্টেন, এমনসময় তাঁর পাশে কে যেন বলে উঠল, 'আরে গাধা, তোমার দড়ি নামাও!'

চমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন। আশপাশে কেউ নেই।

ডেকে কাউকে বুঝতে না দিয়ে সেকেণ্ড মেটকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'শেষ কখন দড়ি নামিয়েছ? তখন পানি কত গভীর ছিল?'

'এক ঘণ্টা আগে স্যর,' জবাব দিলেন মেট, 'ষাট ফ্যাদম।'

'তা হলে আবারও দড়ি নামাও,' একমুহূর্ত না ভেবেই বললেন ক্যাপ্টেন।

যখন দড়ি নামানো হলো, দেখা গেল মাটি কেবল এগারো ফ্যাদম নীচে।

বিস্মিত হয়ে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন তাঁরা।

দেরি না করে আবারও দড়ি নামানো হলো।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন, দেখলেন এখন গভীরতা নেমে এসেছে সাত ফ্যাদমে!

www.blogye.com

শিউরে উঠলেন ক্যাপ্টেন। দেরি না করে বললেন, তাড়াতাড়ি দিক বদলাতে হবে। নির্দেশ দিলেন জাহাজের সব পাল তুলে দিতে। কিন্তু পাল ঠিকঠাক মত তুলবার আগেই মাটি পাওয়া গেল কেবল সাড়ে চার ফ্যাদম নীচে।

কিছুক্ষণের ভিতর বাতাসে ফুলে-ফেঁপে উঠল পালগুলো। পরেরবার দড়ি নামিয়ে দেখা গেল, গভীরতা সাত ফ্যাদম। তার পরেরবার এগারো ফ্যাদম। তারপর বিশ ফ্যাদম।

সূর্যের আলো দেখা দেয়া পর্যন্ত গভীর সাগরের দিকে চলতে লাগল জাহাজ।

সকালে পরিষ্কার আকাশে ভার্জিনিয়া অন্তরীপকে দৃষ্টিসীমায় দেখা গেল। অবশ্য এখনও কিছু লীগ দূরে।

গতরাতে যে-পথে চলছিল জাহাজ, সে-পথে যদি আরেকটু সামনে বাড়ত, মাটির সঙ্গে ঘষা খেত।

জীবন না গেলেও জাহাজ যে টিকত না, তাতে সন্দেহ নেই।

আর এসব হয়েছে সেদিনের ভুল হিসাব্-নিকাশের কারণে। কিন্তু কে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল এবং জাহাজ বাঁচাতে সাহায্য করল, এ প্রশ্নের উত্তর কখনোই পাননি ক্যাপ্টেন।

স্বপ্নে দেখা মুখ

১৮৬৮ সালের ২৫ আগস্ট।

মঙ্গলবার।

কলকাতা থেকে সুতি কাপড় বোঝাই করে লিভারপুল ফিরছে একটি জাহাজ। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে, বাতাসের গতিবেগ দেখে টের পেয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন, যখন তখন সাগরে

www.blogye.com

উঠবে ভয়ঙ্কর ঝড়।

একজনকে মাস্তুলে উঠিয়ে দিলেন তিনি, পালগুলো নামিয়ে ফেলবে সে।

কিন্তু কাজটা শেষ করবার আগেই দমকা হাওয়া এসে চড়াও হলো নির্জীব বড় পালের উপর।

পর মুহূর্তে ছিঁড়ে ফালি ফালি হলো পাল। একই সময়ে ঝড়ো হাওয়ায় একদিকে কাত হয়ে গেল জাহাজ। আর তখনই জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকেরা একটা আর্তনাদ শুনলেন।

শিক্ষানবীশ হিসাবে জাহাজে কাজ করা এক তরুণ আতংকিত চোখে দেখল, তার বন্ধু জো জাহাজের মাস্তুল থেকে বাতাসের ধাক্কায় সাগরের দিকে পড়তে শুরু করেছে। পা বেধে ঝুলতে থাকা তরুণের মুখের হতাশা ও ভয়ের রেখাগুলো যেন পরিষ্কার পড়তে পেল সে। এমন কী বন্ধুর বুক চিরে বেরিয়ে আসা কান্নার সঙ্গে বলা শেষ কথাও কানে বাজল তার, 'ওহ! লুসি, লুসি!'

তারপরই চিরজীবনের জন্য সাগরের গহীন অতলে অদৃশ্য হলো সে

জো-র বন্ধু যখন ক্যাপ্টেনকে গিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বলল, তিনি আফসোস করে বললেন, 'মনে হয় ওর বোনের কথাই মরণের আগে বলেছে, ওর সঙ্গে ছেলেটার খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল।'

ডেকে পড়ে থাকা জো-র টুপি তুলে নিল শিক্ষানবীশ অফিসার। জো-র অন্যসব মালসামানের সঙ্গে ওটা নিরাপদ এক জায়গায় রেখে দিল।

ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনবার পর ওই স্মৃতিচিহ্নগুলোর জন্য হয়তো উদগ্রীব থাকবেন তার পরিবারের সবাই, ভাবল সে।

তারপর সেরকম কোনও ঘটনা ছাড়াই চলতে লাগল জাহাজ।

একসময় ভিড়ল লিভারপুল বন্দরে।

www.blogye.com

অবাক হয়ে দেখল মেয়েটা ঠিক তার স্বপ্নে দেখা লোকটাই দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

শিক্ষানবীশ তরুণ স্টেশনের দিকে রওনা হলো ম্যানচেস্টারের ট্রেন ধরবার জন্য। ওখানেই তার বাড়ি। প্ল্যাটফর্ম ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখল, এক তরুণীকে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগুচ্ছেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক।

জো-র সঙ্গে তাঁর চেহারার এত বেশি মিল, তাঁদের আরেকটু ভালভাবে দেখবার জন্য থমকে দাঁড়াল শিক্ষানবীশ তরুণ। এ সময় মেয়েটার চোখ গেল তার দিকে। একটা বুক ফাটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল মেয়েটির গলা দিয়ে, 'দেখো! আমার স্বপ্নে দেখা সেই মুখ!'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে মেয়েটা। তাকে স্টেশনে বসবার ঘরে নিয়ে যেতে যেতে শিক্ষানবীশ অফিসারকে অনুরোধ করলেন ভদ্রলোক, সে যেন তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য আসে।

তাঁদের সঙ্গে পা বাড়াল তরুণ। এ সময় বৃদ্ধ জানালেন, তাঁর মেয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। ওটাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে সে।

'এখন আমরা চলেছি আমার ছেলে যে জাহাজে কাজ করে, ওটার মালিকের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। জাহাজটা কবে বন্দরে

www.blogye.com

ভিড়বে, কোনও খবর তাঁরা দিতে পারেন কি না জানতে।'

তরুণ ততক্ষণে এতই নিশ্চিত হয়ে গেছে, ভদ্রলোকের ছেলের নামও জিজ্ঞেস করল না সে। শুধু বলল, 'আমি কেবলমাত্র ওই জাহাজ থেকে এলাম।'

'তা হলে,' গুঙিয়ে উঠল মেয়েটি, 'আমার ধারণাই ঠিক। তা হলে সত্যি দেখেছি। তোমার চেহারা আমি দেখেছি, ও সাগরে পড়বার সময় তাকিয়ে ছিলে তুমি। ভয়ঙ্কর বাতাসের ভিতর পড়েছিল জো-র জাহাজ। মাস্তুলের পিছলা দড়ি আঁকড়ে ধরে থাকতে দেখলাম ওকে। তারপর উজ্জ্বল একটা আলো যেন আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। ও উল্টে পড়ল সাগরে। এক মুহূর্তের জন্য তোমার চেহারা দেখলাম। তার পরই আমার নাম ডাকবার শব্দে জেগে গেলাম। "ওহ! লুসি, লুসি!" ফিসফিস আওয়াজ বাড়ি খেল আমার কানে।'

'হায় প্রভু, আসলেই কি এমন ঘটেছে? ও কি মারা গেছে?' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

'জী, স্যর। আপনার মেয়ের বলা প্রতিটি কথা সত্যি। তখন কাছেই ছিলাম। তখন তাকে বাঁচাবার চেষ্টাও করেছি।'

পরে তাঁরা আবিষ্কার করলেন, ছেলের পড়ে যাওয়া আর তার বোনের স্বপ্ন দেখা, ঘটেছে ঠিক একই সময়ে।

যদিও দুজনের মাঝে ছিল ৫০০০ কিলোমিটার!

www.blogye.com

বিদায় প্রিয়তম!

সাগরে চলাচলকারী জাহাজের নাবিকরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে জাহাজে যদি অপ্রাকৃত কিছু কিংবা কোনও আত্মা দেখা যায়, তা তাদের মন্দভাগ্যই বয়ে আনবে।

অবশ্য, মানুষকে শুধু অশুভ উদ্দেশ্যে দেখা দেয় না আত্মা। কখনও জীবিত লোকদের কাছ থেকে শেষবিদায় নিতেও আসে।

আবার বিপদে পড়তে চলা জাহাজের নাবিকদের সাবধান করতে হাজির হয়েছে অপ্রাকৃত কোনও শক্তি, এমন নজিরও আছে।

এর পরও, যখনই কোনও অশরীরীকে জাহাজে দেখে নাবিক-কর্মকর্তারা, তারা নিশ্চিত হয়ে যায় সামনে ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত। তখন এমন আচরণ করতে থাকে, যেন মৃত্যুর পরোয়ানা সই করা হয়েছে তাদের নামে।

এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল দুই মাস্তুলের একটি জাহাজে।

এ ধরনের জাহাজ ব্রিগ নামে পরিচিত।

১৮১৭ সালের ১১ মার্চ আমেরিকার বাল্টিমোর বন্দর থেকে ছাড়ল ওটা, গন্তব্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

ক্যাপ্টেনসহ বারোজন কর্মকর্তা-নাবিক রয়েছে জাহাজে।

এই ঘটনাটি পুঙ্খনাপুঙ্খ ছাপা হয় জর্জ লিটলের লেখা, ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত, 'লাইফ অন দ্য ওশান: টুয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাট সি' বইতে।

যাত্রা শুরুর কয়েকদিনের ভিতর প্রথম ঘটনাটি ঘটে।

খাবার-দাবারের কোনও ঘাটতি পড়েনি জাহাজে। নাবিকরা তরতাজা এবং হাসি-খুশি। চমৎকার একটা দিন। বাতাস

স্বাভাবিক, সাগর শান্ত, খোশমেজাজে আলো বিলিয়ে চলেছে সূর্য। এমন কী যাদের কাজ নেই, তারাও ডেকে এসে চমৎকার যাত্রা উপভোগ করছে।

অবশ্য ক্যাপ্টেন ও ফার্স্টমেট আছেন হুইল হাউসে।

কখনও কখনও আলোচনায় ভাটা পড়ছে নাবিকদের। এমন একসময় হঠাৎ নীরবতা নেমে এল ডেকে। তার পরই নিঃস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে আকস্মিকভাবে চিৎকার করে উঠল এক নাবিক।

মুহূর্তে বাকিরা ঘুরে নাবিকটির দিকে তাকাল।

জায়গাতেই যেন স্থির হয়ে গেছে লোকটা। দৃষ্টি জাহাজের পিছন অংশে।

এবার সঙ্গীরা লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে যেদিকে চাইল।

চমকে উঠল ডেকের প্রতিটি লোক।

দিনের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে।

এক নারী অবয়ব!

দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের পিছন দিকে!

সে যে রক্ত-মাংসের নারী নয় এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না কারও। বন্দর ছাড়বার আগেই অনাহূত কেউ উঠেছে কি না দেখবার জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে জাহাজ।

ওই মুহূর্তে ডেকের সবাই নিশ্চিত হয়ে গেল, কপালে তাদের দুর্ভোগ আছে। অপ্রাকৃত কোনও শক্তি হানা দিয়েছে জাহাজে।

আর একবার ভুতুড়ে ঘটনা ঘটতে শুরু করলে জাহাজে ভাল আর কিছুই ঘটে না।

ডেকের উপর দাঁড়ানো নাবিকরা যেন ভয়ে পাথরের মত জমে গেল।

অবশ্য, শেষপর্যন্ত তাদের ভিতর সবচেয়ে সাহসী নাবিক কাটিয়ে উঠল ঘোর। ছুটে চলে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে।

'তাড়াতাড়ি আসুন, স্যর,' আর্জি জানাল নাবিক, শান্ত রাখবার চেষ্টা করছে কণ্ঠ। পরিস্থিতি যেমনই হোক, নির্দেশের মত

www.blogye.com

শোনাবে এমন কথা বলবার কোনও সুযোগ নেই ক্যাপ্টেনকে। 'আমরা একটা আত্মা দেখেছি, স্যর! জাহাজের পিছন ডেকে সে! দাঁড়িয়ে আছে মহিলা!'

এতে সবার মন দমে যাবে।

'কী বলছ, তোমার মাথা ঠিক আছে?' জানতে চাইলেন মধ্যবয়স্ক ক্যাপ্টেন। সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তদন্ত করতে রওনা দিলেন ভীত নাবিকের সঙ্গে।

ডেকে পৌঁছেই বুঝলেন ভয়ঙ্কর আতংকের ভিতর পড়েছে নাবিকরা। কিন্তু চারপাশে চেয়ে আর কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না তাঁর।

অথচ বারবার ইশারা করে ক্যাপ্টেনকে নারীমূর্তিটা দেখাতে চাইল নাবিকেরা।

ক্যাপ্টেন ও তাঁর ফার্স্ট মেট কিছুই দেখতে পেলেন না।

এর একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল ওই আত্মা।

এ ঘটনার পর তাদের সাধারণ কাজে নাবিকদেরকে লাগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। কাজে ব্যস্ত থাকুক সবাই।

যাদের কাজ নেই, নীচে বাংকে ফিরল তারা।

অবশ্য, আলোচনার কেন্দ্রে থাকল একটু আগে দেখা আত্মা এবং ওদের সেই ভয়াল অভিজ্ঞতা।

সবাই বলতে লাগল সামনে অপেক্ষা করছে অশুভ পরিণতি।

পর দিন সকালেই সূচনা হলো মন্দ ভাগ্যের।

হঠাৎ করেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল জাহাজের তিনজন নাবিক। আর এতে জাহাজের অন্যদের খাটুনি অনেক বেশি বেড়ে গেল। অতিরিক্ত কাজ করতে গিয়ে মেজাজ খিঁচড়ে যেতে শুরু করল সবার।

জাহাজের পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকল ক্রমেই।

নতুন রুটিনের সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে সবাই, এমন সময় দ্বিতীয়বার দেখা দিল ওই আত্মা।

www.blogye.com

এবার তাকে দেখল জনাকয়েক নাবিক।

কিন্তু এবারও ক্যাপ্টেন ও ফার্স্ট মেটের চোখের আড়ালেই থাকল সেই আত্মা।

দ্বিতীয় অপ্রাকৃত উপস্থিতির পর দিন ভয়ানক এক ঝড়ে পড়ল জাহাজ। শেষপর্যন্ত কোনও প্রাণহানী বা বড় ধরনের ক্ষতি না হলেও বেশিরভাগ কর্মী ধরে নিল, খারাপ ভাগ্য বয়ে এনেছে ওই ভূত।

যাত্রার শেষদিকে এসে আবারও দেখা দিল সেই নারীমূর্তি।

এর অল্প ক'দিন পর রহস্যময় এক জ্বরে আক্রান্ত হলো ক'জন নাবিক-কর্মকর্তা। অসুস্থদের একজন তার বাঙ্কে মারা গেল।

অবশ্য, জাহাজ বন্দরে ভিড়বার পর জানা গেল, ওই আত্মা দেখা দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। নাবিকদের রোগে ভোগা কিংবা জাহাজের ঝড়ে পড়া সম্ভবত নিছক কাকতালীয় ঘটনা।

জানা গেল: জাহাজ যাত্রা শুরুর কয়েকদিন বাদেই ক্যাপ্টেনের স্ত্রী মারা গেছেন। জাহাজে দেখা যাওয়া নারীর যে বর্ণনা দিয়েছে সবাই, তার সঙ্গে একেবারে মিলে গেল ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর চেহারা।

সম্ভবত অশুভ কোনও উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রিয়তম স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিতে বারবার জাহাজে হাজির হয়েছে নারীর অতৃপ্ত আত্মা।

অবশ্য, কেন ক্যাপ্টেনের চোখে ধরা দিল না, তা রয়ে গেল এক রহস্য হয়েই।

www.blogye.com

ফ্লাইং ডাচম্যান

১৯৪২ সালের আগস্টের ৩ তারিখ।

রাজকীয় নৌবাহিনীর কেপটাউনের সাইমনটাউন ঘাঁটির দিকে চলেছে এইচ.এম.এস. জুবিলি।

রাত নয়টার দিকে ভুতুড়ে এক জাহাজ দেখা গেল।

সেকেণ্ড অফিসার ডেভিস এবং থার্ড অফিসার নিকোলাস মনসারাত ছিলেন পাহারার দায়িত্বে। মনসারাত সংকেত দিলেন রহস্যময় জাহাজটাকে।

কিন্তু ওটার তরফ থেকে কোনও সাড়া মিলল না।

ডেভিন অনুমান করলেন, ওটা স্কুনার (দুই বা তার চেয়ে বেশি মাস্তুলের জাহাজ)। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারলেন না। জাহাজের লগ বুকেও পরে এ কথাই লিখেছেন তিনি।

বাতাস নেই বললেই চলে, তবে পাল পুরোপুরি খোলা ভুতুড়ে জাহাজের এখন ওটার যে গতিপথ, ধাক্কা লাগবার সমূহ সম্ভাবনা জুবিলির সঙ্গে।

বাধ্য হয়েই দিক বদলাল জুবিলি।

একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল ভুতুড়ে জাহাজ।

পরে এক সাক্ষাৎকারে মনসারাত বলেন ওই অভিজ্ঞতার কথা।

বিখ্যাত উপন্যাস 'মাস্টার মেরিনার' লিখতে ওটাই উৎসাহ যোগায় তাঁকে।

পৃথিবীতে যত ভুতুড়ে জাহাজ দেখা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সম্ভবত ফ্লাইং ডাচম্যান।

 www.blogye.com

ফ্লাইং ডাচম্যানকে দেখে চমকে ওঠে নাবিকেরা।

সাধারণত প্রবল ঝড়ো এবং দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়, উত্তর সাগরের উত্তমাশা অন্তরীপ এলাকায় হঠাৎ করেই হাজির হয় ওটা। সাগরের চলাচলকারী জাহাজের নাবিকদের চমকে দেয়ার অভ্যাস আছে ফ্লাইং ডাচম্যানের। ওটার নামটা এসেছে জাহাজের নাম থেকে নয়, বরং বেহেড মাতাল ক্যাপ্টেনের কারণে।

যতদূর জানা যায়, একরোখা ডাচ ক্যাপ্টেন ছিলেন ভ্যান ডার ডেকেন। উত্তমাশা অন্তরীপ পেরুবার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে তাঁর জাহাজ। সারা দিনভর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করেন ক্যাপ্টেন। যখন জাহাজের পোড় খাওয়া অফিসাররা তাঁকে তীরে ভেড়ানোর চেষ্টা করতে বললেন, তখন পাগলের মত হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন। হাতের মুঠি উঁচু করে ধরে বললেন, হারবার

www.blogye.com

অভ্যাস নেই তাঁর।

একপর্যায়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি শুরু করল ভীত-সন্ত্রস্ত নাবিকেরা।

কিন্তু ক্যাপ্টেনকে যেন পাগলামিতে পেয়েছে। কোনওভাবেই দিক বদলাতে রাজী করানো গেল না তাঁকে।

শুধু তাই নয়, অশ্লীল সব গান গাইতে লাগলেন, উন্মত্তের মত। তারপর নিজের কেবিনে গিয়ে পান করতে লাগলেন মদ। তাঁর পাইপের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ধোঁয়াটে হয়ে উঠল কেবিনের পরিবেশ।

এদিকে একের পর এক প্রলয়ংকরী ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের উপর। সাগর-দেবতা যেন আজ অকারণেই ক্ষেপে উঠেছেন। গর্জন করতে থাকা বাতাস নুইয়ে দিয়েছে মাস্তুল ছিঁড়ে ফালাফালা পালগুলো। কিন্তু নাবিকদের আতংক আরও বাড়িয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন এখনও আগের পথে অটল রইলেন

নাবিকরা ধরে নিল উন্মাদ হয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন। বাঁচতে হলে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে তাদেরকে অতএব বিদ্রোহ করল তারা।

হৈ-হট্টগোলে জেগে গেলেন মাতাল ক্যাপ্টেন। বিদ্রোহীদের সর্দারকে গুলি করে মারলেন তিনি। তারপর লাশ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সাগরে।

কিংবদন্তী আছে লাশটা পানিতে পড়তেই ছায়াময় এক অবয়ব হাজির হলো জাহাজের কোয়ার্টার ডেকে। ক্যাপ্টেনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'তুমি খুব জেদি মানুষ।'

জবাবে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমি কখনোই শান্তিপূর্ণ সাগর চাইনি। আসলে কিছুই চাইনি। কাজেই আমি গুলি করার আগেই বিদায় হও ' তাঁর কণ্ঠে ঝরে পড়ল অহংকার ও বিদ্বেষ।

তবে ক্যাপ্টেনের কথায় সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল না অবয়বটা

পিস্তল বের করে গুলি করতে চাইলেন ক্যাপ্টেন। হাতের

www.blogye.com

ভিতর বিস্ফোরিত হলো বুলেট।

আবারও সরব হয়ে উঠল কণ্ঠ, 'তোমার এ আচরণের জন্য আজ থেকে তুমি অভিশপ্ত। অনন্তকাল মৃতনাবিক ভর্তি এক জাহাজ নিয়ে সাগরে ঘুরতে হবে তোমাকে। শুধু নিজের নয়, এই জাহাজের অন্যদেরও মৃত্যু ডেকে এনেছ তুমি। কখনও বন্দরে ভিড়বার কিংবা একমুহূর্ত বিশ্রামের সুযোগ হবে না তোমার।'

ক্যাপ্টেনের তখন এসব অভিশাপে ভয় পাওয়ার স্থিরতা নেই। উল্টো স্পর্ধার সঙ্গে বললেন, 'তবে তাই হোক।'

তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল অবয়বটা।

একটু পরেই ঝড়ো হাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারাল জাহাজ। সাগরের এক গুপ্ত পাথুরে পাহাড়ে আছড়ে পড়ল। তারপরই ডুবতে শুরু করল। কারও কারও দাবী কোনও ভৌতিক ছায়ামূর্তি জাহাজে হানা দেয়নি। বরং মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে ক্যাপ্টেন নিজেই অভিশাপ দেন, 'পৃথিবী ধ্বংসের আগ পর্যন্ত উত্তমাশা অন্তরীপে জাহাজ নিয়ে টহল দেব আমি।'

তারপর থেকেই ভুতুড়ে জাহাজ নিয়ে মানুষকে চমকে দেয়া বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে ভ্যান ডার ডেকেনের। প্রবল ঝড়ের সময় বেশি দেখা দেয় তার জাহাজ।

অনেকেই অভিযোগ করেছেন, অন্য জাহাজদের ভুল পথে নিয়ে গিয়ে পাথুরে চরা আর গুপ্ত পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ানোর চেষ্টা করে সে। আবার ভুতুড়ে জাহাজটাকে দেখবার পর থেকে অপর জাহাজটিতে আকস্মিকভাবে খাবার মজুদে টান পড়বার কথাও শোনা যায়।

উত্তমাশা অন্তরীপে অপরিচিত কোনও জাহাজ নজরে পড়বার পর ওটা দেখতে যতই নিরীহ গোছের হোক না কেন, দূরে থাকতে বলা হয় ওই এলাকায় চলাচলকারী অন্য জাহাজগুলোকে।

কেউ কেউ দাবী করেছেন জাহাজ ভর্তি কংকাল দেখবার। আতংকে চিৎকার করতে করতে পাহাড় সমান উঁচু ঢেউ ও নির্দয়

www.blogye.com

বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল তারা।

লাইটহাউসের রক্ষকরা দুর্বিপাকের রাতে প্রায়ই একে দেখবার কথা বলেন।

১৮২৩ সালে এইচ.এম.এস ওয়েনের ক্যাপ্টেন জাহাজের লগ বুকে দু'বার ভুতুড়ে জাহাজটাকে দেখবার কথা উল্লেখ করেছেন।

১৮৩৫ সালে ভয়াবহ এক ঝড়ের মাঝ থেকে জাহাজটিকে বেরিয়ে আসতে দেখে ব্রিটিশ এক জাহাজের নাবিকরা। যেভাবে এগিয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল যে কোনও সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে দুই জাহাজের। তারপর হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যায় ফ্লাইং ডাচম্যান।

কিশোর বয়সে রাজা পঞ্চম জর্জ।

১৮৮১ সালের ১১ জুলাই রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজ বাচ্চান্তি আফ্রিকা, যাচ্ছিল। এসময়েই ভুতুড়ে জাহাজটাকে দেখে বাচ্চান্তির কর্মকর্তা–নাবিকেরা। জাহাজের এক শিক্ষনবিস, যিনি পরে রাজা পঞ্চম জর্জ নামে পরিচিত হন, তিনিও ফ্লাইং ডাচম্যানকে দেখেন। পরে দিনপঞ্জির পাতায় লেখেন, 'ভোর চারটার দিকে ফ্লাইং ডাচম্যান আমাদের অতিক্রম করে যায়। লাল এক আলোয় গোটা জাহাজ আলোকিত ছিল। আর ওটার মাস্তুল, পাল সব দেখা যাচ্ছিল। ২০০ গজ দূরে স্থির দাঁড়িয়েছিল দুই মাস্তুলের ব্রিগটা।'

www.blogye.com

পাহারার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাটিও ডাচম্যানকে দেখেন। তবে ওটাকে দেখবার কয়েক দিনের মধ্যেই মাস্তুল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

১৮৭৯ সালে এসএস প্রিটোরিয়া ওই জাহাজ দেখে।

১৯১১ সালে তিমি শিকারি একটি জাহাজ আরেকটু হলে আচমকা হাজির হওয়া জাহাজটির উপর গিয়ে পড়েছিল। তবে কোনও অঘটন ঘটবার আগেই অদৃশ্য হয় ফ্লাইং ডাচম্যান।

১৯২৩ সালে একে দেখেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী।

১৯৩৯ সালে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু লোকের কাছেও দেখা দেয় অভিশপ্ত জাহাজটা।

জার্মান অ্যাডমিরাল কার্ল ডোয়েনটিক এবং তাঁর ইউ বোটের নাবিকেরা অনেকবারই একে দেখবার কথা রিপোর্ট করেছেন।

১৯৪১ সালে আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। গেনকেইরান সৈকতে ছিলেন অনেক লোক। তাঁদের চোখের সামনে হঠাৎ হাজির হয় জাহাজটা। ঝড়ের সঙ্গে কোনওভাবেই কুলিয়ে উঠতে পারছিল না ওটা। তারপরই সাগরতীরের এক পাথুরে অংশের দিকে এগিয়ে যায়। তীরের সবাই যখন ওটার পরিণতির কথা ভেবে হায় হায় করছেন, তখনই শূন্যে মিলিয়ে গেল।

টেবল উপসাগরে একে দেখেন চারজন লোক, ১৯৪২ সালে।

১৯৫৯ সালে শেষবারের মত হাজির হয় ফ্লাইং ডাচম্যান। তারপর একে দেখবার কথা বলেননি আর কোনও জাহাজের নাবিক বা অফিসাররা।

কারও কারও ধারণা, ভুতুড়ে জাহাজটির অভিশপ্ত জীবনের শেষ হয়েছে। তাই আর দেখা মেলে না। তবে বেশিরভাগ মনে করেন, সুয়েজ খাল খননের কারণে এখন উত্তমাশা অন্তরীপে যাত্রীবাহী জাহাজের আনাগোনা কম। এখন ওই পথ ব্যবহার করে হাতে গোনা কিছু বাণিজ্যিক জাহাজ। আর এদের কেউ কেউ দেখলেও, অন্যরা আতংকিত হয়ে পড়বে এ ভেবে চেপে যায়।

www.blogye.com

মরণের ডঙ্কা বাজে

কে-ই বা পেতে চায় আগাম মৃত্যুসংকেত। অনেক সময় আবার ভবিষ্যৎ দেখতে পান মরতে চলা ব্যক্তিটির কাছের কোনও মানুষ। 'মরণের ডঙ্কা বাজে' অধ্যায়ে থাকছে শরীরের রোম দাঁড়িয়ে যাওয়া এমনই কিছু মৃত্যুসংকেতের ঘটনা।

মৃত্যু মোমবাতি

বেশ অনেক বছর আগের ঘটনা, উত্তর ওয়েলসের এক গ্রামে টম লিউয়েলিন আর ইভান পাগ নামে দুই খালাত ভাই থাকত। পাশাপাশি দুই খামারে বড় হয়েছে ছেলেদুটো। দুজনের মধ্যে গলায় গলায় দোস্তি। কিন্তু টমের যখন আঠারো বছর বয়স আর ইভানের ষোল, তখন পাগ পরিবার সাত মাইল দূরের অন্য একটি গ্রামে চলে গেল। আর এভাবেই আলাদা হয়ে গেল দুই বন্ধু বা ভাই।

কিন্তু ছেলেদুটো একজন আরেকজনের অভাব অনুভব করতে লাগল খুব। সকাল থেকে গোধূলী পর্যন্ত একসঙ্গে মাছ ধরত তারা। আবার একইসঙ্গে নৌকা আর ভেলা বানাত। এখন আর পর্বতের ঝরনায় রোমাঞ্চকর মাছ ধরবার অভিযান টমকে টানে না। এদিকে ইভান যে কি না কাঠ দিয়ে নানা জিনিস বানাতে ওস্তাদ, তারও এসব করতে আর ভাল লাগে না।

'তোমাকে এভাবে মন মরা হয়ে থাকতে দেখে আমার খুব কষ্ট লাগে,' টমের মা বলেন, 'এভাবে কি আর ইভানকে ফিরিয়ে আনা যাবে।'

এদিকে ইভানের মা ছেলেকে বলেন, 'তুমি কেন এখানে নতুন বন্ধু জুটিয়ে নিচ্ছ না? গ্রামে তোমার বয়সী কত ছেলে!'

কিন্তু এসব কথায় ছেলেদুটোর মন ভরল না। শেষমেষ অবশ্য নিজেরাই একটা সমাধান খুঁজে বের করল তারা। ঠিক হলো প্রতি সপ্তাহের শেষে একজন আরেকজনের বাড়িতে যাবে। অর্থাৎ এক সপ্তাহে ছুটির দিনে টম ইভানের বাড়িতে গেলে পরের হপ্তায় ইভান

আসবে টমের বাড়ি। বুদ্ধিটা যে চমৎকার তাতে সন্দেহ নেই। এতে দুই বন্ধু আগের মত গল্প করতে পারবে। তা ছাড়া, সারা হপ্তাহ খামারে প্রচুর পরিশ্রমের পর সপ্তাহ শেষের এই ভ্রমণ আবারও চনমনে করে তুলবে তাদেরকে।

শরতের এমন এক ছুটির দিনে ইভানের পালা ছিল টমের গ্রামে যাওয়ার। দু-বন্ধুতে দারুণ মজা করল এবার। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করল ইচ্ছামত, রোদের নির্জলা তাপ শরীরে নিল। দেখতে না দেখতে দুটো দিন কেটে গেল। এখন ইভানকে সাত মাইল হেঁটে তার গ্রামে ফিরতে হবে। ওয়েলসের বহু পুরনো একটা নিয়ম হলো, অতিথিকে পথের কিছুটা এগিয়ে দেয়া। গলায় মোটা এক মাফলার জড়িয়ে টম মাকে জানাল, তারা বেরুচ্ছে।

'ভালো থেকো, ইভান,' মিসেস লিউয়েলিন বললেন, 'আশা করি ঠিক মত পৌঁছে যাবে বাড়িতে।'

'তা হলে চলি, আণ্ট,' বলল ইভান, 'দু-সপ্তাহ পরে আবার দেখা হবে। চমৎকার সময় কাটালাম এখানে, ধন্যবাদ।'

ইভানের গ্রামের দিকে চলে যাওয়া রাস্তায় উঠল ছেলেদুটো। হাঁটতে হাঁটতেও আলাপ চলছিল তাদের। বিশেষ করে আগামী হপ্তায় যখন ইভানের বাড়িতে টম যাবে, তখন কী ভাবে সময় কাটাবে তা নিয়েই নানা পরিকল্পনা করছে। তাদের চোখের সামনে আস্তে আস্তে ডুবে গেল সূর্য। ভারী, এবড়ো-খেবড়ো মেঘগুলোও ঘন নীলচে কালো এক আবরণে অদৃশ্য হলো। তারপরই অন্ধকার নেমে এল, সামনে কিছু দেখা হয়ে উঠল মুশকিল

'তোমার এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, টম,' শেষ পর্যন্ত ইভান বলল, 'এরই ভিতর মাইল দুয়েক চলে এসেছ।'

'তেমাথার গির্জা পর্যন্ত গিয়ে ফিরব,' বন্ধুকে বলল টম।

একসময় গির্জা প্রাঙ্গনের সমাধিগুলো পাশ কাটাল তারা। চারপাশে ঘন হয়ে ঘিরে থাকা গাছগুলোর কারণে ওদিকটায়

www.blogye.com

কেমন অশুভ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মুখে কুলুপ এঁটে আছে যেন দুজনেই। কেঁপে উঠল ইভান। ঠাণ্ডায় না ভয়ে, কে জানে?

'ঠাণ্ডা লাগলে আমার মাফলার নিতে পার,' বলল টম, 'আমার চেয়ে অনেক বেশি রাস্তা পেরুতে হবে তোমায়।'

'না-না, আমার আসলে শীত করছে না,' বলল ইভান, 'কেমন যেন ভয়-ভয় করছে। গোরস্থানের কারণে এমন হচ্ছে। অথচ এর পাশ দিয়ে আগেও গিয়েছি, কখনও এমন লাগেনি।'

হেসে উঠল টম। 'গাছগুলোকে মনে হচ্ছে ভয়াল সব ভূতের মত, যেন লম্বা হাত বাড়িয়ে রেখেছে, বিশেষ করে তোমাকে ভয় দেখাতে।' বলেই ইভানের মাথার উপর নিজের হাতদুটো নিয়ে নাড়তে লাগল ও, পাগলের মত গোঙাতে শুরু করেছে।

হেসে উঠে তার ভাইকে ধরতে গেল ইভান। কিন্তু ওকে ফাঁকি দিয়ে গোরস্থানের কিনারার ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দৌড় দিল টম।

টমকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখল ইভান। তবে পায়ের শব্দ অনুসরণ করে ঠিকই পিছু নিল। একটু পরেই জঙ্গল পেরিয়ে ঘেসো মাটিতে পা রাখল ও, আর তারপরই থমকে যেতে হলো। জাপ্টে ধরেছে ওকে কেউ!

ভয়ে চিৎকার দেবে, তখনই দেখল ওটা টম।

ইভানের হাত আঁকড়ে ধরে ফিসফিস করে বলল টম, 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। ঈশ্বরের দোহাই একটুও নোড়ো না। দেখো!'

যেন পাথর হয়ে গেল ইভান। 'টম, ওটা কী?'

সমাধিস্থলের অন্যপাশে, শূন্যে স্থির হয়ে আছে নীলচে এক ভুতুড়ে আলো। কেমন অশুভ। ভীতিকর লাগছে ওটাকে দেখতে।

একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল দুজন। ওদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেন কাঁপতে শুরু করল আলোটা।

জোরে শ্বাস টেনে ইভান আবারও বলল, 'ওটা কী, টম?'

'মৃত্যু-মোমবাতি। কারও মৃত্যু ঘনিয়ে এলে সতর্ক করতে

www.blogye.com

আসে,' খুব ধীরে, কাঁপা স্বরে বলল টম।

ভয় মেশানো রোমাঞ্চের অনুভূতি যেন ছড়িয়ে পড়ল ইভানের শরীরে। 'কিন্তু মোমবাতি ধরেছে কে?'

'কেউ না,' বলল টম, 'আসলে বাস্তবের কেউ না। তবে যে মরতে চলেছে, তার মুখ দেখা যায় ওতে।'

সার বাঁধা সমাধিগুলোর ভিতর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে নীল আলো।

এদিকে অশুভ আশঙ্কা আঁকড়ে ধরেছে ইভানকে। ফিসফিস করে বলল, 'চল, টম, আমরা পালাই। ওটা এদিকেই আসছে... এসো, টম!'

টম ওর ভাইয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরল। 'না, আমরা এখানেই থাকব। ওটা আমাদের কোনও ক্ষতি করবে না। ওই আলো এদিকে আসছেও না। যেদিক দিয়ে মৃতদেহ গোরস্থানে নেয়া হয়, সেদিকে চলেছে।' মুহূর্তের জন্য চুপ থেকে আবারও বলল, 'আমি ভাবছি ওটা কে? আমরা কি দেখার চেষ্টা করব?'

আতংকে থরথর করে কাঁপছে ইভান, মন চাইছে এক দৌড়ে বাড়িতে পৌঁছে যেতে। আর আলোকিত, উষ্ণ ঘরে কাছের সবার মাঝে বসে থাকতে। যেন তা হলেই ওই ভয়াল আলো থেকে মুক্তি পাবে। 'না-না, চল পালাই!'

তবে টমকে দেখে মনে হলো না তার বিন্দুমাত্র ভয় লাগছে।

'আরে ভয়ের কিছু নেই। দেখো, ওটা এদিকে আসছে না। এই প্রথম আমি এমন কিছু দেখলাম। যদিও গ্যারেথ প্রাইস সবসময় ওটার কথা বলে। আলোটা ভিতরে ঢোকার আগেই যদি তুমি গির্জার দরজার কাছে পৌঁছে যেতে পার, দেখতে পাবে কে মরতে চলেছে।'

ইভান কেবল জড়ানো কণ্ঠে কোনওমতে বলতে পারল, 'না-না, টম! আমি মড়ার মুখ দেখতে চাই না।'

'ঠিক আছে, তোমার যদি এত ভয় করে, তবে আমি একাই

www.blogye.com

যাব,' হেসে উঠে বলল টম।

'ওহ! টম, তুমি যেয়ো না। চল যাই, আমার আসলেই খুব ভয় করছে। মনে হচ্ছে, ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করছে। চল; আমরা এখান থেকে ভেগে যাই।'

'বললাম না, ভয়ের কিছু নেই,' আবারও ইভানকে বোঝাবার চেষ্টা করল তার বন্ধু, 'আমি এমন সুযোগ হাত ছাড়া করতে পারব না। বুড়ো গ্যারেথের কথা কখনও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন দেখছি তার কথাই ঠিক। শেষবার বলছি, তুমি কি আসবে আমার সঙ্গে?'

'না,' কঠিন স্বরে বলল ইভান, 'ওটা অশুভ, আমি জানি।'

'তা হলে আমার জন্য পথে অপেক্ষা করো, আমি একাই চললাম।'

ইভানের হাত ছেড়ে গির্জার দিকে এক কদম পা বাড়াল টম। আর তখনই উল্টো দিকে দৌড় দিল ইভান। ছুটতে ছুটতে ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তার ঘাসের কিনারে এসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল ও। এখন নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে নিজেকে ওর।

এদিকে ভুতুড়ে আলোর চলবার পথ অনুসরণ করে, নিঃশব্দে গির্জার দরজার দিকে চলেছে টম। একরত্তি ভয় নেই মনে, কেবল দুর্দমনীয় কৌতূহল লাগছে। বিচার-বুদ্ধি বলছে, মৃদু এক নীলচে আলো তার কোনও ক্ষতি করবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের মনে বাসা বাঁধা কুসংস্কার যে টমের ভিতর নেই তা নয়, তবে সে কাপুরুষ নয়। যদি মৃত্যু-মোমবাতির কিংবদন্তী সত্যি হয়, তবে সে যে ভয়ংকর কিছু দেখবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে ওটা নিশ্চিতভাবে তার জন্য ক্ষতিকর হবে না। তা ছাড়া, সেন্ট ডেভিড মোমবাতিগুলোকে পাঠান সতর্ক সংকেত দেয়ার জন্য, যেন নির্দিষ্ট মানুষ বুঝতে পারে তার দিকে আসছে মৃত্যু। তাই একে ভয় পাওয়ার কারণ নেই।

নিজের মনেই বলল টম, 'আমি ভয় পাব কেন?'

www.blogye.com

গির্জার রোয়াকে পৌঁছে চমকে উঠল ও। বিশালকায় দরজা হাট করে খোলা। একবার ভাবল ভিতরে ঢুকবে, পরমুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলাল। বিপদ হোক বা না হোক, তার এমন জায়গায় থাকা উচিত, যেন মোমবাতি অতিক্রম করবার সময় প্রয়োজনে ছুটে পালাতে পারে। তারপরই দেখল শিখাটা প্রায় ওর গায়ের উপর চলে এসেছে। শেষ সমাধিফলক পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে গির্জার দরজার দিকে চলেছে এখন।

শ্বাস চেপে স্থির হয়ে রইল টম। হঠাৎই যেন ওর আঙুলের মাথাগুলো ঠাণ্ডা ও অনুভূতিশূন্য হয়ে গেল। আসছে ওই আলো... ধীরে ধীরে আরও কাছে আসতে লাগল। আর সে সম্মোহিতের মত চোখ বিস্ফারিত করে ওটার দিকেই চেয়ে রইল।

এখন উঠে এসেছে বারান্দায় আলো। গির্জায় ঢুকবার জন্য ঘুরল। ওটা মিট-মিট করে জ্বলতে থাকা নীল শিখা ছিল, পর মুহূর্তেই হয়ে গেল বীভৎস একটা মুখ!

ওহ! এ চেহারা টম চেনে।

আতংকে চিৎকার করে উঠল ও, আওয়াজটা ভুতুড়ে প্রতিধ্বনি তুলল রাতের খালি গোরস্থানে। দু-পাশের সার বাঁধা সমাধির মধ্য দিয়ে পাগলের মত দৌড়াতে শুরু করল টম। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে হোঁচট খাচ্ছে মাঝে মাঝেই তবে ওদিকে খেয়াল নেই ওর। মুখ-ব্যাদান করে থাকা ওই ভয়াল মুখ থেকে রেহাই পেতে চাইছে।

শেষপর্যন্ত ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে ইভান যেখানে অপেক্ষা করছে, সেখানে পৌঁছাতে পারল টম।

'তোমার এ অবস্থা কেন? কী হয়েছে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ইভান।

এতই ভয় পেয়েছে, কী দেখেছে বলতে পারল না টম।

'ন... না... কিছু না,' তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আসলে কিছুই না সব ভুল। গ্যারেথ একটা বোকা। কিছু না।'

www.blogye.com

'তা হলে চিৎকার দিলে কেন?'

'আমি জানি না। এখন বাড়ি ফিরে যাও ইভান, বাড়ি যাও।'

'হ্যাঁ, তাই ভাল। এমনিতেই দেরি করে ফেলেছি। তুমি ঠিক আছ তো, টম? বাড়ি ফিরতে পারবে তো?'

মৃত্যু মোমবাতির আলোয় ভীতিপ্রদ চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে উঠল টমের চোখের সামনে।

'হ্যাঁ,' জোরের সঙ্গে বলতে চাইল টম, 'আমি ঠিক আছি। তুমি এখন যাও... শুভ রাত্রি।'

'শুভ রাত্রি,' বলল ইভান, 'আগামী হপ্তায় দেখা হবে।'

রাস্তায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে টম, চুপ রইল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কেমন যেন শোনাল ওর কণ্ঠ, 'হ্যাঁ, আগামী সপ্তাহে...' আর কিছুই বলল না।

www.blogye.com

ছেলেদুটো যার যার পথে রওনা হয়ে গেল।

ইভান দ্রুত পা চালাল, বাড়ির উষ্ণ আশ্রয়ের খোঁজে। আর টম চলল নিজের বাড়ির দিকে।

তবে দ্বিতীয় জনের চলবার গতি একেবারেই মন্থর, মাথার ভিতর একটা প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে মরছে।

পরের কয়েকটা দিন সাধারণভাবেই কাটল টমের।

ধাক্কা সামলে উঠেছে অনেকটাই। তবে যা দেখেছে তা মাথা থেকে বিদায় নিল না। কখনও কখনও, কাজ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে রইল ও। বাবা জোরে ডাক দিলে তবেই সম্বিত ফিরল।

শুক্রবার সকাল থেকে শরীর খারাপ হতে লাগল তার। এমনিতে শুক্রবার কাজ শেষ করেই ইভানের বাড়ির দিকে রওনা হয় ও। কিন্তু দুপুরে তিন তিনবার জ্ঞান হারাল। তারপর আবিষ্কার করল, আর হাঁটতে পারছে না।

'তোমার জ্বর হয়েছে,' বললেন টমের মা, 'এখন আবহাওয়া সুবিধার নয়। আর এ কারণেই ঠাণ্ডা থেকে জ্বর এসেছে। বিছানায় শুয়ে থাকো। আজ এমনিতেও ইভানদের বাড়িতে যেতে পারবে না।'

টমও বুঝল, বন্ধুকে দেখতে যতই মন কাঁদুক, মার কথা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বাধ্য হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ও। চুপচাপ পড়ে থাকতে ভাল লাগল না ওর। এমন কী খাওয়ার আগ্রহ মরে গেল। কেবল চোখ বড় বড় করে নিজের কামরার সাদা চুনকাম করা দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। একসময় দুর্বল গলায় মার কাছে আবদার করল, 'মা, কষ্ট করে ইভানকে একটা খবর পাঠাও, ওকে এখানে আসতে বল।'

'না, টম। তোমার শরীর মোটেই ভাল নয়। শুধু বিশ্রাম নেবে তুমি। দেখবে ক'দিনে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছ।'

'ওহ! মা,' আপত্তি জানাল টম, 'আমার অবশ্যই ওর সঙ্গে

www.blogye.com

দেখা করতে হবে।'

'কিন্তু, গত সপ্তাহেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ও বুঝবে যে তোমার শরীর খারাপ। তা ছাড়া, এখন কারও সঙ্গে গল্প নয়। চুপ করে শুয়ে থাকো। তোমার অসুস্থতার কথা জানিয়ে দেব আমরা ওকে।' তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন টমের মা।

পানিতে ভরে গেল টমের দু'চোখ। সে এতই দুর্বল এবং ক্লান্ত, আর তর্ক করতে পারল না। শুধু ফিসফিস করে আকুতি জানাল, 'প্লিজ, মা...'

ছেলের দিকে চাইলেন মিসেস লিউয়েলিন। সাদা, পাংশু মুখ আর বিশাল কালো দুই চোখ দেখে বুক কেঁপে উঠল তাঁর। হয়তো ইভানের সঙ্গে দেখা হলে ছেলেটা ভাল থাকবে, ভাবলেন তিনি।

'ঠিক আছে,' হার মানলেন, 'ও আসবে। এখন আব্বু, ঘুমাতে চেষ্টা করো তুমি

টমের বাবা স্ত্রীর কাছ থেকে ছেলের বায়না শুনবার পর দেরি করলেন না। পনি ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন পাগদের বাড়ির দিকে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ইভানকে হাজির হতে দেখা গেল খামার বাড়িতে।

বন্ধুর অমঙ্গল চিন্তায় ফ্যাকাসে হয়ে আছে বেচারার চেহারা। বন্ধুর কী হয়েছে জানবার জন্য শুরুতেই দৌড়ে গেল মিসেস লিউয়েলিনের কাছে। তার সঙ্গে কথা শেষে গায়ের শক্তির উপর ভর দিয়ে, নিঃশব্দে ঢুকল টমের কামরায়।

বিছানায় পড়ে থাকা শরীরের দিকে চেয়েই চমকে উঠল ইভান। এই এক সপ্তাহে তার বন্ধু, ভাই যেন আকারে অর্ধেক হয়ে গেছে। বলিষ্ঠ দেহের, কর্মচঞ্চল টম অদৃশ্য হয়েছে। বদলে পাণ্ডুর চেহারার, ভঙ্গুর দেহের যে বিছানায় পড়ে আছে, সে যেন ইভানের পরিচিত টম নয়, বরং অপরিচিত কোনও আগন্তুক। যে কি না দীর্ঘদিনের জ্বরা ও শোকে ক্লান্ত।

www.blogye.com

একটু পর চোখের পাতাদুটো আলাদা হলো, ধীরে ধীরে ইভানের উপর দৃষ্টি স্থির হলো টমের। ঠোঁটে হাসির মত কিছুর আভাস পাওয়া গেল। কথা বলতে শুরু করল টম। কিন্তু শব্দগুলো এত নিস্তেজ ও মৃদু, বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কান সামনে নিয়ে শুনতে হলো ইভানকে।

থমথমে কামরায় হালকা তরঙ্গ তুলে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলা কথাগুলো অবশ্য ঠিকই বুঝতে পারল ইভান।

'ইভান, কাউকে বোলো না, গত হপ্তায়... গোরস্থানের ওই আলোটা... তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে কী দেখেছিলাম...'

ক্লান্তিতে বালিশে হেলে পড়ল টমের মাথা।

'হ্যাঁ,' জরুরি কণ্ঠে বলল ইভান।

বেশ কিছুটা সময় পেরুনোর পর আবারও কথা বলতে পারল টম, 'আমি দেখেছি... ওই আলো... একটা মুখ... ওহ কী ভয়ঙ্কর... মৃত মানুষের মত... তখন বিশ্বাস করিনি... কিন্তু ওটা যে আমারই মুখ ছিল...

ধীরে ধীরে মিইয়ে এল কণ্ঠ, তারপর একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল টমের শরীর

উঠে দাঁড়াল ইভান, আতংক ও ভয় নিয়ে চেয়ে রইল বন্ধুর প্রাণহীন শরীরের দিকে। নিজের মৃত্যু-মোমবাতি দেখেছে ওর বন্ধু টম!

বানশি (দ্বিতীয় পর্ব)

আয়ারল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের কাছে অশুভ এক শক্তি বানশি।

কখনও কখনও একে ডাকা হয় বহিন্থা কিংবা বানকিন্থা

www.blogye.com

দেখা করতে হবে।'

'কিন্তু, গত সপ্তাহেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার। ও বুঝবে যে তোমার শরীর খারাপ। তা ছাড়া, এখন কারও সঙ্গে গল্প নয়। চুপ করে শুয়ে থাকো। তোমার অসুস্থতার কথা জানিয়ে দেব আমরা ওকে।' তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন টমের মা।

পানিতে ভরে গেল টমের দু'চোখ। সে এতই দুর্বল এবং ক্লান্ত, আর তর্ক করতে পারল না। শুধু ফিসফিস করে আকুতি জানাল, 'প্লিজ, মা...'

ছেলের দিকে চাইলেন মিসেস লিউয়েলিন। সাদা, পাংশু মুখ আর বিশাল কালো দুই চোখ দেখে বুক কেঁপে উঠল তাঁর। হয়তো ইভানের সঙ্গে দেখা হলে ছেলেটা ভাল থাকবে, ভাবলেন তিনি।

'ঠিক আছে,' হার মানলেন, 'ও আসবে। এখন আব্বু, ঘুমাতে চেষ্টা করো তুমি।'

টমের বাবা স্ত্রীর কাছ থেকে ছেলের বায়না শুনবার পর দেরি করলেন না। পনি ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন পাগদের বাড়ির দিকে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ইভানকে হাজির হতে দেখা গেল খামার বাড়িতে।

বন্ধুর অমঙ্গল চিন্তায় ফ্যাকাসে হয়ে আছে বেচারার চেহারা। বন্ধুর কী হয়েছে জানবার জন্য শুরুতেই দৌড়ে গেল মিসেস লিউয়েলিনের কাছে, তার সঙ্গে কথা শেষে গায়ের শক্তির উপর ভর দিয়ে, নিঃশব্দে ঢুকল টমের কামরায়।

বিছানায় পড়ে থাকা শরীরের দিকে চেয়েই চমকে উঠল ইভান। এই এক সপ্তাহে তার বন্ধু, ভাই যেন আকারে অর্ধেক হয়ে গেছে। বলিষ্ঠ দেহের, কর্মচঞ্চল টম অদৃশ্য হয়েছে। বদলে পাণ্ডুর চেহারার, ভঙ্গুর দেহের যে বিছানায় পড়ে আছে, সে যেন ইভানের পরিচিত টম নয়, বরং অপরিচিত কোনও আগন্তুক। যে কি না দীর্ঘদিনের জ্বরা ও শোকে ক্লান্ত।

www.blogye.com

একটু পর চোখের পাতাদুটো আলাদা হলো, ধীরে ধীরে ইভানের উপর দৃষ্টি স্থির হলো টমের। ঠোঁটে হাসির মত কিছুর আভাস পাওয়া গেল। কথা বলতে শুরু করল টম। কিন্তু শব্দগুলো এত নিস্তেজ ও মৃদু, বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কান সামনে নিয়ে শুনতে হলো ইভানকে।

থমথমে কামরায় হালকা তরঙ্গ তুলে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলা কথাগুলো অবশ্য ঠিকই বুঝতে পারল ইভান।

'ইভান, কাউকে বোলো না, গত হপ্তায়... গোরস্থানের ওই আলোটা... তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে কী দেখেছিলাম...'

ক্লান্তিতে বালিশে হেলে পড়ল টমের মাথা।

'হ্যাঁ,' জরুরি কণ্ঠে বলল ইভান।

বেশ কিছুটা সময় পেরুনোর পর আবারও কথা বলতে পারল টম, 'আমি দেখেছি... ওই আলো... একটা মুখ... ওহ কী ভয়ঙ্কর... মৃত মানুষের মত... তখন বিশ্বাস করিনি... কিন্তু ওটা যে আমারই মুখ ছিল...

ধীরে ধীরে মিইয়ে এল কণ্ঠ, তারপর একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল টমের শরীর।

উঠে দাঁড়াল ইভান, আতংক ও ভয় নিয়ে চেয়ে রইল বন্ধুর প্রাণহীন শরীরের দিকে। নিজের মৃত্যু-মোমবাতি দেখেছে ওর বন্ধু টম!

বানশি (দ্বিতীয় পর্ব)

আয়ারল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের কাছে অশুভ এক শক্তি বানশি।

কখনও কখনও একে ডাকা হয় বহিন্থা কিংবা বানকিন্থা

www.blogye.com

নামে।

বানশি এ এলাকার মানুষকে দেখা দিয়েছে বহু আগে থেকেই। তবে তার ইতিহাস কত প্রাচীন তা বলা মুশকিল।

বানশির সবচেয়ে ভীতিকর বিষয় হচ্ছে, সে মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী করে।

অবশ্য, তার এই মৃত্যুসংকেত দেয়ার রীতি বদলেছে।

পুরনো দিনের আইরিশ গল্পে মানুষের মাথাসহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিংবা রক্তরঞ্জিত পোশাক ধুতে দেখা যেত বানশিকে।

তবে গত কয়েক শ' বছর ধরে সাধারণত চিৎকার করতে করতে হাত ঘুরিয়ে বা তালি দিয়ে মৃত্যুবার্তা দেয় বানশি।

সত্য হরর কাহিনি সিরিজের প্রথম বইয়ের ধারাবাহিকতায় এবারও বানশির কয়েকটি কাহিনি লিখছি।

এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলা বানশি নিয়ে দুটো ঘটনা পত্রিকায় পাঠান। দুটো অভিজ্ঞতাই তাঁর নিজের পরিবারের সদস্যদের।

তাঁর লেখা এখানে তুলে দিচ্ছি:

'আমার মার তখন কিশোরী বয়স। একদিন তাঁদের কর্কের ব্যাকরকে বাড়ির জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। এসময়ই একটা সেতুর উপর সাদা এক কাঠামোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। সেতুটা জানালা থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। কাঠামোটা বাড়ির দিকে ফিরে হাতদুটো নাড়ছে। তারপরই মার কানে এল বানশির কর্কশ চিৎকার। কয়েক সেকেণ্ড চলল আওয়াজ, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল অশুভ জিনিসটা।

'পরদিন আমার নানা কর্ক শহরে হাঁটছিলেন, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন তিনি। রাস্তার বড় এক পাথরে বাড়ি লাগে তাঁর মাথা। সঙ্গে সঙ্গে হারালেন জ্ঞান। আর কখনোই জ্ঞান ফেরেনি তাঁর।

'পরের কাহিনি ১৯০০ সালের মার্চ মাসের। মা তখন খুব অসুস্থ। এক সন্ধ্যায় আমি এবং নার্স মেয়েটি মার বিছানা ঠিক

www.blogye.com

করছি, এসময় ভয়ঙ্কর এক চিৎকার শুনলাম আমরা।

'মনে হলো যেন আওয়াজ আসছে মার বিছানার তলা থেকে। খাটের তলা ও চারপাশে ভালভাবে খুঁজলাম, শব্দের উৎসের খোঁজে। কিন্তু কিছুই দেখলাম না।

'নার্স আর আমি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। তবে কিছু বললাম না, কারণ মনে হলো মার কানে আওয়াজটা পৌঁছেনি।

'নীচের তলায় বাবার সঙ্গে বসে ছিল আমার বোন। সেও ওটা শুনেছে, ভেবেছিল তাঁর ছোট্ট ছেলেটার ভয়ঙ্কর কিছু হয়েছে। উপরের তলায় বিছানায় থাকবার কথা তার। হুড়মুড় করে সিঁড়ি টপকে উঠে দেখল শান্তিতে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা।

'তবে বাবার কানে আসেনি শব্দটা। পাশের বাড়ির লোকেরাও শব্দ শুনে ছুটে এল। তারা ভেবেছিল খারাপ কিছু হয়েছে বাড়ির ভৃত্যের।

'এসময়ই আমাদেরকে চমকে দিয়ে ভৃত্যটি বলল, "আপনারা বানশির নাম শোনেননি? মিসেস (আমার মা) আর বাঁচবেন না।"

'সত্যি ক'দিন বাদেই আমাদের ছেড়ে চলে যান মা।'

১৮৯৪ সালে আয়ারল্যাণ্ডের এক সরকারী বিদ্যালয়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, ধারণা করা হয় বানশির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। একটা ছেলে অসুস্থ হওয়ায় তাকে একটি কামরায় অন্য ছেলেদের থেকে আলাদা রাখা হয়।

পরে চিকিৎসক তাকে দেখতে এলেই হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করে বলে, কারও কান্নার আওয়াজ শুনছে।

কিন্তু চিকিৎসকের কানে কোনও শব্দ না আসায় বা কিছু না দেখায় সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, অসুস্থতার কারণে মাথায় চাপ পড়ায় এমন উল্টো-পাল্টা শব্দ শুনছে ছেলেটা।

কিন্তু ছেলেটা বারবার বলতে লাগল, কিছুর কান্নার আওয়াজ

www.blogye.com

পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এটাও বলল, 'ওটা বানশি। আমি আগেও এর শব্দ শুনেছি।'

পরদিন সকালে টেলিগ্রাম পেলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাতে বলা হয়েছে, অসুস্থ ছেলেটির ভাই দুর্ঘটনাবশত গুলি খেয়ে মারা গেছে।

বানশি যে শুধু আয়ারল্যাণ্ডের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থেকেছে, তা নয়। এমন কী প্রবাসী আইরিশদেরও দেখা দেয় সে। তাদের মৃত্যুর পূর্ব সংকেত দিয়েছে জানা গেছে।

এখন বলব বানশি বিষয়ক আরেকটি কাহিনি।

ইতালিয়ান এক লেকে এক প্রাইভেট ইয়টের ডেকে জড়ো হয়েছিলেন ক'জন পর্যটক। গল্প-গুজবে মশগুল সবাই। একসময় একটু থিতিয়ে এল কথাবার্তা।

এসময় এক কর্নেল ইয়টের মালিকের কাছে জানতে চাইলেন, 'কাউন্ট, এই অদ্ভুত চেহারার মহিলাটি কে?'

জবাবে কাউন্ট জানালেন, জাহাজে আমন্ত্রিত ভদ্রমহিলা ও স্টুয়ার্ডেস ছাড়া ইয়টে আর কেউ নেই।

কিন্তু কর্নেল তাঁর কথায় অটল। তারপরই আতংকে চেঁচিয়ে উঠে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন তিনি, বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'হায় খোদা! কী ভয়ংকর চেহারা!' কিছুটা সময় লাগল তার ধাতস্থ হতে। তারপর ভয়ে ভয়ে চোখ থেকে হাত সরিয়ে তাকালেন এবার স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'যাক, ওটা গেছে!'

'ওটা কী?' জানতে চাইলেন কাউন্ট।

'পৃথিবীর কিছু নয়,' বললেন কর্নেল। একটু থেমে যোগ করলেন, 'এক মহিলা, তবে অবশ্যই এ জগতের নন। অদ্ভুত আকার, জ্বলজ্বলে চেহারা। একমাথা ছড়ানো লাল চুল। চোখদুটো সুন্দর, কিন্তু সেখানে খেলছিল ভয়ঙ্কর কিছু। আইরিশ চাষীদের মত সবুজ টুপি মাথায়।'

এসময় একজন আমেরিকান মহিলা বললেন, বর্ণনাটা বানশির

www.blogye.com

সঙ্গে মেলে।

এবার কাউন্ট জানালেন তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন আইরিশ।

'তা হলে বানশিটা আপনার কোনও কারণেই এসেছে?' হঠাৎ কিছু না ভেবেই বলে বসলেন কর্নেল।

'তার মানে, ' শান্তভাবে বললেন কাউন্ট, 'আমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কেউ খুব তাড়াতাড়ি মরতে চলেছে। ঈশ্বর না করুন আমার স্ত্রী বা মেয়ে যেন মারা না যায়।'

তাঁর দুশ্চিন্তা কাটতে সময় লাগেনি। এর মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয় কাউন্টের নিজেরই।

সকাল হওয়ার আগেই মারা গেলেন তিনি।

মত্যু মুখোশ

উইং কমাণ্ডার জর্জ পটার ছিলেন মিশরে ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার। মিশনের ওই ঘাঁটি থেকে রোমেলের পণ্যবাহী জাহাজগুলো যে পথে চলাচল করত, সেখানে বৈমানিকদের পাঠানো হত মাইন ফেলবার জন্য।

যখন ভূমধ্যসাগরের বুকে প্রতিফলিত হয় পূর্ণিমার আলো, কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় বৈমানিকদের জন্য। সাধারণত দুটো ফ্লাইটের মাঝে মদ, ধূমপান ও হাসি-ঠাট্টায় মশগুল থেকে ভবিষ্যৎ ঝুঁকির কথা ভুলে থাকবার চেষ্টা করেন বৈমানিকেরা।

এক সন্ধ্যায় ফ্লাইং অফিসার রেগ ল্যাম্বকে নিয়ে মদ্যপান করতে মেসে ঢুকলেন পটার। ওখানে কে কে আছে দেখবার জন্য চারপাশে একবার চোখ বুলালেন পটার। তখনই তাঁর নজরে

www.blogye.com

পড়ল অপর উইং কমাণ্ডার রয়কে, বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন তিনি।

পটার আর ল্যাম্ব যখন নিজেদের পানীয় শেষ করলেন, রয়দের কোনা থেকে ভেসে এল হৈ-হুল্লোড়ের শব্দ।

এসময় ওদিকে চেয়ে নীলচে কালো অসীম গভীরতা দেখলেন পটার। তার মধ্যে ধীরে ধীরে ঘুরছে উইং কমাণ্ডারের মাথা ও কাঁধ। দুই ঠোঁট ফাঁক করা, ভয়ানকভাবে বেরিয়ে রয়েছে দাঁতগুলো। চোখের জায়গায় কেবল গর্ত। অর্থাৎ কোটরে চোখ নেই। মুখের মাংস এখনও আছে, কিন্তু তা সবুজাভ এবং একইসঙ্গে রক্তাভ। ঝরে পড়ছে বাম কানের লতির মাংস।

বীভৎস চেহারা দেখে চমকে উঠলেন উইং কমাণ্ডার পটার।

www.blogye.com

একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন পটার। মনে হলো থেমে গেছে তাঁর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

ব্যাখ্যাতীত আতংক দখল করে ফেলতে চাইল তাঁর অস্তিত্ব। কপালের দুই পাশের এবং ঘাড়ের পিছনের চুল তারের মত শক্ত হয়ে গেল তাঁর। বরফশীতল ঘাম নামল মেরুদণ্ড বেয়ে।

সারাশরীর কাঁপছে উইং কমাণ্ডার পটারের। ভাসা-ভাসাভাবে চারপাশের চেহারাগুলো নজরে পড়ছে তাঁর, কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে প্রভাব বিস্তার করছে ভয়াল ওই মৃত্যু মুখোশ!

একসময় মনে হলো ফ্লাইং অফিসার ল্যাম্ব তাঁর জামার হাতা ধরে টানছেন। 'হলোটা কী?' জানতে চাইলেন ল্যাম্ব, 'আপনার মুখ সাদা হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন ভূত দেখেছেন!'

'আমি আসলেই ভূত দেখেছি,' বললেন পটার, 'রয়ের চেহারায় মৃত্যুর ছায়া দেখেছি।'

ল্যাম্ব ঘাড় ঘুরিয়ে রয়ের দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁকে স্বাভাবিকই দেখাল।

তবে এখনও ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেননি পটার। তিনি ভাল করেই জানেন, আজ রাতে বিমান নিয়ে উড়াল দিচ্ছে রয়।

একবার ভাবলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলবেন, আজকে রাতে যেন রয়কে ছুটি দেয়া হয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত বদলালেন। তাঁর মনে হলো, আগে থেকেই ঠিক করা ঘটনা প্রবাহে তাঁর বাধা দেয়া উচিত হবে না।

গোটা রাতভর অশুভ খবরের জন্য অপেক্ষা করলেন। ভোরের দিকে বেজে উঠল টেলিফোন। আর তখনই জানা গেল, রয় আর তাঁর সঙ্গের সবাইকে গুলি করে নামানো হয়েছে। তবে বিমানটি সাগরে জরুরি অবতরণ করতে পেরেছে।

রয় ও অন্যদেরকে কাঠের খণ্ড আঁকড়ে ভেসে থাকতে দেখা গেছে।

বুক থেকে মস্ত এক পাথর নেমে গেল পটারের। তবে তাঁর

www.blogye.com

ওই স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হলো না।

পরে বিপুল তল্লাশি চালিয়েও রয় কিংবা অন্য কারও নাম-নিশানা পাওয়া গেল না।

আর তখনই উইং কমাণ্ডার পটার বুঝলেন, তাঁর দেখা সে দৃশ্যটির অর্থ— কালচে নীল গভীরতা ছিল রাতের ভূমধ্যসাগর আর এর মাঝে কোথাও ভাসছিল রয়, মৃত।

এ ঘটনা একটি জিনিসই প্রমাণ করে, সেদিন সন্ধ্যায় সামান্য সময়ের জন্য ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন পটার!

আত্মহত্যা

এবারের অভিজ্ঞতাটি আয়ারল্যাণ্ডের মিসেস ম্যাকআলপাইনের।

১৮৮৯ সালের জুনে ক্যাসলব্যানিতে যান, বোনের সঙ্গে দেখা করতে।

সেদিন বিকাল তিনটের দিকে বাড়িতে ফিরবার কথা তাঁর বোনের। কিন্তু মিসেস ম্যাকআলপাইনের জানলেন নির্ধারিত ট্রেনে আসছেন না তিনি।

সময় কাটাবার জন্য স্টেশনে ঘোড়া রেখে হাঁটতে বেরুলেন মিসেস ম্যাকআলপাইন।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পর বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। কাছেই ছিল একটা লেক। ওটার পাড়ে এক পাথরের উপর বসে পড়লেন বিশ্রাম নেয়ার জন্য।

গ্রীষ্মের চমৎকার রোদেলা দিন। সামনের অসাধারণ প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছেন তারিয়ে তারিয়ে। কিন্তু হঠাৎ করেই শীতল একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল তাঁর শরীরে। হাত-

www.blogye.com

পাগুলো শক্ত, জগদ্দল পাথরের মত হয়ে গেল। যেন চাইলেও নড়তে পারবেন না। কেমন ভয়-ভয় লাগল তাঁর। মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোনও শিকল দিয়ে কেউ বেঁধে রেখেছে তাঁকে পাথরের সঙ্গে। আর চোখের দৃষ্টি চাইলেও সরাতে পারছেন না লেকের জলের দিক থেকে।

তারপরই অবাক হয়ে দেখলেন, ধীরে ধীরে কালো এক মেঘ তৈরি হয়েছে সামনে। আর তার মাঝে দেখলেন এক লোককে। দীর্ঘদেহী, টুইডের সুট পরা সে তাঁর চোখের সামনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল লেকের পানিতে। পরমুহূর্তেই তলিয়ে গেল। হঠাৎ করেই আবারও অদৃশ্য হলো ওই মেঘের দেয়াল। আগের মত স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাকআলপাইনের দৃষ্টি।

দিনটা ছিল ২৫ জুন।

কয়েকদিন পর জানলেন, তাঁর ওই অভিজ্ঞতার সাত দিন পর জুলাইয়ের তিন তারিখ ব্যাঙ্কের এক ক্লার্ক ওই লেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

সেদিনের ওই অপ্রত্যাশিত ঘটনা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন মিসেস ম্যাকআলপাইন। কোনও এক অজানা কারণে লোকটার মৃত্যুদৃশ্য ক'দিন আগেই দেখে ফেলেছিলেন তিনি।

www.blogye.com

এই কামরা ভাল নয়

গোটা বাড়ি নয় বরং নির্দিষ্ট একটি কামরাকে ঘিরেও ঘটতে পারে ব্যাখ্যার অতীত নানা আজগুবি কাণ্ড। গা-শিউরানো এমনি কিছু কামরার বিবরণ ও তার ভিতর কী ঘটেছে তা নিয়ে এবারের এই অধ্যায়।

পোড়াকপালী

দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের ওয়েক্সফোর্ড কাউন্টির লফটাস হল নতুন করে তৈরি করেন টটেনহাম পরিবার। এখানেই থাকত অ্যান টটেনহামের ভূত। অ্যান টটেনহামের আত্মার বিচরণকাল ছিল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এসময়ে অনেকেই তাকে দেখেছেন, কণ্ঠ শুনেছেন।

তার পূর্বপুরুষদের বাড়িতে অ্যানের হানা দেয়া বন্ধ হওয়ার কারণটা লোকের মুখে মুখে বেশ প্রচলিত।

বলা হয় যে কামরায় অ্যানের মৃত্যু হয়, তা সংস্কার করলে দারুণ খেপে উঠেছিল আত্মাটা। আর এর ফলে ওখানে যাওয়া বন্ধ করে দেয় সে।

১৮৬৮ সালে অদৃশ্য হওয়ার পর আর একবারের জন্যও তাকে দেখেনি কেউ।

অ্যান টটেনহাম ছিল চার্লস টটেনহামের দুই মেয়ের মধ্যে ছোট।

ধনী একজন ভূ-স্বামী ছিলেন চার্লস। কর্তা ছিলেন লফটাস হলের।

অ্যানের আপন মা মারা যাওয়ার পর বাবা চার্লস আবারও বিয়ে করেন। নতুন এই মহিলা অ্যানের খোঁজ-খবর নেয়া তো দূরে থাক, তাকে খুব একটা পছন্দও করতেন না।

অ্যানের বড় বোন এলিজাবেথ বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে চলে যান। বলা চলে বোনের বিদায়ের পর একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে অ্যান। তার কোনও বন্ধু ছিল না, সৎ মা সব

সময় দূরে দূরে থাকতেন, আর বাবা ছিলেন এস্টেটের কাজে খুবই ব্যস্ত। ছোট মেয়েকে দেয়ার মত সময় তাঁর কই?

তা ছাড়া, ভদ্রলোকের ব্যবহার ছিল শীতল। মেয়েদের জন্য মনে নরম কোনও জায়গা ছিল না তাঁর।

ফলে বেশিরভাগ সময় অ্যানকে একাকীত্বের যন্ত্রণা নিয়েই কাটাতে হতো।

এক শীতের রাতের ঘটনা।

বিশাল ড্রইং রুমে বসে আছে অ্যান, তার বাবা ও সৎ মা।

কাপড়ে নকশি তুলবার কাজ করবার সময় বাইরে বাতাসের গর্জন ভেসে এল অ্যানের কানে। জানালার পর্দার উপর বড় বড় ফোঁটায় আছড়ে পড়ছে বৃষ্টি। ঠিক তখনই সদর দরজায় জোরে ঘা পড়বার শব্দে স্থির হয়ে গেলেন সবাই। লফটাস হল বড় রাস্তা থেকে বেশ দূরে। তা ছাড়া, রাতের এমন সময় বাড়িতে অতিথি আসবারও কথা নয়।

'এমন বাজে সময় কে এল?' বললেন মিসেস টটেনহাম।

মাথা ঝাঁকালেন তাঁর স্বামী। 'জোসেফ দরজার দিকে গেল মনে হলো। ফিরে আসুক দেখি কী বলে।'

কিছুক্ষণ পর ভৃত্যের পদশব্দ এ কামরার দিকে ফিরল। কয়েক মুহূর্ত পর দরজায় টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকল জোসেফ।

'স্যর,' বলল সে, 'বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন এক তরুণ। পথ হারিয়েছেন, পায়ে ব্যথা পেয়েছে তাঁর ঘোড়াটাও। রাতের মত আশ্রয় চাইছেন তিনি।'

এসময় খোলা সদর দরজা দিয়ে দমকা হাওয়া এসে ঢুকল। ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠলেন সবাই। আরও বেড়েছে বৃষ্টির আওয়াজ। মনে হলো কানে তালা লাগবে।

'আমার মনে হয় তাকে বাড়িতে থাকতে দেয়া যেতে পারে,' বললেন মিসেস টটেনহাম, 'এমন ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টির রাতে কাউকে ঠাঁই না দেয়া ঠিক হবে না। জোসেফ, তুমি বরং ভদ্রলোককে

www.blogye.com

ভিতরে নিয়ে এসো।'

'বেশ, ম্যাডাম,' এই বলে বেরিয়ে গেল ভৃত্যটি।

একটু পরে অতিথিসহ ফিরল সে।

উঠে দাঁড়িয়ে তরুণকে স্বাগত জানালেন মিস্টার টটেনহাম।

অ্যান যখন আগন্তুককে দেখল, এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল ওর হৃৎপিণ্ড।

তরুণ আসলেই সুদর্শন। নীল চোখে গভীর দৃষ্টি। সে সরাসরি অ্যানের চোখেই তাকাল। আর দারুণ সুন্দর হাসি তার।

সে মুহূর্তে, হঠাৎ দুর্বিপাকে বাড়িতে ঠাঁই নেয়া আগন্তুকের প্রেমে পড়ে গেল অ্যান।

মিস্টার ও মিসেস টটেনহাম যুবকের কাহিনি শুনলেন ধৈর্য নিয়ে। তারপর সম্ভ্রান্তদের মতই ঘোড়া সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকবার আমন্ত্রণ জানালেন।

অতিথির জন্য কামরা ঠিকঠাক করা হলো। রাতের খাবার খেতে খেতে ডাবলিনে তার দুশ্চিন্তাহীন, উচ্ছল জীবনের গল্প শোনাল তরুণ।

আর শুনতে শুনতে অ্যান যেন অন্য এক জগতে চলে গেল। ও কখনও ডাবলিনে যায়নি, বড় শহর বা সেখানকার জীবন, পার্টি এসব সম্পর্কে ওর কোনও ধারণাই নেই।

তরুণের প্রতিটি কথা গিলতে গিলতে মনে হলো ও যেন একটা মোহের জালে আটকা পড়ছে ধীরে ধীরে।

সুদর্শন অতিথি সত্যি ক'দিন থেকেই গেল

আর প্রতিটি পলকে যেন আরও গভীরভাবে তাকে ভালবেসে ফেলল অ্যান।

যতদূর বোঝা গেল, তরুণও পছন্দ করে অ্যানের সঙ্গ।

একসঙ্গে মাঠে ঘুরে বেড়ায় দুজনে, তরুণীকে পিয়ানো বাজাতে অনুরোধ করে তরুণ, আবার ওর জীবন সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করে।

www.blogye.com

যখন মেয়েটা তার একাকীত্বের কথা বলে, তখন গম্ভীর হয়ে যায় সে।

'এই সময় বদলাবে,' শান্তভাবে ভরসা দিল তরুণ আগন্তুক।

তারপর একদিন সহিস জানাল, ঘোড়াটা এখন আবার চলবার উপযোগী হয়ে উঠেছে। কাজেই সুবেশী, সুন্দর চেহারার তরুণের লফটাস হলে আর পড়ে থাকবার কোনও কারণ রইল না।

এর পর পরই অ্যানের বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চমৎকার আতিথেয়তার জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাল সে। অ্যানের হাত ধরে চাপ দেয়ার সময় ফিসফিস করে কেবল কয়েকটি কথা উচ্চারণ করল: 'আমাদের আবারও দেখা হবে...'

একরাশ বিষাদ নিয়ে ঘোড়সওয়ারকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেখল মেয়েটা। বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়া মানুষটার বিদায়ে দুমড়ে-মুচড়ে গেল ওর হৃদয়। একইসঙ্গে আশায় বুক বাঁধল, আবারও দেখা হবে দুজনের।

বোকা মেয়েটার দৃঢ় বিশ্বাস, যখন সুদর্শন আগন্তুক আসবে, তার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে এ বাড়ি ছাড়বে. ও-ও, ডাবলিনের আনন্দময় জীবনে শরিক হবে।

এরপর একের পর এক গেল দিন, সপ্তাহ, মাস— গড়িয়ে যেতে লাগল সময়।

কিন্তু তরুণের কোনও নাম-নিশানা নেই। এমন কী চিঠি কিংবা কোনও খবরও এল না।

অ্যানের মনে হতে লাগল, যেন ওই সময়টুকু মধুর কোনও স্বপ্নের অংশ ছিল।

প্রতিদিন জানালার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে দূরদিগন্তে হারিয়ে যাওয়া দীর্ঘ পথের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অ্যান। কল্পনা করে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসবে এক ঘোড়সওয়ারী, রূপকথার বন্দি রাজকন্যার মতই উদ্ধার করে নিয়ে যাবে ওকে।

কিন্তু হায়, বৃথা চেয়ে থেকে চোখ ব্যথা করা ছাড়া আর কিছুই

www.blogye.com

কপালে জুটল না পোড়াকপালী মেয়েটির।

এভাবে অপেক্ষা করতে করতে অ্যানের মনের উপর যে চাপ পড়ল, এর ফলাফল মোটেই ভাল হলো না।

দেখতে দেখতে লাজুক, শান্ত এক মেয়ে পরিণত হলো রগচটা এক মানুষে। প্রায় সারাক্ষণ চেঁচামেচি করতে লাগল উন্মাদের মত।

ওর কাছে যেতে সাহস করে না কেউ। এমন কী বাড়ির ভৃত্যরাও মেয়েটার দেখভাল করতে রাজি থাকল না।

অ্যানের বাবা ও সৎ মা হতাশ, অধৈর্য হয়ে পড়লেন। চিকিৎসকরাও কোনও সাহায্য করতে ব্যর্থ হলেন।

বাড়ির সবচেয়ে শক্তপোক্ত ঘরে আটকে রাখা হলো মেয়েটাকে।

বাড়ির অন্য অংশ থেকে ওই ঘরকে আলাদা করেছে লম্বা, সরু এক বারান্দা। ঘরের দেয়ালে রঙিন কাপড়ের ঝালর ঝুলত। কিন্তু কারও নজর না থাকায় অযত্ন, অবহেলায় রীতিমত জীর্ণ, মলিন অবস্থা হলো গোটা ঘরের। এক কোণায় বিশাল এক আলমারি। আকার-আয়তনে ওটা ছোটখাট ঘরের সমান।

জীবনের বাকি দিনগুলো এ কামরাতেই কাটাল অ্যান।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঠেলে দেয়া হতো খাবার।

কেউ খবর নিতে আসত না মেয়েটার।

হতভাগী মেয়েটার ভাগ্যে কী ঘটছে তাতেও যেন কারও কিছু যায় আসে না।

আরও বেশি বুনো, নোংরা হয়ে উঠতে লাগল সে। ক্রমেই মানুষের চেয়ে বুনো প্রাণীর সঙ্গেই ওর বেশি মিল থাকল।

একসময় মরেই গেল পোড়াকপালী মেয়েটি।

কোনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান ছাড়াই গোর দেয়া হলো তাকে। আর পরিবারের সবাই যেন নিজেদের মন থেকে মুছে ফেলল বেচারির সব স্মৃতি।

www.blogye.com

লফটাস হল।

রংচঙে কাপড়ের ঝালর লাগানো সে কামরার দরজা কখনোই খোলা হতো না, কেউ সেখানে ঢুকবার তো প্রশ্নই ওঠে না তার বাবা ও সৎ মা যতদিন বেঁচে থাকলেন, এমন কী অ্যান টটেনহামের নামও উচ্চারণ করা হলো না লফটাস হলে

সময়ের চাকা ঘুরতে লাগল। একের পর এক বছর পেরুতে লাগল। টটেনহামদেরও বয়স বাড়ল

রীতিমত বুড়ো হয়ে গেলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই

আঠারো শতকের শেষভাগের ঘটনা।

একটা পার্টির আয়োজন করলেন টটেনহামরা।

প্রচুর সংখ্যক অতিথির আগমন ঘটল লফটাস হলে।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক বিচারক, তিনি আবার সুপরিচিত এক যাজকের বাবা।

কিন্তু ভদ্রলোকের কপাল মন্দ, এলেন দেরি করে, বাড়ির ভাল সব কামরা অন্য অতিথিদের দিয়ে দেয়া হয়েছে ততক্ষণে।

www.blogye.com

তাঁকে আরও ভাল ঘর দিতে পারছেন না সেজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন মিসেস টটেনহাম।

যে কামরাটায় যাজকের বাবাকে নিয়ে এলেন ভদ্রমহিলা, ওটা লম্বা, টানা এক বারান্দার শেষপ্রান্তে। দেয়ালে ঝুলছে রংচঙে কাপড়। অনেকদিন ঘরে কেউ না থাকায় বাসি একটা গন্ধ। বোঝা যায় অতিথি রাখবার জন্য খুব দ্রুত গোছানো হয়েছে এই ঘর।

সারাদিনের যাত্রায় অতিথি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। কাছেই একটা টেবিলের উপর রেখেছেন নিজের পিস্তলটা। সেসব দিনে আয়ারল্যাণ্ডে পর্যটকরা সবসময় সঙ্গে রাখতেন আগ্নেয়াস্ত্র। পথে ভয় ছিল লুটেরাদের হামলার।

কয়েক মিনিটের ভিতর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল তাঁর।

নিশ্চিতভাবেই বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেউ!

অন্ধকারে বড়সড় কুকুরের মতই মনে হল ওটাকে।

বন্যজন্তুর মতই চিৎকার করছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য!

তিনি নিজে সতর্কতার সঙ্গে দরজা আটকেছেন।

তা হলে প্রাণীটা ঢুকল কী ভাবে?

এর একটাই অর্থ।

দাওয়াতে আসা বন্ধুদের কেউ এই বিশ্রী মজাটা করেছে তাঁর সঙ্গে। সম্ভবত এ কামরার চাবি হাতিয়ে তাঁকে ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে এখন।

'তুমি যেই হও, খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, 'আবার ঝাঁপিয়ে পড়লে কিন্তু গুলি করতে বাধ্য হব!'

বিছানার চাদর ধরে জোরে টানছে ওটা। গর্জনটা ক্রুদ্ধ, চাপা।

ওই মুহূর্তেই আতংকিত হয়ে আবিষ্কার করলেন অতিথি, তাঁর শরীরের উপর একটা ওজন চেপে বসেছে।

www.blogye.com

প্রাণপণ চেষ্টায় ওটাকে সরিয়ে দিতে পারলেন। হাতড়ে পিস্তলটা তুলে নিলেন টেবিল থেকে। বিশাল ফায়ারপ্লেসের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়লেন দেরি না করে।

বদ্ধ জায়গায় গুলি ফুটবার শব্দে যেন কানে তালা লেগে গেল।

শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে ভীত অতিথি আবিষ্কার করলেন, বন্ধ হয়েছে চাপা গর্জন, আর বিছানার উপর যে ছিল সেও সটকে পড়েছে।

এবার বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে মোমবাতি ধরালেন তিনি। গোটা কামরা ঘুরে খুঁজলেন, এমন কী উঁকি দিলেন বিশাল আলমারির ভিতরে।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই।

দরজা আটকানো, বিছানায় যাওয়ার সময় যেমনটা ছিল।

আতংকে শিউরে উঠলেন তিনি।

বদ্ধ ঘরের ভিতর কেউ নেই, অথচ নিশ্চিত ভাবেই কেউ ছিল!

কোনও কিছুরই কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না।

অনেকটা ঘোরের মধ্যেই সকালের প্রথমভাগে আবার দু-চোখের পাতা এক হয়ে এল তাঁর।

নাস্তার সময় মিসেস টটেনহামকে খুঁজে নিয়ে রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন বিচারক।

তাঁর কথা শুনে কেবল ভ্রূ কুঞ্চিত হলো মহিলার। কিন্তু কোনও ব্যাখ্যা দিলেন না। কেবল বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত যে ওই ঘরে আপনাকে ঘুমাতে হয়েছে। যদি বাড়িতে আরেকটা ঘরও খালি থাকত, সেখানেই আপনাকে তুলতাম।'

ভদ্রমহিলার এভাবে আত্মসমর্পণের পর আর কিই বা বলবার থাকে অতিথির।

বিষয়টা চেপে গেলেন তিনি।

তারপর আরও অনেকগুলো বছর কেটে গেল। লফটাস হলে

www.blogye.com

তখন বসবাস করছেন মারকুইস অভ অ্যালি। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছেদের দেখাশুনা করছে মাইকেল শ্যানন, তাকে থাকতে দেয়া হলো কাপড়ের ঝালরওয়ালা সেই কামরায়।

মধ্যরাতে আতংকিত চিৎকার শোনা গেল ওই কামরা থেকে।

রাতের পোশাক পরা শ্যানন দৌড়ে বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। তার চেহারা ফ্যাকাসে, ভীষণ ভয়ে থরথর করে কাঁপছে শরীর।

'এখানে আর এক মুহূর্ত নেই আমি!' চিৎকার শুনে ছুটে আসা তাঁর মালিক ও অপর অতিথিদের দিকে চেয়ে বলল শ্যানন।

'ঘটনা কী?' জানতে চাইলেন মারকুইস।

উত্তর দেয়ার মত ধাতস্থ হতে বেশ সময় লাগল শ্যাননের।

'আমি বিছানায় ছিলাম,' শেষপর্যন্ত শুরু করতে পারল, কিন্তু বারবার কাঁধের পাশ দিয়ে ভীত দৃষ্টি দিচ্ছে পিছনে, 'কামরাটা খুব অন্ধকার, আর আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এসময় জানালার পর্দাগুলো ধীরে ধীরে সরে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। চাঁদের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছে বিছানায়। আর তাতে পরিষ্কার দেখলাম আমার বিছানার পাশে এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দীঘল দেহী, চুল জটা পাকানো, আর চোখে পাগলাটে দৃষ্টি আমার দিকে যখন এগুচ্ছিল তার রেশমী পোশাকের খসখস শব্দ পরিষ্কার শুনছিলাম। উঠে বসে জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, হাত দিয়ে ঢেকে ফেললাম চোখদুটো যখন চোখের সামনে থেকে হাত সরালাম, দেখি সে অদৃশ্য হয়েছে... একটা বদ্ধ কামরা থেকে গায়েব হয়ে গেছে... স্যর, আমাকে আর ওই কামরায় ফিরতে বলবেন না!'

তারপর থেকে নিয়মিত লফটার হলে আসা অতিথিদের দেখা দিয়ে চমকে দিতে লাগল অ্যান টটেনহাম

সবার গল্প মোটামুটি একই ধরনের।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় হাজির হয় সে, ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় বিছানার দিকে। পরনে তার ফুলের নকশা কাটা পশমের কাপড়,

www.blogye.com

হাঁটবার তালে খস খস শব্দ হয় তাতে।

তাকে যারা দেখে, তাদের কেউ কেউ আতংকে বিছানার চাদরের ভিতর গোঁজে মাথা, কেউ আবার বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে যায় দরজার দিকে। যাঁরা স্থির হয়ে ভুতুড়ে নারীমূর্তির গতিবিধি লক্ষ করেন, তাঁরা দেখেন বিছানার পাশ ঘেঁষে হেঁটে বিশাল আলমারির দিকে যেতে চলেছে সে। তারপরই কোনও এক ভোজবাজিতে যেন ওটার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যায়। অবশ্য সাহসী এক ভদ্রলোকের আবার হয়েছে ভিন্ন অভিজ্ঞতা। নারীমূর্তিটিকে দেখবার পর শান্তভাবে বিছানা থেকে নেমে আসেন তিনি। তারপর ছুটে যান ওটার দিকে। মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'তোমাকে ধরে ফেলেছি আমি।'

কিন্তু হায়! নারীর শরীর কেটে চলে যায় তাঁর হাত। ছায়ামূর্তি কোনও কথা বলেনি, এমন কী ফিরেও চায়নি। কেবল চলবার গতি একটু দ্রুত হয়েছিল। তারপর অনেকটা শূন্যে ভেসে আলমারির ভিতর অদৃশ্য হয়েছে।

হতচকিত ভদ্রলোক তাকে অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু আলমারির সামনে গিয়ে দেখলেন ওটার দরজা বন্ধ। বেশ কিছুটা সময় জোর খাটিয়ে দরজা খুলতে পারেন ভদ্রলোক। কিন্তু ভিতরে উঁকি দিয়ে ধুলো ও মাকড়সার জাল ছাড়া নজরে পড়েনি কিছুই।

উনিশ শতকের মাঝামাঝির দিকে লফটাস হলের মালিকানা ছিল মারকুইস অভ অ্যালির। গ্রীষ্মকালীন আবাস হিসাবে ব্যবহার হতো তখন ওই প্রাসাদ

এক গ্রীষ্মে ছেলে ও তার শিক্ষক, চার্লস ডেল নামের এক যাজকসহ লফটার হলে এলেন মারকিউনেস অভ অ্যালি।

শিক্ষক ভদ্রলোক শান্ত স্বভাবের ও মুক্ত মনের মানুষ। অ্যান টটেনহামের ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গ জানা নেই ভদ্রলোকের। কাজেই কাপড়ের ঝালরওয়ালা নিঝুম কামরায় যখন তাঁর থাকবার ব্যবস্থা

www.blogye.com

হলো, এ নিয়ে কোনও চিন্তাও এল না মাথায়। বরং অপর কামরাগুলো থেকে দূরে হওয়ায় শান্তিতে থাকবেন ভেবে খুশিই হলেন।

এমন কী গোড়ার দিকে চিন্তিত হওয়ার মত কিছু ঘটলও না।

এভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল।

তারপরই একরাতে মিস্টার ডেলের এমন এক অভিজ্ঞতা হলো, যেমনটা হয়েছিল ষাট বছর আগে টটেনহামদের অতিথি হয়ে এ বাড়িতে আসা এক যাজকের বাবার।

অন্য রাতের চেয়ে একটু দেরি করেই ঘুমুতে গিয়েছিলেন বাড়ির সবাই।

সবসময় যা করেন, দরজা আটকে জানালার শার্সি লাগিয়ে পর্দা টেনে দিলেন ডেল। তারপর বিছানায় গিয়ে নিভিয়ে দিলেন মোমবাতি।

কয়েক মিনিট মাত্র পেরিয়েছে। কেবল ঘুম একটু লেগে আসছে। এমন সময়ই মনে হলো কী যেন লাফিয়ে পড়েছে বিছানায়। তারপরই ক্রুদ্ধ জন্তুর গর্জন শুনলেন হতবিহ্বল ডেল। কে যেন বিছানার চাদর ধরে সমানে টানছে। চাদরটা শক্ত করে দু-হাতের মুঠোর ভিতর রেখে সর্বশক্তিতে টান দিলেন। কিন্তু ক্রমেই ওটা তাঁর হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে।

মনে হলো যেন বদ্ধ কামরার অনুপ্রবেশকারী তাঁর চেয়েও শক্তিশালী।

একপর্যায়ে চাদরটাকে ছেড়ে দিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে মোমবাতি জ্বাললেন ডেল। উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে তাঁর

কিন্তু কামরায় নিজে ছাড়া অন্য জনপ্রাণীর দেখা মিলল না।

বিছানার তলায়, আলমারির ভিতর খুঁজলেন।

কিন্তু কিছু পেলেন না।

এবার সত্যি সত্যি আতংকিত হলেন ডেল, সম্ভবত জীবনে প্রথমবারের মত। তখনই স্থির করলেন, এ কামরায় আর এক

www.blogye.com

রাতও কাটাবেন না।

মারকিউনেস অভ অ্যালিকে রাতের অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা খুলে বলতে মহিলা বললেন, ওই ঘরেই তাঁকে থাকতে হবে। ডেল যাজক হতে পারেন, কিন্তু ভূতের সঙ্গে পারবেন কেন! জান বাঁচানো জরুরি, কাজেই এবার চাকরি ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন তিনি।

এর বহু বছর পর ওই ঘটনা প্রকাশ করেন তিনি।

অ্যান টটেনহাম শেষ দেখা দেয় ১৮৬৮ সালে।

তখন লফটার হলের সংস্কার কাজ চলছে।

অ্যানের কামরার থেকে কাপড়ের ঝালর খুলে নেয়া হলো, যে আলমারির ভিতর অদৃশ্য হতে দেখা যেত তাকে, সেটাও খুলে ফেলা হলো। দেয়ালে বসল বাড়তি জানালা, আর পুরো কামরাকে পরিণত করা হলো বিলিয়ার্ড রুমে।

যেখানে অ্যানের বিছানা ছিল, সেখনে শোভা পেতে থাকল বিশাল আকারের এক বিলিয়ার্ড টেবিল।

সন্দেহ নেই এই পরিবর্তন সবচেয়ে খেপিয়ে তুলল হতভাগী অ্যানকে।

নির্মাণ শ্রমিকরা চলে যাওয়ার পর খেলবার জন্য তখন পুরো প্রস্তুত কামরাটা। সাজিয়ে রাখা হলো অনেকগুলো বিলিয়ার্ড বল। তারপরই আবার হাজির হলো মেয়েটা। বাড়ির দেখাশুনার দায়িত্বে থাকা মিসেস নীল বেশ রাতে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এসময় দরজার ভিতর থেকে অদ্ভুত কিছু আওয়াজ শুনে থমকে গেলেন। পা টিপে টিপে গিয়ে একটু ফাঁক করলেন দরজাটা, ভিতরে কী হচ্ছে দেখবার জন্য। নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো তাঁর, চোখ যেন বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে, যা দেখছেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে মিসেস নীলের।

'ওটা, মিস অ্যান,' পরদিন সকালে বাড়ির মালিককে বলেন মহিলা, 'খুব রেগেছিলেন। টেবিলের চারদিকে বল ছুঁড়ছিলেন।

www.blogye.com

তারপর শান্তভাবে কামরার যেদিকে আলমারি ছিল, সেদিকে হেঁটে গেলেন। শেষবারের মত ক্রুদ্ধভাবে তাকালেন কামরার দিকে, তারপর হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।'

যতদূর জানা যায় প্রিন্স আলবার্টের মৃত্যুর কিছুদিন আগে উইণ্ডসর ক্যাসলে এক রাতে ভূত, প্রেতাত্মা এসব নিয়ে আলাপ জমে ওঠে। এসময় মারকিউনেস অভ অ্যালি রাণী ভিক্টোরিয়াকে অ্যান টটেনহামের ভূতের গল্প শোনান।

এসময় রাণী বলেন, 'এসব জিনিসে আমার বিশ্বাস নেই। আমি আশা করব তুমি প্রিন্সের সামনে এ কাহিনি বলবে না, কারণ ওর আবার এসবে খুব বিশ্বাস।'

যে তরুণকে অ্যানের এই পরিণতির কারণ বলে মনে করা হয়, মূল কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়েও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কাহিনিটা যে আকর্ষণীয় তাতে সন্দেহ নেই, তবে অ্যানের পাগলামির যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে বের করবার জন্যই তা বানানো হয়েছে বলে মনে করা হয়।

কিংবদন্তী অনুসারে লফটাস হলে যে ক'দিন ছিলেন তরুণ, নিয়মিতই বসত তাসের আসর। অ্যানকে সঙ্গী করে মিস্টার ও মিসেস টটেনহামের বিরুদ্ধে খেলতেন আগন্তুক।

প্রায় প্রতি খেলাতেই অ্যান আর তরুণ জিতে যেত।

এক সন্ধ্যার ঘটনা।

সেদিনও ভাগ্যদেবী অ্যান ও তরুণের দিকেই আছেন।

হঠাৎ নীচে পড়ে গেল অ্যানের হাতের আংটি। ওটা তুলতে টেবিলের নীচে মাথা ঢুকিয়ে দিল অ্যান। এসময়ই আতংকিত হয়ে আবিষ্কার করল, সঙ্গীর পা মানুষের মত নয়, বরং ছাগলের মত চেরা খুর তার পায়ে। আতংকে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা।

অ্যানের বাবা ও সৎ মা কী হয়েছে বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলেন বিস্মিত দৃষ্টিতে।

কিন্তু আগন্তুক বুঝে গেল তার পরিচয় আর গোপন নেই।

www.blogye.com

মুহূর্তের মধ্যে ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আর এই ধাক্কা কখনোই সামলে উঠতে পারেনি অ্যান।

কিংবদন্তীকে সত্য ধরে নিলে এ কারণেই উন্মাদ হয়ে ওঠে মেয়েটা।

অশুভ হাত

এবারের অভিজ্ঞতাটি আয়ারল্যাণ্ডের মেজর সি.জি. ম্যাগ্রেগরের।

১৮৭১ সালের শেষের দিকে তিনি থাকতেন স্কটল্যাণ্ডে।

সেসময় আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিনের উত্তর পাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে হলো কয়েকদিনের জন্য।

১৮৭২-এর জানুয়ারিতে তাঁর আত্মীয়ের স্বামী, যাঁর বয়স ৮৪, হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

কোনও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকা না থাকায় মেজর ম্যাগ্রেগর ও বাড়ির খানসামা টানা ষোল রাত তাঁর পাশে কাটান।

এক সময় একটু ভালর দিকে মনে হলো ভদ্রলোকের অবস্থা। সতেরোতম রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটার দিকে ম্যাগ্রেগর খানসামাকে বললেন, 'তোমার কর্তার অবস্থা এখন বেশ ভাল মনে হচ্ছে। আমি বরং বিছানায় যাই। যদি কোনও কারণে তাঁর শরীর খারাপ হয়, কিংবা আমাকে দরকার হয়, ডেকো।' তারপর বাড়ির যে কামরা তাঁকে দেয়া হয়েছে, সেদিকে চলে গেলেন।

কয়েকদিনের নিদ্রাহীনতায় শরীর এমনিতেই ক্লান্ত ছিল। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই বুজে গেল মেজরের দু-চোখ।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন বলতে পারবেন না। হঠাৎ ডান কাঁধে

www.blogye.com

হালকা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলেন। দরজার দিকে মুখ করে ডান দিকে কাত হয়ে শুয়েছিলেন। দরজা আবার বিছানার ডান পাশে, আর বামে ফায়ারপ্লেস।

অবাক হয়ে একটু জোরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এডওয়ার্ড, কোনও সমস্যা?'

কিন্তু কোনও উত্তর পেলেন না।

তার বদলে আরেকবার ধাক্কা দিল কেউ।

এবার বেশ রেগে গিয়ে ম্যাগ্রেগর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি কি কথা না বলার পণ করেছ? সমস্যা কী সেটা তো বলবে!'

এবারও কোনও জবাব পেলেন না।

এসময়ই মনে হলো আবার আরেকটা ঠেলা খেতে চলেছেন।

এবার পাশ ফিরে খপ করে তাকে ধরে ফেললেন তিনি। তখন মানুষের হাতই মনে হলো।

উষ্ণ, নরম, নধর একটা হাত।

'কে তুমি?' জানতে চাইলেন মেজর।

প্রতিপক্ষ এখনও নিশ্চুপ।

এবার একটু সন্দেহ হলো মেজরের।

পরিচয় বের করবার জন্য মানুষটাকে তাঁর দিকে টেনে আনবার চেষ্টা করলেন অন্ধকারে। কিন্তু সুঠামদেহী, পেটা শরীরটা নিয়েও তাকে নড়াতে পারলেন না এক দণ্ড।

উল্টো মনে হলো তাঁকেই বিছানা থেকে নামিয়ে ফেলবে সে।

রোখ চেপে গেল মেজরের। বললেন, 'তুমি কে বের করছি আমি!'

ডান হাত দিয়ে শক্ত করে তখনও শত্রুর হাত চেপে ধরে আছেন। এবার বাম হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝলেন আগন্তুকের কবজি ও বাহু লিনেনের আটসাট, মোটা কাপড়ে ঢাকা।

কিন্তু কনুই পর্যন্ত পৌঁছেই থমকে যেতে হলো তাঁকে।

আর কিছু নেই!

www.blogye.com

এতই বিস্মিত হলেন মেজর যে, ছেড়ে দিলেন হাতটাকে।

ওটাও সরে পড়ল এবার।

তখনই ঘড়িতে রাত দুটো বাজবার সংকেত পড়ল।

কী মনে করে বিছানা ছেড়ে নেমে, দৌড়ে দরজার কাছে গেলেন মেজর।

অদ্ভুত ব্যাপার।

দরজাটা লাগানো, তিনি কামরায় ঢুকে বন্ধ করেছেন, তার পর কবাট না ভেঙে কেউ ঢুকতে পারবে না। দরজা আগের মতই বন্ধ। ঘরে আর কেউ নেই।

তা হলে ওটা এল কী ভাবে?

আরেকটা চিন্তা এল তাঁর। যখন হাত ধরে টানাটানি করছেন, অন্য কারও শ্বাস নেয়ার শব্দ শোনেননি, অথচ বল প্রয়োগ করতে গিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন তিনি নিজে।

ওই হাত কোনও মহিলার।

এ বাড়িতে মহিলা আছেন মোট পাঁচজন। আর মেজরের মনে কোনও সন্দেহ নেই, ওই তরুণী-হাত তাঁদের কারও নয়।

পরে যখন খুলে বললেন, বাড়ির চাকর বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'এটা মনে হয় মালিকের বুড়ো ফুপু, আন্ট বেটি। ওই বুড়ি মহিলা বাড়ির উপরতলায় অনেক বছর ছিলেন। দুটো কামরা দখল করে থাকতেন। মারা গেছেন অনেক বয়স হয়ে, তাও পঞ্চাশ বছরের বেশি হবে।'

খোঁজখবর নিতেই মেজর নতুন কিছু তথ্য পেলেন।

যে কামরায় হাতের উপস্থিতি ছিল, সে ঘরকে ভুতুড়ে বলা হয়। অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যায়, আজব সব ঘটনা ঘটে। বিছানা-চাদরও ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায় কখনও।

একবার এক মহিলাকে কষে এক চড় দেয় অদৃশ্য এক হাত।

মোমবাতি জ্বালতেই কী যেন লাফিয়ে বিছানা থেকে পড়বার আওয়াজ পান আরেক মহিলা।

www.blogye.com

বাড়ির মালিকের এক ভাই দু' রাত এখানে কাটিয়েছিলেন।

তৃতীয় রাত হোটেলে কাটান। তিনি কী দেখেছেন বা শুনেছেন তা কাউকে বলেননি।

শুধু বলেছেন কামরাটা অশুভ।

পরে এ কামরায় আরও কিছুদিন ছিলেন মেজর ম্যাগ্রেগর। কিন্তু আর কখনও ঝামেলায় পড়েননি, কিংবা কেউ বিরক্ত করেনি তাঁকে।

ওখান থেকে চলে আসবার পর একটা বিষয় বারবার খুঁচিয়েছে তাঁকে। সে রাতে এতটা চমকে গিয়ে হাতটাকে ছেড়ে না দিলে হয়তো ওটার আগমনের উদ্দেশ্য জানতেন।

কেন ওই হাত এসেছিল এই প্রশ্নের উত্তর পাননি তিনি।

কে জানে, সতর্ক সংকেত দিতেই এসেছিল কি না! অবশ্য ওই অসুস্থ বুড়ো আত্মীয় বেঁচেছিলেন আরও সাড়ে তিনবছর।

জাদুঘরের ভূত

প্রথম ভূতটাকে জর্জ জোন্স দেখেন ১৯৫৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, রবিবার।

তখন সন্ধ্যা সাতটা চল্লিশ মিনিট।

ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ার জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন জোন্স। সাধারণত রবিবার ছুটি থাকে তাঁর। কিন্তু এ রাতে একটি ধর্মীয় সংগঠন দোতলার বড় কামরায় সভার আয়োজন করেছিল। তাই অনুষ্ঠান শেষে জাদুঘর বন্ধ করবার জন্য থাকতে হয়েছে জোন্স এবং তাঁর স্ত্রীকে। ভদ্রমহিলাও এখানেই চাকরি করেন।

www.blogye.com

সভা শেষে সংগঠনের সবাই চলে গেছেন।

জোন্স দরজা-জানালা আটকে কিচেনে এসে বাড়ি ফিরবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন সময় উপরতলায় শুনলেন পদশব্দ।

'নিশ্চয়ই মিস্টার উইলমট,' স্ত্রীকে বললেন জোন্স।

উইলমট এ জাদুঘরের পরিচালক।

জোন্স ভাবলেন, জাদুঘর সাধারণের জন্য বন্ধ থাকলেও দরকারি কোনও কাজে তাঁর অফিসে এসেছেন উইলমট।

'আমি বরং তাঁকে গিয়ে বলে আসি আমরা বাড়ি ফিরছি,' বললেন জোন্স।

সিঁড়ি বেয়ে অফিসের দিকে অর্ধেক উঠেছেন, এমন সময় ছোটখাট লোকটাকে দেখলেন।

দেখে তাকে ভুলোমনা অধ্যাপক মনে হচ্ছে। পুরনো ফ্যাশনের পোশাক পরনে, পুরু ধবধবে সাদা জুলপি শুরুতেই নজর কাড়ে। ফিসফিস করে আনমনে বলতে বলতে মিস্টার উইলমটের অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। তারপর রওনা দিলেন হলের দিকে। যখন সিঁড়ির সামনে এলেন, তখনও জোন্সকে খেয়াল করেছেন এমন কোনও নিশানা দেখা গেল না।

জোন্স প্রথমে ভাবলেন, জাদুঘরের কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ করতে উইলমটের কাছে এসেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু এখন এখানে আসবার মোটেই উপযুক্ত সময় নয়, সবচেয়ে বড় কথা, রবিবার কখনোই ব্যবসায়িক আলাপের জন্য জাদুঘর খোলা থাকে না। তা ছাড়া, জোন্স নিশ্চিত, সভা শেষে ধর্মীয় সংগঠনটির সবাই চলে যাওয়ার পর সবগুলো দরজা বন্ধ করেছেন তিনি।

তা হলে নিশ্চয় ইনি ওই সভাতেই এসেছেন, আর ভুলক্রমে ভিতরে আটকা পড়ে গেছেন।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে কেমন আলাভোলা মানুষ।

সিঁড়ির মাথায় উঠে এলেন জোন্স।

ছোটখাট লোকটি হলঘর থেকে পা টেনে টেনে আবার মিস্টার

www.blogye.com

উইলমটের অফিসের দিকে রওনা হয়েছেন। এ লোক যেই হোন, ব্যবসায়িক কাজে আসেননি, এ বিষয়ে জোন্স এখন নিশ্চিত।

অফিস কামরার দরজার দিকে রওনা হলেন তিনি। কিন্তু কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ভদ্রলোক তাঁকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন।

'মাফ করবেন, স্যর, আপনি কি মিস্টার উইলমটের খোঁজ করছেন?' পিছন থেকে জানতে চাইলেন জোন্স।

কিন্তু অপর তরফ থেকে কোনও জবাব মিলল না।

নরম কণ্ঠে আপন মনে কী যেন বলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক।

কান পেতে জোন্স বুঝলেন, সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাওয়ার সময় একই কথা আউড়াচ্ছেন তিনি, 'আমি অবশ্যই ওটা খুঁজে পাব... আমি অবশ্যই ওটা খুঁজে পাব... আমি অবশ্যই ওটা খুঁজে পাব...'

খুদে আগন্তুককে অনুসরণ করে জাদুঘরের লাইব্রেরিতে চলে এলেন জোন্স। সব বাতি নিভানো। তবে সার বাঁধা আলমারির মাঝের সরু পথে ইতস্তত হাঁটতে থাকা লোকটা মনে হয় না অন্ধকারকে পরোয়া করছেন।

আলো জ্বেলে লোকটিকে বইয়ের চওড়া এক আলমারির সামনে আবিষ্কার করলেন।

একটার পর একটা বই টেনে বের করে কী যেন দেখছেন

এদিকে তাঁর এই আচরণে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে জোন্সের।

মানুষটা নিশ্চয় কানে শোনেন না। তাই আবার ডাক দেয়ার বদলে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালেন কাঁধে টোকা দেয়ার জন্য।

আর ঠিক সে মুহূর্তে জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক বুঝলেন, এতক্ষণ এক প্রেতাত্মার পিছনে ঘুরঘুর করেছেন তিনি।

খুদে লোকটার হাতের বই মেঝেতে পড়ল সশব্দে। আর জোন্স বুঝলেন, মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন খুদে মানুষটা!

তারপর থেকে ওই ভূত এমন আচরণ করতে লাগল, যেন প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে তাকে সাক্ষাৎ দিতেই হবে জাদুঘরে।

www.blogye.com

মাসের প্রতি চতুর্থ রবিবার নিয়ম করে তার উপস্থিতি জানান দিতে লাগল সে।

সবসময়ই ঘড়ি ধরে সাতটা চল্লিশে।

ছোটখাট লোকটাকে নিয়ে প্রথম অভিজ্ঞতর চার সপ্তাহ পর জর্জ জোন্স আবারও দেখলেন ওটাকে। এবারও এক ধর্মীয় সভার পরে। তবে এবার কোনও আলাভোলা অধ্যাপক কিংবা মিস্টার উইলমটের সঙ্গে দেখা করতে আসা আগন্তুক ভাবলেন না।

উইলমটের অফিস থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে সোজা লাইব্রেরিতে ঢুকলেন লোকটা। যদিও বন্ধ ছিল লাইব্রেরির কাঠের দরজা!

পরের মাসে, ঠিক চার সপ্তাহ পরে, এক সভা শেষে এক বন্ধুসহ লাইব্রেরিতে ঢুকলেন জোন্স। উদ্দেশ্য, আবার ভূতটার দেখা পাওয়া।

আলমারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পৃষ্ঠা ওল্টাবার আওয়াজ পেলেন দুজনেই। তারপরই মেঝেতে ধুপ করে পড়ল একটা ভারী বই। শব্দ খেয়াল করে লাইব্রেরির মাঝে সরু এক করিডোরে এসে মেঝেতে-একটা বই পড়ে থাকতে দেখলেন দুজনে।

ওটার পৃষ্ঠা তখনও নড়ছে।

বইটা তুলে নিয়ে নাম দেখলেন জোন্স।

ওটার নাম, 'এন্টিকুইটিয অ্যাণ্ড কিউরিওসিটিয অব দ্য চার্চ'।

আগেরবারও এই বই ফেলেছিল ভূত।

আশ্চর্য এ ঘটনায় নিজের মানসিক স্থিরতা নিয়ে সন্দেহ হতে লাগল জর্জ জোন্সের।

চার রবিবার পরের ঘটনা।

ঘড়ির কাঁটা নির্দেশ করছে সাতটা চল্লিশ।

এবার জোন্স ভূত, প্রেতাত্মা কিংবা যাই হোক, তার জন্য পুরো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। বলা চলে ছোটখাট এক দল নিয়ে হাজির হয়েছেন।

www.blogye.com

ইয়র্কশীয়ারের জাদুঘর।

দেখা যাক, বাছাধন এবার যায় কোথায়, ভাবলেন জোন্স।

'তাঁর দলে আছেন দুই বন্ধু চিকিৎসক, ভাই, এক সাংবাদিক ও এক আইনজীবী। তাঁর সঙ্গে অনাহূত অতিথির উপর নজর রাখতে রাজি হয়েছেন সবাই। জোন্স যা দেখেছেন তাঁরাও যদি তাই দেখেন, তো কেউ আর তাঁকে উন্মাদ ভাববেন না। এতে জোন্সের নিজের আত্মবিশ্বাসও ফিরে আসবে।

জাদুঘরের লাইব্রেরিতে সময়মত জড়ো হলেন সবাই। তবে ভূতটা হাজির হওয়ার সময় হবার আগেই আলমারি ও বইটা ভালভাবে পরীক্ষা করেছেন সবাই। পাছে জোন্স কোনও কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকেন, এই সন্দেহে।

এবার সবাই লাইব্রেরির বিভিন্ন অংশে আত্মগোপন করে রহস্যময় আগন্তুক কিংবা প্রেতাত্মার জন্য অপেক্ষা করতে

www.blogye.com

লাগলেন।

আলমারির শেষপ্রান্তে লুকিয়ে আছেন জর্জ জোন্সের ভাই জেমস। ঘড়ির দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকালেন তিনি।

ভূত-প্রেত, অশরীরী এসবে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই জেমসের। এমন কী ভাইয়ের বলা খুদে ভদ্রলোকের গল্পটাও মেনে নিতে পারেননি তিনি। অন্যদের সঙ্গে আজ এখানে হাজির হয়েছেন ভূত যে আছে শুধু জোন্সের কল্পনাতে, তা প্রমাণ করতে। আশা করছেন, প্রমাণ করতে খুব একটা সময় লাগবে না।

কামরা নীরব। কেবল উপস্থিত সবার হাতঘড়ির টিক-টিক শব্দ। নিস্তব্ধতার ভিতর ওই শব্দ জোরালো লাগছে।

ইতিমধ্যে সাতটা চল্লিশের বেশি বেজেছে, কিন্তু কোনও ভূত বা রহস্যময় আগন্তুক দেখা দেয়নি।

পণ্ডশ্রম করছেন, এ বিষয়ে আরও নিশ্চিত হলেন জেমস। আর তখনই নড়তে শুরু করল একটা বই।

জেমসের চোখ আটকে গেল আলমারি উপর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

আপনা আপনি আলমারিতে নিজ জায়গা থেকে নড়তে শুরু করেছে একটা বই। খোপ থেকে বেরুতে শুরু করেছে। একটু একটু করে বেরিয়ে একেবারে কিনারে চলে এল কয়েক মুহূর্ত ঝুলে রইল, তারপর ধুপ করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বই যেখানে পড়েছে, সেদিকে দৌড়ে গেলেন জেমস।

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল লাইব্রেরির সব বাতি।

মস্ত ঘরে অপরিচিত কেউ নেই।

সবাই এসে থামল জেমসের পাশে।

মেঝের উপর পড়ে আছে একটা বই।

এখনও কাঁপছে ওটার পৃষ্ঠাগুলো।

ওটা সে বই, যেটা আগে আরও দু'বার পড়েছে ভূতের হাত

www.blogye.com

থেকে!

আগেই সবাই সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করেছেন, কোনও সুতো কিংবা দড়ি দিয়ে বই বাঁধা আছে কি না, তা নিশ্চিত হয়েছেন।

গোটা বুক শেলফ পরীক্ষা করলেন চিকিৎসক ভদ্রলোক। কিন্তু আলমারি কিংবা বই কোনওটার ভিতর এমন কিছু পাওয়া গেল না, যা থেকে মনে হতে পারে কোনও ছল-চাতুরি করা হয়েছে। আর যখন বইটা পড়ে তখন কামরায় উপস্থিত কেউ ওটার পাঁচ ফুটের ভিতর ছিলেন না।

জর্জ জোন্স স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন। যাক, অবশেষে তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন, এটা তাঁর মনের ভুল কিংবা কল্পনা নয়।

জোন্সের ভাই একদৃষ্টিতে, নির্বাক চেয়ে আছেন আলমারির দিকে।

ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে জোন্স মৃদু স্বরে বললেন, 'আশা করা যায় এখন একজন আমাকে বিশ্বাস করবে।'

ভূত কিংবা রহস্যময় আগন্তুক আর কখনও লাইব্রেরিতে আসেনি।

চার রবিবার পরে অসুস্থ থাকায় জোন্সের পক্ষে জাদুঘরে আসা সম্ভব হলো না। মিস্টার উইলমট কথা দিলেন, জোন্সের অনুপস্থিতে তিনি লাইব্রেরির উপর নজর রাখবেন।

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

পরের মাসে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ একটি তদন্তকারী দল লাইব্রেরিতে ঢুকবার অনুমতি পেল।

নির্দিষ্ট রবিবার জোন্স ও তাঁর ভাইসহ লাইব্রেরিতে ওঁৎ পেতে রইলেন তাঁরা।

কিন্তু এবারও কিছু ঘটল না।

এমন কী অস্বাভাবিক কোনও বিষয় নজর কাড়ল না তদন্তকারী দলটির সদস্যদের।

তবে ইতিমধ্যে বেশ নাম কামিয়ে ফেলেছে ভূতটা।

www.blogye.com

প্রতি চতুর্থ রবিবার সন্ধ্যায় প্রচুর লোক সমাগম হতে লাগল জাদুঘরের চারপাশে। আবারও রহস্যময় সে ভদ্রলোককে দেখা গেছে, এ সংবাদের আশায় কান খাড়া করে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করল সবাই।

কিন্তু আর কখনোই হাজির হলো না জাদুঘরের ভূত।

হয়তো এত জনসমাগম তাকে ঘাবড়ে দিয়ে থাকবে।

কিংবা যে জিনিসটা হন্যে হয়ে খুঁজছিল, তা সে পেয়ে গেছে।

আর সে অদৃশ্য হওয়ায় আবারও স্বাভাবিক হয়ে গেল জোন্সের জীবন। যতদিন বেঁচেছিলেন, ১৯৫৩ সালের সে কয়েকটি মাসের কথা কখনও মন থেকে দূর করতে পারেননি তিনি। তখন তাঁর সমস্ত ভাবনা-চিন্তা জুড়ে ছিল পুরনো ফ্যাশনের পোশাক পরা সেই ছোটখাট গড়নের ভদ্রলোক।

ক্লান্তিহীনভাবে লাইব্রেরির আলমারিতে কিছু খুঁজে যেত ইয়র্কশায়ার জাদুঘরের সেই ভূত।

ঘটনাটি শুধু ইংল্যাণ্ডে নয় গোটা ইউরোপে আলোড়ন তোলে।

অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে কাজ করেন এমন পণ্ডিতরা পুরো বিষয়টা আগাগোড়া তদন্ত করেন।

এমন কী সেসময়ের সংবাদপত্রগুলো ওই ভূতের রহস্য সমাধানে উঠে পড়ে লাগে।

গবেষকদের কারও কারও ধারণা, যখন ভূতটাকে দেখেন তখন হ্যালুসিনেশন কিংবা ঘোরের মধ্যে ছিলেন জর্জ জোন্স। আর কোনও কৌশল খাটাবার প্রমাণ পাওয়া না গেলেও নিজের বক্তব্য সত্যি প্রমাণ করবার জন্য হয়তো বা সূক্ষ্ম কোনও সুতো ব্যবহার করে বইটাকে টেনে নীচে ফেলেছেন জোন্স।

তবে তাঁদের এ ধারণা কখনও জর্জ জোন্সের বলা কাহিনির উপর প্রভাব ফেলেনি।

সবসময় স্বাভাবিক কণ্ঠে একই বর্ণনা দিয়েছেন তিনি।

আর বইটা আলমারি থেকে পড়বার সময় অন্য যাঁরা উপস্থিত

www.blogye.com

ছিলেন, তাঁরাও সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন— তাঁদের বিশ্বাস সে রাতে অতিপ্রাকৃত কিছু দেখেছেন তাঁরা।

অদৃশ্য হাত

এবারের ঘটনাটি আয়ারল্যাণ্ডের এক নারীর। এক বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ওই অভিজ্ঞতাটি হয় তাঁর।

তাঁর জবানবন্দি তুলে ধরছি:

'বাড়তি কথা বাদ দিয়ে সরাসরি মূল কাহিনিতে চলে যাচ্ছি।

'আমি আর আমার বান্ধবী উপর তলায় উঠছি। ও আমার কয়েক ধাপ সামনে। সবচেয়ে উপরের ধাপে পৌঁছেছি, মনে হলো কিছু একটা হঠাৎ করে সিঁড়ির বামপাশের খালি কামরা থেকে পিছলে আমার পিছনে চলে গেল। ভাবলাম, এটা আমার কল্পনা। কারণ বিধবা এক মহিলা আর তার চাকর ছাড়া কেউ থাকে না এই বাড়িতে। আর তারা থাকে অন্য পাশের কামরায়। আমার বান্ধবীকে কিছু বললাম না, ও ডানপাশের এক কামরার দিকে ঘুরে হাঁটা দিয়েছে। অস্বস্তি নিয়েই আমার কামরাটায় ঢুকে পড়লাম। ওটা সিঁড়ির মুখোমুখি। মনে হলো যেন লম্বা এক কাঠামো আমার উপর ঝুঁকে আছে। গ্যাস বাতি জ্বালতে যাব, এমনসময় আমার বাহু জোরে আঁকড়ে ধরল শক্তিশালী এক হাত। এ অবস্থাতেই টের পেলাম, ওই হাতে মধ্যমা নেই।

'গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, চিৎকার শুনে দৌড়ে এল আমার বান্ধবী, বিধবা মহিলা ও ভৃত্য মেয়েটি।

'ঘটনাটা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল সবার চেহারা।

'পুরো বাড়ি ভালমত তল্লাশি হলো, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল

www.blogye.com

না।

'এরপর কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল।

'ভয়াবহ ওই অভিজ্ঞতার স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছে। তারপরই এক বিকালে বাড়িতে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করবার সময় আবারও বিষয়টা তুললাম।

'এসময়ই এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, আমি কী বিধবা মহিলার মৃত স্বামীর বিষয়ে কোনও বর্ণনা শুনেছি কি না, কিংবা তাঁর কোনও ছবি দেখেছি কি না।

'স্বাভাবিক ভাবেই আমার উত্তর নেতিবাচক হলো।

'তারপরই আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি বললেন, "সে বেশ লম্বা, একটু কুঁজো, আর এক হাতের মধ্যমা নেই।"

'অবাক হয়ে ভৃত্য মেয়েটির দিকে চাইলাম। ছোটবেলা থেকেই ওই পরিবারে আছে সে।

'মেয়েটা ভদ্রলোকের কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল, আমি যে কামরায় আছি, একরাতে সে ওই কামরায় শুয়েছিল। এ সময় কেউ হাঁটুর নীচে জোরে চাপ দেয়ায় ঘুম ভেঙে যায় ওর। চোখ মেলতেই দেখে তার মৃত মালিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে জ্ঞান হারায় সে। এরপর থেকে আর কখনও আঁধার নামার পর ওই কামরায় ঢুকবার সাহস করেনি।

'তবে মন্দ কপাল ওই কামরায় আমাকে থাকতে হলো সে রাতে। কারণ ওদিন বাড়ি ভর্তি বন্ধু-বান্ধব ও মেহমান, অন্য কোনও কামরা খালি ছিল না।

'তবে এরই ভিতর ভয়টা কাটিয়ে উঠেছি আমি।

'তাই ওই কামরায় থাকতে আপত্তি করলাম না। তা ছাড়া, এখানে বেশ কয়েক রাত কাটিয়েছি। কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি।

'ঘরের দরজা খোলাই রাখলাম। তারপর বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। দু চোখের পাতা লেগে আসতেও সময় লাগল না।

www.blogye.com

'ভোর হয়নি তখনও, তবে হতে বেশি বাকি নেই, এমনসময় অস্বাভাবিক এক অস্বস্তি নিয়ে চটে গেল ঘুম। কেন এমন হলো বুঝলাম না। চোখ বড় বড় করে ছাদের দিকে চেয়ে রইলাম।

'আমার ডান হাত বিছানা থেকে নীচে ঝুলছে। ঠিক তখনই ভয়াবহ আতংক নিয়ে আবিষ্কার করলাম, অদৃশ্য এক হাত আমার ডানহাত চেপে ধরেছে, আর ওই লোকের মধ্যমা নেই!

'হাতটা বরফশীতল আর আশ্চর্যরকম শক্ত।

'হঠাৎ করেই যেন রাজ্যের সাহস জড় হলো আমার বুকে। ঠিক করলাম, এর শেষ দেখে ছাড়ব। বামহাত বাড়িয়ে দিয়ে স্পর্শ করলাম ভুতুড়ে হাত। এবার আমার আঙুলগুলো উঠতে লাগল ওই হাতের উপরের দিকে। এভাবে কনুই পর্যন্ত পৌঁছবার পর আর কিছুই পেলাম না। মনে হলো ওটা ওখানেই শেষ। কিন্তু নীচের অংশ আগের মতই আছে। এরপর আর সাহস ধরে রাখতে পারলাম না, ছেড়ে দিলাম হাতটা। মাথার উপর বালিশ চেপে পুরো ঘটনা ভুলে যেতে চাইলাম। কিন্তু ভয়াবহ এক আতংক চেপে ধরেছে আমাকে। তারপর কী হয়েছে বলতে পারব না। শুধু জানি, প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে উঠলাম ঘুম থেকে।

'সেরে উঠতে লাগল পাক্কা কয়েক সপ্তাহ। তবে ওই রহস্যময় ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা আর পাইনি।'

www.blogye.com

সীমানা পেরিয়ে

ধরুন, হঠাৎ আপনার সামনে হাজির হলো বহু আগে মারা যাওয়া কোনও মানুষ? জীবিতাবস্থায় যতই প্রিয় হোক, তাকে দেখে আপনার হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার জো হবে।

বেশিরভাগ সময় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের মৃত আত্মা দেখা দেয়। 'সীমানা পেরিয়ে'তে থাকছে এমনই সব ভৌতিক প্রত্যাবর্তনের কাহিনি।

ওপার থেকে

'হ্যালো, বাছা!'

ওই কণ্ঠ শুনে এবং জানালায় টোকা পড়বার শব্দে মনোযোগ নষ্ট হলো লেফটেন্যান্ট লারকিনের। বিস্মিত চোখে তাকাল, তারপর হেসে ফেলল।

ওই বান্দা আর কেউ নয়, তার রুমমেট ডেভিড ম্যাককনেল।

'তো আজ টেডকাস্টার চলেছ?' জানতে চাইল লারকিন।

'হ্যাঁ, তবে মানচিত্র নিতে ভুলে গিয়েছি,' এই বলে জানালা দিয়ে তার ডেস্কের উপর রাখা ভাঁজ করা মানচিত্র দেখাল। 'ওটা দাও তো!'

লেফটেন্যান্ট লারকিন জানালা দিয়ে মানচিত্র পাচার করল। তারপর দেখল হ্যাঙারের দিকে ছুটতে শুরু করেছে বন্ধু। আবারও পত্রিকা পড়ায় মন দিল সে।

দিনটা ১৯১৮ সালের ৭ ডিসেম্বর।

শেষ হয়েছে সর্বনাশা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

লেফটেন্যান্ট ম্যাককনেল ও লারকিন দুজনেই ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর পাইলট। ইংল্যাণ্ডের স্ক্যাম্পটনে তাদের ঘাঁটির বৈমানিকদের কোয়ার্টারে একই কামরা ভাগাভাগি করে দুজনে, তাই দারুণ দোস্তি।

ম্যাককনেলের এখনও শিক্ষানবিসকাল চলছে।

বয়স কেবল আঠারো।

ম্যাককনেলের আজকের কাজটা তেমন কঠিন নয়। একে রুটিন ওঅর্কই বলা চলে। সপউইথ ক্যামেল নামের এক আসনের

বিমানকে টেডকাস্টার এয়ার ফিল্ডে পৌঁছে দিতে হবে। বেশি নয়, কেবল ষাট মাইল দূরত্ব। অ্যাভ্র নামের দুই আসনের বড় একটি বিমান নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করবেন অন্য এক বৈমানিক। 'ক্যামেলকে' নিরাপদে বুঝিয়ে দেয়ার পর অপর বৈমানিকের সঙ্গে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরবে ম্যাককনেল।

এদিন সকালে স্ক্যাম্পটনের আকাশ বেশ ঝকঝকে, মেঘহীন।

ম্যাককনেল যাওয়ার আগে বন্ধুকে জানিয়ে গিয়েছে, বিকালে একসঙ্গে চা খাবে।

'কমাণ্ডার বলেছেন আমাদের নিজেদের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করা উচিত,' বলল লেফটেন্যাণ্ট ম্যাককনেল। অ্যাভ্রর বৈমানিকের দিকে চেয়ে ঝকঝকে হাসি উপহার দিয়ে আবারও চাইল শীতের ধূসর আকাশের দিকে। 'মনে হয় এখন রওনা হতে পারি আমরা।'

অ্যাভ্রর চালক মাথা ঝাঁকালেন। তারপর হেলমেট পরে দুজনে নিজেদের বিমানের দিকে চলল।

কিন্তু গোড়াতেই গোল বাধল।

হঠাৎই ধেয়ে আসা ভারী কুয়াশার কারণে বিমান উড়িয়ে আবারও মাটিতে অবতরণে বাধ্য হলো দুজনে। কিন্তু মাটিতে নামবার পর কুয়াশার চাদরকে খুব ভয়ঙ্কর মনে হলো না।

ঘাড়ে চাপা দায়িত্বটা শেষ করবার এবং স্ক্যাম্পটনে ফিরে বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে লেফটেন্যাণ্ট ম্যাককনেল।

কিন্তু আবার যখন বিমান নিয়ে আকাশে উড়ল, অস্বস্তি পেয়ে বসল ম্যাককনেলকে। এক একটা মাইল পেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও ঘন হয়ে উঠছে কুয়াশা।

উপায় না দেখে ম্যাককনেলের সঙ্গী বৈমানিক বড় বিমানটাকে নিয়ে আবারও অবতরণে বাধ্য হলেন, এবার একটা খোলা মাঠে।

নীচের খোলা মাঠ ঘিরে চক্কর দিচ্ছে লেফটেন্যাণ্ট

www.blogye.com

ম্যাককনেল, আর কী করবে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে। বাতাসের তোড়ের ভিতর ছোট্ট বিমানটাকে সোজা রাখতে গিয়ে ইতিমধ্যে হাতদুটো ব্যথা করছে তার। এদিকে কুয়াশা পাতলা হওয়ার লক্ষণ নেই।

টেডকাস্টারের বিমান ঘাঁটির দিকে অর্ধেক পথ ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে। এ অবস্থায় খোলা মাঠে বিমান নামানোর চেষ্টা করা আর এগিয়ে যাওয়া, দুটোই সমান বিপজ্জনক মনে হলো তার কাছে।

এদিকে মাটিতে অভ্রর বৈমানিক তাঁর ককপিট থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ম্যাককনেল বেশ নীচ দিয়ে বিমান উড়িয়ে নিয়ে দেখল তার সঙ্গী বৈমানিক সুস্থ আছেন।

এবার টেডকাস্টারের দিকে রওনা হয়ে গেল ম্যাককনেল।

আতংক নিয়ে কুয়াশার মধ্যে ছোট্ট বিমানটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলেন নীচের বৈমানিক।

'হ্যালো!'

চেয়ারে ঘুরে লারকিন দেখল বন্ধু ম্যাককনেল দরজার সামনে দাঁত বের করে হাসছে। ম্যাককনেলের পরনে এখনও বৈমানিকের পোশাক। তবে মাথার হেলমেটের জায়গায় শোভা পাচ্ছে বিমানবাহিনীর চিহ্ন আঁকা টুপি। ঘাঁটির আশপাশে থাকলে সবসময় ওই টুপি মাথায় থাকে ম্যাককনেলের। মনে হলো বেশ ফুর্তিতে আছে।

'হ্যালো!' হাতের বই বন্ধ করল লেফটেন্যান্ট লারকিন, 'চলে এলে?'

'হুঁ,' বলল ম্যাককনেল, 'ঠিকমতই ফিরেছি, চমৎকার ভ্রমণ হলো।'

ম্যাককনেল যাওয়ার জন্য ঘুরল। 'ঠিক আছে, চলি!' বলে দরজার সামনে থেকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। লারকিনের

www.blogye.com

দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল।

আবারও বই পড়ায় মনেযোগ দিল লারকিন।

রাতে লিংকলনের অ্যালবিয়ন হোটেলের ধূমপানের ঘরে বরাবরের মত ভিড় করলেন ঘাঁটির কর্মকর্তারা। তাঁদের হৈ-হল্লায় ভরে আছে ঘর।

লারকিন এক কোনার ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেল।

দুপুরের পরে কয়েকটা কথার পর থেকে ম্যাককনেলকে আর দেখেনি। অবাকই লাগছে লারকিনের। কোথায় গেল ছেলেটা। একটু দেরিতে আসা আরেক কর্মকর্তা জানালেন তাঁর আর ম্যাককলেনের একজায়গায় যেতে হতে পারে।

লারকিন আশা করল, হোটেলেই তাদের সঙ্গে দেখা হবে ম্যাককনেলের। হাতের পানীয় ওক কাঠের টেবিলে নামিয়ে রেখে বন্ধুর খোঁজে কামরার চারপাশে দৃষ্টি বোলাল লারকিন।

ফায়ারপ্লেসের কাছেই এক টেবিলে বসেছেন বিমানবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা। তাঁদের একজন গল্প বলছেন। অন্যদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে কথা বলছেন কর্মকর্তাটি।

কৌতূহলবশত তাঁদের দিকে ঝুঁকে কান খাড়া করল লারকিন।

তিনি ঠিক কী বলছেন বুঝতে পারল না লেফটেন্যান্ট, তবে কয়েকটি টুকরো টুকরো শব্দ কানে এল, 'ক্র্যাশ', 'টেডকাস্টার'।

অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল তাকে। তারপরই ভেসে এল, 'ম্যাককনেল' শব্দটা। আর অপেক্ষা করবার ধৈর্য হলো না লারকিনের। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে ওই টেবিলের দিকে হেঁটে গেল সে।

'দুঃখিত, আপনারা কি ডেভিড ম্যাককনেলের ব্যাপারে কিছু বলছিলেন?' জানতে চাইল লারকিন।

'হ্যাঁ, তোমার অনুমান ঠিক,' বলে বিষণ্নভাবে মাথা ঝাঁকালেন কর্মকর্তা, 'খুবই দুঃখজনক। ঘাঁটি ছাড়ার আগেও কথা হয়েছে

www.blogye.com

আমাদের। বেচারা দুর্ভাগা ম্যাককনেল!'

'আপনি কি বলছেন?' কণ্ঠের বিস্মিতভাব লুকাতে পারল না লারকিন, 'আজ দুপুরের পরে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। বেশ হাসি-খুশি ছিল, খোশ মেজাজে ছিল।'

এবার টেবিলে বসা অন্যদের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কর্মকর্তা, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আজ দুপুরের পরে ম্যাককনেলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি। তা সম্ভব নয়। কুয়াশার ভিতর নিজের বিমানটাকে টেডকাস্টারে নামানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছিল সে। এসময়ই রানওয়েতে বিধ্বস্ত হয় বিমান।' এবার লেফটেন্যান্ট লারকিনের দিকে চেয়ে বললেন, 'ডেভিড ম্যাককনেল আজ দুপুরের একটু পরে মারা গেছে।'

টুকরো টুকরো অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে পুরো ঘটনাটা উদ্ধার করতে পরদিন লেগে গেল লেফটেন্যান্ট লারকিনের।

কিন্তু তারপরও যা ঘটে গেছে, তা বিশ্বাস করতে বাধল তার।

গত সন্ধ্যায় শোনা ঘটনা যে সত্যি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

টেডকাস্টার বিমান ঘাঁটিতে যাবার পথে ক্র্যাশ করে ম্যাককনেলের বিমান। ওটা যখন রানওয়েতে আছড়ে পড়ে, প্রচণ্ড জোরে পাইলটের আসনের সামনে রাখা কামানের সঙ্গে বাড়ি খায় ম্যাককনেলের মাথা। উদ্ধারকারীরা বিধ্বস্ত বিমানের কাছে পৌঁছবার আগেই পৃথিবীর মায়া কাটায় সে।

লেফটেন্যান্ট লারকিনের জানা আছে ঠিক কোন্ সময় তার বন্ধু, রুমমেটের সঙ্গে শেষ দেখা হয়।

দুপুর ৩টা ২০ থেকে ৩টা ৩০-এর মাঝামাঝি সময়ে।

আর এটাই ঘটনাটিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

টেডকাস্টার বিমান ঘাঁটির ধারে প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার সময় ম্যাককনেলের হাতে একটা ঘড়ি ছিল। প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘড়ি ভেঙে যায়। অর্থাৎ ম্যাককনেলের মৃত্যুর সময় ঘড়ির কাঁটা থেমে যায়।

www.blogye.com

ওটা থেমে গিয়েছিল ৩টা ২৫ মিনিটে।

যতদিন বেঁচেছিল ওই দুপুরের কথা কখনও ভুলতে পারেনি লেফটেন্যান্ট লারকিন। কোনও সন্দেহ নেই সেসময় ও জেগে ছিল। আর এটাও জানে, ওর ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি আর কেউ নয়, তার বন্ধু ও রুমমেট ম্যাককনেল!

সম্ভবত তরুণ বৈমানিক বন্ধুকে বিদায় জানাতে এসেছিল।

হয়তো বা জানতই না যে তার বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে।

তবে ডেভিড ম্যাককনেল যে অভিযান শেষে মেসে ফিরেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই, হোক তা কয়েক মুহূর্তের জন্য।

মৃত্যুর ওপার থেকে বন্ধুর টানে ফিরতে হয়েছিল তাকে।

এ ধরনের ঘটনাকে বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'ডেথ কো-ইনসিডেন্স' বা 'মৃত্যু কাকতালীয় ঘটনা'।

কোনও মানুষ মৃত্যুর মুহূর্তে পরিবারের কারও সঙ্গে কিংবা ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দূরের কোথাও থেকে এলে মৃত্যু কাকতালীয় ঘটনা ছাড়া তাকে আর কী-ই বা বলা যায়?

পুরো ঘটনাটি বিস্তারিত জানিয়ে ম্যাককনেলের বাবাকে একটি চিঠি লেখে লেফটেন্যান্ট লারকিন।

পরে প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন এমন এক নামী ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ ঘটনাটি তদন্ত করেন। মৃত্যুর সময় একইসঙ্গে দু-জায়গায় হাজির হওয়ার সেরা উদাহরণগুলোর একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় ম্যাককনেলের এ ঘটনাকে।

www.blogye.com

মোমবাতি পুড়ছে

এ অভিজ্ঞতা এক ভারতীয় তরুণের। তার মুখ থেকেই শোনা যাক:

'তখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ছুটির সময় কেরালা গেলাম সেবার। আমার বাবা, সৎ-মা ও ছোট বোন ছিল আবুধাবি। বাবা আমার সৎ-মার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছিলেন, ছুটির প্রথম সপ্তাহ আমি তাঁদের বাড়িতে থাকব। তাঁরা থাকতেন কেরালার থেক্কাদির কাছাকাছি এক জায়গা, বান্দিপারিয়ারে।

'বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এলাচ, চা ও কফির বাগান তাঁদের। বিশাল এস্টেটের মাঝে বাড়ি। পাকদণ্ডী রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের উপরে বাড়িটার দিকে।

'জায়গা হিসাবে বান্দিপারিয়ার তুলনা হয় না। সৎ-মার সবচেয়ে ছোট ভাইটি বয়সে আমার চেয়ে খুব একটা বড় নয়। তাঁর সঙ্গে থেক্কাদি সংরক্ষিত বনে ঘুরে বেড়ালাম। আর ইচ্ছামত মাছ ধরলাম এস্টেটের ছোট্ট ঝোরাতে।

এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল দেখতে দেখতে।

'এক সন্ধ্যার ঘটনা।

'শোবার ঘরে শুয়ে উপন্যাস পড়ছি, এ সময় মোমবাতি পুড়বার গন্ধ এসে লাগল নাকে। শুরুতে বেশ হালকা থাকল গন্ধটা কিন্তু ক্রমে এতই তীব্র হয়ে উঠল যে, কামরায় আর থাকা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে।

'সামনের বারান্দায় চলে এলাম দরজা খুলে। তখনই আশ্চর্য এক বিষয় নজরে এল। কুয়াশার মত সাদা ধোঁয়ার একটা চাদর ভেসে ভেসে বাড়িতে ঢুকছে। কেরালার পার্বত্য এলাকায় এস্টেট। ওখানে কুয়াশার দেখা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। ধরে নিলাম এমন কুয়াশা আসতেই পারে, যদিও খুব ঠাণ্ডা পড়েনি।

'আবার ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মোমবাতি পোড়ার তীব্র গন্ধে ভিতরে ঢোকা গেল না।

'উপায় না দেখে নানীর কাছে চলে এলাম। ছোট মেয়ে আর ছেলের সঙ্গে বসে ছিলেন তিনি।

'আমার অভিজ্ঞতার কথা জানালাম তাঁদের। তাঁরা খুব অবাক হয়েছেন বলে মনে হলো না, বরং মাথা দোলালেন।

'নানী বললেন, প্রতিবছর এ দিনে এমন ঘটে। আর আজ হলো আমার সৎ-মার দাদার মৃত্যুবার্ষিকী। যে ঘরে শুয়েছিলাম, সেখানে মারা যাওয়ার পর তাঁর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল। প্রচুর মোমবাতি জ্বলেছিল সেদিন।

'বুঝে উঠতে পারলাম না বিশ্বাস করা উচিত হবে কি না। তবে ওই ঘরে যে এর পর আর থাকতে পারব না, তাতে সন্দেহ নেই। সমস্যার কথা বলতেই আমার জন্য আরামদায়ক আরেকটি কামরার ব্যবস্থা হলো। তবে ঘটনা এখানেই শেষ হলো না।

'আমার সৎ-মার দাদীও ওই বাড়িতে থাকেন। অনেক বয়স তাঁর, এক শ' ছুঁই-ছুঁই করছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। আমার সৎ-মার ছোট বোন তাঁর দেখাশোনা করেন। কখনও কখনও তাঁকে দেখে আসতাম আমি।

'একদিন তাঁর কামরার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি। ওই ঘরের দরজা সবসময় খোলাই থাকে। এ সময়ই কামরা থেকে মোমবাতি পুড়বার গন্ধ ভেসে এল আমার নাকে। কৌতূহলী হয়ে ভিতরে ঢুকে দেখলাম বৃদ্ধা মহিলা ঘুমাচ্ছেন। কামরার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরব, এমনসময় একটা কথা মনে হলো। এই

www.blogye.com

গন্ধের সঙ্গে তো বৃদ্ধার স্বামী অর্থাৎ আমার সৎ-মার দাদার একটা সম্পর্ক আছে। আর এটা মনে হতেই থেমে গেলাম, তারপর বুড়ি মহিলার কপালে হাত রাখলাম। কেন এটা করলাম, বলতে পারব না। সম্ভবত আমার মনের ভিতর থেকে কেউ বলছিল, তিনি জীবিত নাকি মৃত তা পরীক্ষা করো।

'তাঁর শরীর বেশ ঠাণ্ডা মনে হলো। আর শীতল থাকে মৃত মানুষের শরীর, জানা আছে আমার।

'এদিকে প্রচণ্ড গন্ধে ঘরে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ানো যাচ্ছে না।

'দৌড়ে গিয়ে বাড়ির অন্যদের খবরটা দিলাম।

'তাঁরা এসে নিশ্চিত হলেন বুড়ো মহিলা আসলেই মারা গেছেন।

'গির্জার গোরস্থানে পারিবারিক সমাধিতে তাঁর মৃতদেহ রাখা পর্যন্ত সে বাড়িতেই থাকলাম আমি। তারপর কেরালার অন্যান্য এলাকা ঘুরে দেখতে ওই বাড়ি ছাড়লাম।

'গোটা বিষয়টি এখনও ভাবায় আমাকে। সৎ মা-র দাদার আত্মা মারা যাওয়ার পরও বাড়ির মায়া কাটাননি। প্রতিবছর নির্দিষ্ট দিনে নিজের উপস্থিতি জানান দেন। হয়তো বা আবারও তিনি এসেছিলেন, তাঁর স্ত্রীকে অন্য কোনও জগতে অভ্যর্থনা জানাতে।

'নাকি পুরোটাই আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা?'

হিথরোর আতংক

লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে অনেক অদ্ভুতুড়ে ঘটনাই ঘটে, আর এর শুরু ১৯৪৮ সালে। সেসময় একটা ডিসি-৩ বিমানে আগুন লেগে গেলে, জরুরি অবতরণের সময় বিধ্বস্ত হয় ওটি।

www.blogye.com

ওই দুর্ঘটনায় ২২জন যাত্রী ও উড়োজাহাজের চার কর্মী মারা যান। তারপর থেকেই তিনটি ভূত বিমানবন্দরে পাকাপোক্ত আসন গাড়ে।

বিমানবালা, বিমানবন্দরের কর্মী, এমন কী যাত্রীদেরকে যখন-তখন ভয় দেখানো অভ্যাসে পরিণত হয় এদের।

তবে আশ্চর্য ঘটনা হলো, ভয় দেখানোর জন্য সাধারণত নারীদেরই বেছে নেয় এরা।

দক্ষিণ-আফ্রিকা সেনাবাহিনীর এক চিকিৎসক হিথরো বিমানবন্দরে নামেন ১৯৭৮ সালের ১৫ জানুয়ারি। হাত-মুখ ধোয়ার জন্য ভিআইপি লাউঞ্জের বাথরুমের দিকে রওনা হন তিনি। লাউঞ্জের সোফায় যেই না বসলেন, মনে হলো কারও কোলে বসেছেন। বিস্মিত হয়ে চারপাশে তাকাতে লাগলেন, কিন্তু সোফায় আর কাউকে দেখতে পেলেন না।

আরেকবার লণ্ডনে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন বিখ্যাত এক আমেরিকান অভিনেত্রী। ১৯৮০ সালের ২৭ মার্চ হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। রানওয়ে-১ থেকে যখন মূল টার্মিনাল ভবনের দিকে যাচ্ছেন, কে যেন তাঁর কব্জিতে জোরে চিমটি কেটে দিল। অথচ দুই হাতের মধ্যে কোনও মানুষ নেই। কব্জিতে জোর ওই চিমটির দাগ ছিল বেশ ক'দিন

এদিকে বিমানবন্দরের অনেক কর্মচারী, বিশেষত নারী কর্মচারীরা বলেছেন, মূল ভবনের তিন নম্বর লিফটে একটা ভূত আছে। সে সব সময়ই ঝামেলা পাকায়। মহিলাদের কেউ কেউ দাবী করেছেন, ওটা বেহায়ার মত উত্ত্যক্ত করে তাঁদেরকে।

এবার বলা যাক আমেরিকান প্যান অ্যাম এয়ারলাইন্সের সুন্দরী সেই এয়ারহোস্টেসের কাহিনি।

১৯৮১ সালে ফ্লাইট শেষে বিশ্রামাগারের দিকে যাচ্ছিল তরুণীটি। এ সময় মনে হলো কেউ অনুসরণ করছে তাকে। যখন মুখ ঘুরিয়ে চাইল সে, কাউকে দেখতে পেল না। আতংকিত হয়ে

www.blogye.com

ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের দিকে দৌড় দিল মেয়েটি। পুরো সময় মনে হলো কেউ তার পিছন পিছন ছুটছে। গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা এক দম্পতিকে তার অভিজ্ঞতা বলল বিমানবালা।

তখন তাঁদের একজন জানালেন, 'এ ধরনের ঘটনা আমাদের বেলায়ও ঘটেছে। তাই এ জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছি।'

এ সময় ভয়ে কেঁপে উঠল বিমানবালা। মনে হলো কেউ তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। অন্য যাত্রীরাও তাঁদের কাছেই কারও জোরে শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনেছেন, যদিও সেখানে দৃশ্যমান কেউ ছিল না!

একসময় হিথরো বিমানবন্দরে এমন ঘটনা খুব সাধারণ ছিল। স্বাভাবিক কোনও ব্যাখ্যা বের করা সম্ভব হয়নি। বলা হয়, হিথরো বিমানবন্দরের ওই দুর্ঘটনার পর থেকেই এসবের শুরু।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, দুর্ঘটনায় যে ২২জন মানুষ মারা যান, তাঁদের সবাই ছিলেন ব্যবসায়ী।

আর ভুতুড়ে কাহিনির শুরু দুর্ঘটনার দিন থেকেই।

উদ্ধারকর্মী ও বিমানবন্দরের কর্মীরা তখন বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে মৃত ও আহত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে সরিয়ে আনছেন। তখনই তাঁদের নজরে পড়ল ছ'ফুট লম্বা এক ব্যবসায়ী কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটা এখানে কী ভাবে এলেন বুঝে উঠতে পারলেন না তাঁরা। ভদ্রলোককে খুব চিন্তিত ও বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। বারবার বলছিলেন, 'আমার ব্রিফকেসটা যদি পেয়ে থাকো, দয়া করে জানাও। ওটায় অনেক দরকারী কাগজ-পত্র আর দলিল আছে।'

তবে তখন সবাই উদ্ধার কাজে এতই ব্যস্ত, সে লোককে গুরুত্ব দিলেন না। এমন কী কখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তাও বলতে পারবেন না।

কিন্তু আধঘণ্টা পর আবর্জনার স্তূপ থেকে খুব খারাপভাবে পুড়ে যাওয়া ও ক্ষত-বিক্ষত একটি শরীর বের করে আনলেন

www.blogye.com

উদ্ধারকর্মীরা। ভালভাবে খেয়াল করতেই তাঁদের মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেল। এ সেই লোকের দেহ, কিছুক্ষণ আগেই পাশে এসে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রভাবে ব্রিফকেসের খোঁজ করছিল।

অনুসন্ধান বাদ দিয়ে ভীষণ ভয়ে দৌড় লাগালেন সবাই।

পনেরো বছর ধরে প্রায় প্রতিদিনই বিমানবন্দরের কোনও না কোনও জায়গায় কাউকে না কাউকে দেখা দিয়েছে ভৌতিক ওই দীর্ঘদেহী আগন্তুক। তারপর থেকে কেবল বছরে একদিন মার্চের দুই তারিখ ২ নম্বর রানওয়েতে দেখা যেত তাকে। বিমানবন্দরে নতুন যোগ দেয়া কর্মীরা ভূতটাকে হঠাৎ হাজির হয়ে, 'আমার ব্রিফকেসটা যদি পেয়ে থাকো, দয় করে জানাও। ওটায় অনেক দরকারী কাগজ-পত্র আর দলিল আছে,'এই অনুরোধ জানাতে দেখে রীতিমত আতংকিত হয়ে পড়ত।

১৯৭০ সালের দিকে বিমানবন্দরে কাজ করা ডিক ট্রুপিনের প্রেতাত্মাও দারুণ বদনাম কুড়িয়েছিল হিথরো বিমানবন্দরের কর্মী ও যাত্রীদের মাঝে। হঠাৎই মারা যায় এই চাকুরে। কিন্তু তারপরই আবার দেখা দিতে শুরু করে। ট্রুপিনের ভূত বিরক্ত করত কেবল মহিলাদেরকে। যাঁরা তাকে দেখেছেন, তাঁদের দাবি: পরিশ্রান্ত কুকুরের মত হাঁপাত ট্রুপিনের ভূত। বিমানের ভিতরে ও বিমানবন্দরের খাবার বিভাগে ঢুকে বিমানবালা ও মহিলা কর্মীদের দারুণ উত্ত্যক্ত করত সে। একদিন তার এসব কীর্তিকলাপ দিয়ে এক নারী নিরাপত্তাকর্মীকে প্রায় মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দিয়েছিল ডিক ট্রুপিনের আত্মা।

এদিকে বিমানের তদারককারী প্রকৌশলীরা প্রায় দুটো ভূতের মুখোমুখি হতেন। কিন্তু ওগুলোর আচরণ মোটেই খারাপ নয়। কারও কোনও ক্ষতি করেছে এমন নজিরও নেই।

আরেক ভূতের স্বভাব আবার অদ্ভুত। ওটা কেবল হানা দেয় রাষ্ট্রদূত ও রাজনীতিকদের বহনকারী বিমানে। তাকে 'অসম্পূর্ণ' ভূত হিসাবেই পরিচয় করিয়ে দিতে পছন্দ করেন বিমানের

www.blogye.com

কর্মকর্তা ও বিমানবালারা। কারণ, কেবল তার পা জোড়া দেখা যায়। 'ধূসর ট্রাউযারের ভূত' নামেও কেউ কেউ ডাকেন ওকে।

এসব ভূতকে বিমানবন্দর ছাড়াতে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন কর্তৃপক্ষ। তবে এতে এই অতৃপ্ত আত্মাদের কিছু যায়-আসে বলে মনে হয় না। কারণ, তারা চলে তাদের মেজাজ মর্জি মতই।

কে জানে, হয়তো মৃত্যুর পর মায়া কাটাতে পারেনি হিথরোর!

সুড়ঙ্গের ভূত

এবারের ঘটনাটি বলেছেন মারফি নামের ভারতীয় এক তরুণ। শুনব তাঁর জবানে:

'এটা আমার নয়, বরং বাবার জীবনের কাহিনি।

'তখন তাঁর কিশোর বয়স। গ্রীষ্মের উষ্ণ একটি দিন। গরমে টিকতে না পেরে কয়েক বন্ধু মিলে পাহাড়ি জঙ্গলে গেলেন ক্যাম্পিং করতে। সেখানে গিয়ে তাঁবু খাটানোসহ রান্না-বান্নার কাজে লেগে পড়লেন তাঁরা। কিন্তু বাবাসহ চারজন ঠিক করলেন একটু ঘুরে-ফিরে দেখবেন জায়গাটা।

'বেশ কিছুটা সময় হাঁটতেই বনের মাঝে চলে এলেন। এসময় নজরে পড়ল একটা সুড়ঙ্গ। শেষ দেখা যাচ্ছে না ওখান থেকে।

'একজন একটু দ্বিধা করলেও অন্যদের কৌতূহল পেয়ে বসেছে ততক্ষণে। অতএব ভাবনা-চিন্তা না করেই সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লেন তাঁরা।

'ঘন গাছপালার কারণে এমনিতেই বনের এদিকে আলো খুব বেশি ছিল না। আর সুড়ঙ্গের ভিতরে বেশ ছায়া। কয়েক পা মাত্র

www.blogye.com

গিয়েছেন, এমনসময় পিছনে তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। তা এমনই ভীতিকর, রক্ত পানি হয়ে গেল তাঁদের। দেরি না করে পিছু ফিরলেন তাঁরা।

'সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ো এক লোক। তিনি কোথা থেকে এলেন ঠিক বুঝতে পারলেন না কেউই। আর তাঁর চেহারা যেন কেমন। মুখে আলাদা কিছু আছে, অশুভ কিছু।

'এখনও বাবার মনে রয়েছে ওই চেহারা। তাঁকে দেখে কেমন ভয় করতে লাগল বাবার। পরে শুনেছিলেন তাঁর বন্ধুদেরও একই অনুভূতি হয়েছিল। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। এসময় বুড়ো বলে উঠলেন। কেমন শিরশির অনুভূতি এনে দেয়া কণ্ঠ, যেন অনেক দূর থেকে আসছে।

' "সাবধান, সুড়ঙ্গের আরও সামনে যেয়ো না, বাছারা। একটা মৃতদেহ পড়ে আছে সুড়ঙ্গের শেষে। ওটা না দেখাই ভাল।'

'এই বলে মুখে তালা এঁটে দিলেন বুড়ো। তবে তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

'তাঁরা একবার ভাবলেন, আর সামনে না বেড়ে তাঁবুতে ফিরবেন। কিন্তু শেষমেষ কৌতূহলের জয় হলো। নিঃশ্বাস চেপে সামনে এগুতে লাগলেন সবাই। সুড়ঙ্গের শেষমাথায় পৌঁছে আঁৎকে উঠলেন, সত্যিই মেঝের উপর পড়ে আছে একটা লাশ।

'তবে কাছে গিয়ে আসল ধাক্কা খেলেন মৃতদেহের মুখ দেখে। ওটা ওই বুড়োর মৃতদেহ! তিনিই এগুতে মানা করেছিলেন!

'দেরি না করে যেখানে বুড়ো লোকটাকে রেখে গিয়েছিলেন, সেখানে ফিরে এলেন চারজন। কিন্তু বুড়ো সেখানে নেই। অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যে লম্বা সুড়ঙ্গ পেরিয়ে বুড়োর সরে পড়বার কোনও উপায় ছিল না।

'ওখানে আর এক মুহূর্ত থাকবার সাহস হলো না তাঁদের। রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন তাঁবুর দিকে।'

www.blogye.com

ভুতুড়ে ৯

এমন অনেক ঘটনা আছে যেগুলোকে কোনও অধ্যায়ের ভিতর ঠিক ফেলা যায় না। কিন্তু এসব কাহিনির কোনও কোনোটা এতই রোমাঞ্চকর ও অদ্ভুতুড়ে. এ সংকলনে লিপিবদ্ধ না করলে অন্যায় হবে।

এমন নয়টি কাহিনি নিয়ে 'ভুতুড়ে ৯'।

চোরাবালি

ইংল্যাণ্ডের উত্তর ডেভনের ওলাকম্বের সমুদ্র সৈকত ও বিস্তৃত সোনালী বালুকাবেলা কাছে টানে অনেককেই। এদের একজন মিস্টার টেইলর। এক ছুটিতে ফ্রেড নামের তাঁর স্প্যানিয়েল কুকুরকে নিয়ে চলে এলেন ওলাকম্বে। সাগর তটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দুজনে। পানি ভারি পছন্দ ফ্রেডের। সমুদ্র তীরের অগভীর পানিতে ইচ্ছামত দাপাদাপি করে দারুণ আনন্দ তার।

এখানে বেশ চমৎকার কাটতে লাগল ছুটির দিনগুলো।

গোলমাল বাধল একরাতে।

দিনের বড় একটা সময় সৈকতে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফিরবার পাঁয়তারা করছেন টেইলর। কিন্তু আজ যেন হঠাৎ করেই বেহায়া হয়ে উঠল কুকুরটা। কোনওভাবেই তাঁর সঙ্গে থাকছে না।

বারবার ফ্রেডকে ডেকে চলেছেন টেইলর। কিন্তু তাঁর ডাকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে সাগরের দিকে চলে যাচ্ছে জানোয়ারটা।

এদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

দৃষ্টিসীমায় আর কাউকে চোখে পড়ছে না।

দূরের গ্রামের বাতি যেন টেইলরকে রাতের খাবারের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

এ অবস্থায় কাঁহাতক কুকুরটার বেয়াদবি সহ্য করা যায়?

অদৃশ্য হওয়া ফ্রেডকে ডাকতে ডাকতে আলোর দিকে রওনা হলেন তিনি।

'ঠিক আছে, তুমি তোমার পথ বেছে নাও, আমি চললাম,' রাগে গজ গজ করতে করতে যেন নিজেকেই শোনালেন টেইলর। 'আমার সঙ্গে আসতে পারো, কিংবা থাকতেও পারো, তোমার যা মর্জি!'

উল্লাসিত ডাক ও পানি ছিটাবার শব্দ শুনে উত্তরটা বুঝে নিলেন টেইলর। ক্লান্ত শরীর টেনে নিয়ে চলঁলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর বেশ পেছন থেকে চিৎকার শুনলেন। 'তা হলে তোমাকে কাঁকড়া কামড়েছে, ঠিক না?' জোরে বললেন, 'কিন্তু আমার আর ফিরবার শক্তি নেই, বাছা! নিজের সমস্যা তোমাকে নিজেকেই সমাধান করতে হবে!'

হঠাৎ কোথা থেকে ঠাণ্ডা এক বাতাস এসে শরীর কাঁপিয়ে দিল টেইলরের। কষ্টে-সৃষ্টে এগিয়ে চললেন। আগে কখনও ওলাকম্বের বাতিগুলো এত দূরে মনে হয়নি।

আঁধারে হারিয়ে যাওয়া বালি-রাজ্যের যেন শেষ নেই।

চারপাশের নিস্তব্ধতায় ছেদ পড়ছে সাগরের তীরে আছড়ে পড়া ঢেউ ও তাঁর নিজের হালকা পদশব্দ।

সূর্য প্রায় অদৃশ্য হয়েছে, গোধূলীর আধো-আলো আধো আঁধারিতে কেমন ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

আশপাশে কয়েক মাইলের ভিতর আর কোনও জনমানুষ নেই। টেইলরের মনে হচ্ছে যেন তিনিই এই পৃথিবীর জীবিত শেষ মানুষ। আর এ ভাবতেই শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল তাঁর। শিস দিয়ে মনের সাহস ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন।

এমনসময় কুকুরটার কথা মনে পড়ল।

ওটা এখন কোথায়?

টেইলর জানোয়ারটার খোঁজে ঘাড় ফেরালেন।

'ওহ্,' খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'তা হলে খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?'

কারণ ফ্রেড চলে এসেছে, তাঁর কয়েক গজ পিছনে আসছে,

www.blogye.com

মাথা নিচু, কান জোড়া লেপ্টে আছে শরীরের সঙ্গে। বোঝা যাচ্ছে মালিকের মতই ক্লান্ত সে।

'ফ্রেড, এসো,' ডাকলেন টেইলর।

কিন্তু স্প্যানিয়েলের তরফ থেকে কোনও শব্দ এল না।

আঁধার ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে।

এদিকে বালুময় জমির উপর চাপা গোঙানি তুলে বয়ে যাচ্ছে দমকা হাওয়া। তারপরই রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন টেইলর, তাঁর সামনে কেউ আছে। সন্দেহ নেই ওলাকম্বের দিকেই চলেছে।

পিছন থেকে অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না, কিন্তু তাঁর মনে হলো, সাদা পোশাক পরা এক তরুণীর ছায়ামূর্তি।

বালুর উপর লঘু, চপল পায়ে গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে সে।

তরুণীর পরিচয় কী?

হঠাৎ কোথা থেকেই বা উদয় হলো?

টেইলর থেকে কেবল কয়েক গজ সামনে। নিঃসঙ্গ পথচারী হলে তাকে আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল তাঁর।

আরেকটু হলে মেয়েটিকে অতিক্রম করে চলে যেতেন তিনি।

সম্ভবত কোণাকুনি পথে পিছন থেকে এসে তাঁর সামনে চলে গেছে মেয়েটি।

হ্যাঁ, তাই হবে, ভাবলেন টেইলর।

অর্থাৎ এই বালির রাজ্য পেরিয়ে ওলাকম্বে পৌঁছবার আরও সংক্ষিপ্ত পথ জানা আছে রহস্যময় তরুণীর।

কাজেই তাকে অণুসরণ করলেন ক্লান্ত টেইলর।

দেখা যাক, সে হয়তো অনেক কম পরিশ্রমে গ্রামে পৌঁছে দেয়ার পথ দেখাবে।

কিন্তু তরুণীর মনে হয় টেইলরের উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। সে তার চলার গতি কমাচ্ছে না, এমন কী পিছুও ফিরছে না।

www.blogye.com

কিছু বলে কিংবা কিছু করে তরুণীর মনোযোগ পাওয়া যায় কি না, ভাবলেন টেইলর।

কিন্তু আগন্তুক দেখেও তাঁর কুকুর কেন চুপ মেরে রইল, তাও একটা কথা।

এমনিতে ফ্রেড খুবই বন্ধু বৎসল প্রাণী। শুভেচ্ছাসূচক ডাক অন্তত তার দেয়া উচিত ছিল।

মেয়েটিকে স্বাগত জানাল না কেন সে?

আসলে আমার মত ফ্রেডও খুব ক্লান্ত, তাই কোনওদিকে খেয়াল নেই ওর, ভাবলেন টেইলর।

তখনই খেয়াল করলেন তরুণী চকচকে, ভেজা বালুর এক এলাকার দিকে চলেছে। যেন ইতস্তত করল কোন্ পথ বেছে নেবে তা স্থির করতে গিয়ে। তারপর ওদিকে হেঁটে যেতে লাগল।

বালুর উপর তার পায়ের অগভীর ছাপ পড়তে দেখলেন টেইলর, অবশ্য সেসব সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যেতে লাগল।

ওই বালুর উপর চলতে যদি তার সমস্যা না হয়, তবে আমারও হবে না, এই ভেবে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শুকনো বালু থেকে ভিজা বালির ভিতর পা বাড়াতে গেলেন।

কিন্তু সেখানে পা রাখবার আগেই আচমকা পাজামায় খুব জোর টান টের পেলেন। এতই দ্রুত আর জোরালো টান, আরেকটু হলে তাল হারাতেন তিনি।

আরে, কুকুরটার হলো কী?

চরকির মত ঘুরলেন টেইলর।

'দুষ্টু ছেলে...' শুরু করলেন তিনি, 'তুমি কেন...' তারপরই থেমে গেলেন। মুখ হাঁ হয়ে রইল। তাঁর পায়ের কাছে কিংবা দৃষ্টিসীমায় কোনও কুকুর নেই। তিনি আছেন বালুর বেশ বড় এক চিলতে এলাকার কিনারায়। একপাশে সাগর, নিজের রহস্যময় সংগীত পরিবেশন করছে।

ফ্রেড যেন পৃথিবী থেকে জাদুমন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়েছে!

www.blogye.com

'ফ্রেড!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, তারপর জোরে শিস দিতে লাগলেন— বার বার।

কিন্তু সাগরের এক পাখির বিলাপ ধ্বনি ছাড়া আর কোনও জবাব মিলল না।

ফ্রেড কি তবে কোনওভাবে তাঁকে অতিক্রম করে গেছে?

সে কি তবে এখন সাদা পোশাকের তরুণীর সঙ্গে আছে?

সাদা পোশাক পরা ছায়ামূর্তিটিকে দেখবার আশায় ভিজা বালি এলাকার দিকে চাইলেন টেইলর। কিন্তু তরুণীর নাম নিশানা পেলেন না। মনে হচ্ছে যেন ফ্রেডের মত সে-ও অদৃশ্য হয়েছে।

টেইলর খেয়াল করতেই দেখলেন, ঠিক সামনের ভেজা, চকচকে বালির পর আবারও শুকনো, শক্ত বালু।

তরুণী নিশ্চয় দ্রুত ওই ভেজা বালি পেরিয়ে আবারও শুকনো বালিতে চলে গেছে।

কিন্তু সে কী ভাবে এত দ্রুত চলল?

একেবারে দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল?

আর ফ্রেডই বা কোথায়?

এমনি নানা প্রশ্নে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

কী করবেন স্থির করতে না পেরে এক মুহূর্ত স্থির রইলেন, তারপর কাঁধ ঝাঁকালেন। সন্দেহ নেই স্প্যানিয়েল চলে গেছে সরাইখানার দিকে।

এক পা আগে বাড়লেন টেইলর। তখনই মনে হল কে যেন তাঁর জুতো কামড়ে ধরেছে। পা ধরে টেনে তাঁকে সরিয়ে নিতে চাইছে কিছু।

চেঁচিয়ে উঠে ঝাড়া দিয়ে পা ছাড়িয়ে নিলেন। জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন। কী ঘটছে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছেন না। তারপর কী এক সন্দেহ হওয়ায় পকেট থেকে খালি সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। ওটাকে আলতো করে ছেড়ে দিলেন সামনের ভেজা বালুতে।

www.blogye.com

ভুতুড়ে নারীমূর্তির পিছু নিলেন টেইলর।

www.blogye.com

কয়েক সেকেণ্ডে অদৃশ্য হয়ে গেল জিনিসটা।

টনক নড়ল টেইলরের।

কোথায় পা দিচ্ছিলেন তিনি!

চোরাবালি!

ছদ্মবেশী বালুতে ভালমত একবার পা দিলে তাঁকে টেনে নিত ওটা। আর কখনোই ফাঁদ থেকে বেরুতে পারতেন না। তলিয়ে যেতেন, তাঁর আর অস্তিত্বই থাকত না।

কী ঘটছিল ভেবে ভয়ে কেঁপে উঠলেন।

তাঁর মনে পড়ে গেল সাদা পোশাকের তরুণীর কথা।

ওই ছলনাময়ী তাঁকে এই মৃত্যুফাঁদের কাছে টেনে এনেছে!

কিছুক্ষণের মধ্যে ধাক্কাটা সামলে নিলেন টেইলর। যদিও শরীরের কাঁপুনি থামেনি। সামনের এলাকার দিকে চাইলেন। খেয়াল করলেন ঘুরপথে শ খানেক গজ গেলে ভেজা বালুর ওপাশের নিরাপদ, শুকনো বালির এলাকায় পৌঁছবেন। তবে হাঁটা শুরু করবার আগে আরও একবার প্রিয় কুকুরটাকে ডাক দিলেন। যদিও মনে মনে ঠিকই জানেন, কোনও সাড়া পাবেন না।

ঘটলও তাই।

সরাইখানায় যখন পৌঁছলেন, ততক্ষণে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। তাঁর ফ্যাকাসে চেহারা ও কাঁপতে থাকা হাত দেখে সরাইমালিক মিসেস টুয়েইট বুঝে গেলেন, কোনও ঝামেলা হয়েছে।

কাজের মেয়েটার সহায়তায় বসবার ঘরের সোফায় বসিয়ে দিলেন টেইলরকে। তারপর মেয়েটাকে বললেন ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আসতে।

একটু পর ব্র্যাণ্ডি পান করে কিছুটা সুস্থির হলেন টেইলর।

এবার মিসেস টুয়েইট জানতে চাইলেন কী হয়েছে।

টেইলর যখন বলতে শুরু করলেন, রক্ত সরে গেল ভদ্রমহিলার চেহারা থেকে। ভয় পেয়েছেন তিনি। তাঁর চেহারার

www.blogye.com

পরিবর্তন খেয়াল করলেন টেইলর।

'তুমি মৃত্যু ডেকে আনা সাদা তরুণীকে দেখেছ,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বরে বললেন মিসেস টুয়েইট, 'আমার দাদী তার অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন আমাকে। এমন কী আমি যখন তরুণী ছিলাম, তখনও হঠাৎ তার উদয় হওয়ার নানা কাহিনি শুনেছি। সবসময় সে হাজির হতো সমুদ্র তীরে। আর যে অনুসরণ করেছে তাকে, সে আর ফিরতে পারেনি। বেশ ক'জন সাগরতীরের চোরাবালিতে অদৃশ্য হয়েছে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটনাগুলো ঘটেছে সাদা পোশাকের তরুণী দেখা দেয়ার পর। কপাল ভাল, তুমি বেঁচে গেছ, মিস্টার টেইলর।'

'আমারও তাই মনে হয়,' একমত হলেন টেইলর।

'নিশ্চিতভাবে তুমিই প্রথম মানুষ, যে তাকে অনুসরণ করার পরও গল্প করার জন্য বেঁচে রইলে।'

'ফ্রেডকে ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ল টেইলরের কণ্ঠে, 'ও যদি আমার পাজামা ধরে না টানত, আমি থাকতাম চোরাবালির নীচে। কিন্তু অবাক লাগছে, সে এখন কোথায়?'

'আগামীকাল নিশ্চয় ফিরবে,' বললেন মিসেস টুয়েইট।

ভদ্রমহিলার কথাই ঠিক।

পরদিন তার মালিকের কাছে ফিরে এল ফ্রেড। তার দেহ বয়ে নিয়ে এলেন মিসেস টুয়েইটের এক প্রতিবেশী। সকালে সাগরের তীরে ফ্রেডের মৃতদেহ খুঁজে পান তিনি, ওটা এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, যেন কোনও হাঙর কামড়েছে।

যে জায়গায় প্রিয় কুকুর মারা গেছে, সেখানে হাজির হলেন টেইলর। ওটা চোরাবালির এলাকার কাছেই। তবে কয়েক শ গজ পিছনে। একটু চিন্তা করতেই বুঝতে পারলেন এখানেই শেষবার কুকুরের যন্ত্রণাকাতর ডাক শুনেছিলেন।

তিনি ভেবেছিলেন কোনও কাঁকড়া কামড়ে দিয়েছে বেয়াদব কুকুরকে। তারপর আচমকা আসল সত্য উপলব্ধি করলেন।

www.blogye.com

শরীর টেনে টেনে সরাইখানার দিকে ফিরতে লাগলেন টেইলর। সাদা পোশাকের এক প্রেতাত্মা তাঁকে মৃত্যুর কিনারে নিয়ে গেল, আর ওখান থেকে তাঁর জীবন বাঁচিয়ে দিল আরেকটা প্রেতাত্মা।

'ধন্যবাদ ফ্রেড,' ফিসফিস করে বললেন তিনি, 'বেঁচে থাকতে যেমন আমার বন্ধু ছিলে, মৃত্যুর পরও তাই থাকলে।'

শিকলের শব্দ

সামান্য এক ভূতের ভয়ে বাড়ি ছাড়বেন এমন লোক এথেনোডোরাস নন।

বাড়ি ভাড়া নেয়ার আগেই মালিক পই পই করে জানিয়ে দিয়েছেন, এই ভুতুড়ে বাড়ির অনেক বদনাম আছে।

এদিকে এথেনোডোরাস সে লোকের গল্প শুনেছেন, যিনি কেবল একরাত এ বাড়িতে কাটাবার পর হয়ে যান বদ্ধ উন্মাদ।

কিন্তু বাড়িটার ভাড়া বড্ড কম।

এদিকে এথেনোডোরাসের আর্থিক অবস্থা খুব সুবিধের নয়। আর গ্রীসের এথেন্সে পড়ালেখা ও শিক্ষকতা করবার জন্য আসবার পর থেকে এরকম বাড়িই খোঁজ করছিলেন বুড়ো দার্শনিক।

এমন সুযোগ হাতছাড়া করেন কী ভাবে!

অতএব ভুতুড়ে এসব গল্প কেয়ার না করেই বাড়িতে উঠে পড়লেন এথেনোডোরাস।

গল্পগুলো যদি সত্যিও হয়, তবু এ বাড়ি ছাড়তে নারাজ তিনি।

'সত্যি যদি অতৃপ্ত আত্মা থাকে,' নিজেকে সাহস দেবার জন্য বিড়বিড় করে আপন মনে বললেন, 'সম্ভবত আমার চমৎকার সঙ্গী

www.blogye.com

হয়ে উঠবে সে।'

প্রতিরাতে যা করেন এবাড়ির প্রথম রাতেও তাই করে কাটাবেন, ঠিক করলেন দার্শনিক।

বেশিরভাগ সময় পার করবেন তাঁর দর্শন নিয়ে লেখালেখি করেই।

বাড়ির এক কামরায় টেবিলে নিজ নোট ও বইগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে কাজের জন্য প্রস্তুত হলেন এথেনোডোরাস। তারপর নৈশভোজের জন্য সাদামাটা কিছু খাবার তৈরি করলেন। একসময় অস্তে গেল সূর্য। খাবার কোনওমতে পেটে চালান দিয়ে পড়ালেখা ও কাজে মন দিতে চাইলেন।

মাথা থেকে ভূত বা প্রেতাত্মা নিয়ে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিতে হবে, ভাবলেন বুড়ো দার্শনিক। আর তাই এ রাতে দর্শন শাস্ত্রের খুব কঠিন এক সমস্যা নিয়ে কাজ করবেন ঠিক করলেন।

একসময় সত্যি বিষয়টা নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন এথেনোডোরাস। কিন্তু একটু পরেই তাঁর মনোযোগে বাধা পড়ল। দূর থেকে ভেসে আসছে একটা ঝনঝন শব্দ।

শুনবার জন্য একমুহূর্ত কান খাড়া করে রইলেন। মনে হচ্ছে ভারী শিকল পাথরের মেঝের উপর দিয়ে টেনে আনছে কেউ।

যতই সময় গড়াল, তাঁর কামরার আরও কাছে হতে লাগল ওই অদ্ভুত আওয়াজ।

বড় করে শ্বাস নিয়ে নিজের তৈরি করা লেখাগুলোয় মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলেন দার্শনিক। এসব সামান্য কারণে ভয় পাওয়ার চেয়ে পড়ালেখা করা অনেক জরুরি তাঁর কাছে, নিজেকে বোঝালেন।

যাই ঘটুক, ঘাবড়ে যাওয়া চলবে না।

এদিকে শিকল টেনে টেনে কারও আসবার শব্দ আরও কাছে চলে এল।

তবে এথেনোডোরাস এখনও স্থির বসে আছেন।

www.blogye.com

হাত আর পায়ে শিকল
জড়ানো ভূত।

দর্শনের সমস্যাটা নিয়ে ভাবছেন, লিখছেন ও নিজের তৈরি নোটগুলো পড়ছেন। এমন কী চোখ তুলে শব্দের উৎসের দিকে তাকালেন না। মনের ভিতর ভয়কে দানা বাঁধবার সুযোগও দিলেন না। কিন্তু একপর্যায়ে মনে হলো শব্দের উৎস তাঁর কামরার ভিতর ঢুকে পড়েছে।

শিকলের ঝনঝন আওয়াজ এতই তীব্র হয়ে উঠল যে প্রচণ্ড সাহসী ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন দার্শনিক কাজে মনোযোগ ধরে রাখতে পারলেন না।

মুখ তুলে তাকালেন এথেনোডোরাস। শীতল এক স্রোত বয়ে গেল তাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে

www.blogye.com

পারছেন না। তাঁর সামনে টিমটিমে আলোয় দাঁড়িয়ে আছে এক মানুষ— আরও পরিষ্কারভাবে বললে একজন মানুষের অবয়ব!

কাঠামোটা এতই পাতলা, তাকে কংকালের মত মনে হচ্ছে। ফ্যাকাসে, ধূসর মাংস যেন কোনওমতে হাড়ের উপর আটকে আছে। লম্বা, সাদা দাড়ি জীর্ণ ও নোংরা। হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালিতে বেড়ি। আর বেড়ির সঙ্গে জোড়া লাগানো লম্বা শিকল। হাঁটবার সময় ওই শিকলের শব্দ শুনেছেন দার্শনিক।

এথেনোডোরাসের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মানুষটি। চোখে একইসঙ্গে খেলা করছে রাগ ও হতাশা। পলকা হাতদুটো মাথার সামনে এনে পাগলের মত ঝাঁকাতে লাগল বেড়িগুলো। আর সেসঙ্গে শিকলের ঝনঝন শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল অন্ধকার, নির্জন বাড়িটাতে। তারপরই অস্থিচর্মসার একটা আঙুল তুলে এথেনোডোরাসকে দাঁড়াতে বলল।

আতংকে শিউরে উঠলেন দার্শনিক। তবে নিয়ন্ত্রণ হারালেন না নিজের। প্রচণ্ড মানসিক জোর খাটিয়ে ভৌতিক কাঠামোর চোখে তাকালেন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁর কাজের দিকে ইংগিত করে ভূতকে চলে যাবার জন্য ইশারা করলেন।

আবারও লেখালেখিতে মন দিলেন এথেনোডোরাস। আরও ভালভাবে বললে, লেখার চেষ্টা করলেন।

তাঁরা মাথা আসলে এখন আর ঠিকঠাক কাজ করছে না।

বুঝতে পারছেন না, এ কি দুঃস্বপ্ন, নাকি সত্যিই ঘটছে?

দার্শনিককে টলাতে না পেরে এবার নতুন চাল চালল ভূতটা।

ভাঙা, যন্ত্রণাকাতর গলায় চেঁচাতে শুরু করল। গোঙানি ক্রমেই চড়তে লাগল, সেসঙ্গে পাগলের মত হাত-পায়ে বাঁধা বেড়ি ঝাঁকাচ্ছে।

আবারও এথেনোডোরাস বাধ্য হলেন ওটার দিকে তাকাতে।

প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও হতাশার ছাপ ফুটে আছে ভূতের মুখে।

আবারও উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণের ইংগিত করল

www.blogye.com

দার্শনিককে।

বুড়ো দার্শনিক এবার কলম নামিয়ে রেখে ওটার যন্ত্রণাক্লিষ্ট, করুণ মুখের দিকে সরাসরি তাকালেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। যতটা না ভয়ে, তার চেয়ে বেশি করুণা হওয়ায়। ইশারায় ওটাকে পথ দেখাতে বললেন তিনি।

অনুসরণ করে পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে চলে এলেন দার্শনিক। বহু দিনের অযত্নে-অবহেলায় জায়গাটা পুরো জংলা হয়ে গেছে। বাগানের এক জায়গায় ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপ ও গুল্মের জঙ্গল।

শিকল টেনে ওখানে হাজির হলো ওটা। এবার এথেনোডোরাসের দিকে ফিরল। মাটির দিকে ইশারা করে শেষবারের মত বেড়িগুলো ঝাঁকাল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

জঙ্গলের যে অংশে প্রেতাত্মা ইশারা করেছে, সে জায়গায় আলো নিয়ে এসে ভালমত দেখলেন এথেনোডোরাস। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। পরে যেন চিনতে পারেন তাই কয়েকটি ডাল-পালা ভেঙে রাখলেন। তারপর বাড়ির ভিতরে চলে এলেন। এমন অভিজ্ঞতার পর আর যাই হোক, পড়ালেখায় মনোযোগ দেয়া যায় না। তাই সটান শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আদালতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এথেনোডোরাস। তাঁকে জানালেন, গতরাতের সেই প্রেতাত্মার মুখোমুখি হয়েছেন। পুলিশ এবং বিচারককে নিয়ে বাড়ি ফিরে বাগানে এসে বললেন, 'এটাই সেই জায়গা, আপনার লোকদের বলুন এখানে খুঁড়ে দেখতে।'

শুরুতে বুড়ো দার্শনিকের কথায় কান দেননি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তারা, কিন্তু এথেনোডোরাস তাঁর বক্তব্যে অবিচল আছেন দেখে টনক নড়ে তাঁদের।

দার্শনিকের সঙ্গে এসে এ বাড়িতে তদন্ত করতে রাজি হন।

ম্যাজিস্ট্রেটের লোকেরা ভূত যে জায়গায় অদৃশ্য হয়েছে, সে

www.blogye.com

জায়গার জঙ্গল সাফ করল, তারপর মাটি খুঁড়তে শুরু করল। আর অধীর আগ্রহ নিয়ে দার্শনিক ও ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা করলেন কী পাওয়া যায় তা দেখতে।

ঠিকভাবে সমাধিস্থ করা হলে অনেক সময়ই রেহাই পাওয়া যায় অতৃপ্ত আত্মার অত্যাচার থেকে।

মিনিট কয়েক পরেই এক লোকের বেলচা শক্ত কিছুতে আঘাত হানল। মাটির কয়েক ফুট নীচেই জিনিসটা ছিল।

'এবার থামো,' তাঁর লোকদের উদ্দেশে বললেন ম্যাজিস্ট্রেট। তারপর তাদের একজনের বেলচা নিয়ে খুব সাবধানে জিনিসটার চারপাশের মাটি সরাতে লাগলেন।

একটু পরেই দেখা গেল মর্মান্তিক এক দৃশ্য। অগভীর এক কবরে শুয়ে আছে জীর্ণ কংকাল। তাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই এথেনোডোরাস জেনে গেলেন, যে লোকের অতৃপ্ত আত্মা এ বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, তারই কংকাল ওটা। কারণ কংকালটার হাত আর পায়ের সঙ্গে বেড়ি আটকানো। ওই বেড়ির সঙ্গে আবার জোড়া লাগানো লম্বা, ভারী শিকল।

দেরি না করে কংকালের হাড় থেকে বেড়ি ও শিকল খুলে

www.blogye.com

ফেললেন ম্যাজিস্ট্রেট। তারপর ধর্মীয় নিয়ম মেনে সমাধিস্থ করা হলো কংকালটাকে।

এরপর আর কোনওদিন শিকল টেনে হেঁটে যাওয়া ভূতের দেখা পাননি এথেনোডোরাস। সম্ভবত মৃত লোকটার আত্মা এমন এক জ্ঞানী লোকের অপেক্ষা করেছে এতদিন। এমন এক জ্ঞানী যে আতংকিত না হয়ে দয়া আর করুণা নিয়ে তার বিষয়টা বিবেচনা করবেন। বুড়ো দার্শনিক ঠিক তাই করেছেন। আর ওই বাড়িতেও আর কখনও ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটেনি।

এ বইয়ের সবচেয়ে পুরনো সত্যি ভূতের কাহিনি এটাই। প্রথম খ্রীস্টাব্দে পিনি দ্য ইয়ংগার এ কাহিনি লিপিবদ্ধ করেন।

পিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী রোমান দার্শনিক। তিনি জানান, ওই কাহিনি মোটেই গল্প নয়, বরং আগাগোড়া সত্যি ঘটনা।

আমার নাম...

এবারের কাহিনিটি মধ্যবয়স্কা এক চিকিৎসকের। তাঁর জবানবন্দি তুলে ধরছি:

'হাসপাতালের জরুরি বিভাগের নানান ধরনের রুগী আসে। তবে এদের একজনের কথা সারাজীবন ভুলতে পারব না। মধ্যবয়স্ক এক প্রবাসী ছিলেন তিনি। বোটানিক্যাল গার্ডেনে জগিং করবার সময় হার্ট-অ্যাটাক হয় তাঁর।

'খুব বেশি দেরি হয়নি তাঁকে হাসপাতালে আনতে। কিন্তু অ্যাটাকটা মারাত্মক হওয়ায় তাঁর জন্য কিছুই করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে।

'তারপর বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। এসময় ঘটল ভয়ঙ্কর

www.blogye.com

ঘটনাটি। আমার এখনও বিশ্বাস করতে মন চায় না আসলেই এমন কিছু ঘটেছে। পুরো বিষয়টা পরে বুঝতে পারি। তবে আপনাদের বুঝবার সুবিধার জন্য গোড়া থেকেই বলি।

'মারা যাওয়ার আগে সে প্রবাসী ভদ্রলোকটি যে বাড়িতে থাকতেন, সে বাড়িতেই পরে ওঠেন মধ্যবয়সী এক দম্পতি। বাড়ির আগের ভাড়াটের ভাগ্যে কী ঘটেছে, এ সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না তাঁদের। তারপর একদিন ঘটল ঘটনাটা।

'ভদ্রমহিলাটি গিয়েছেন গোসল করতে। কিন্তু একটু পর হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

'ভাগ্যই বলতে হবে, সেটি ছিল ছুটির দিন।

'স্বামী ভদ্রলোক তাই বাড়িতেই ছিলেন। কী হয়েছে দেখতে দৌড়ে স্ত্রীর কাছে গেলেন। সমস্যা কী, জানতে চাইলে ভদ্রমহিলা বললেন, কিছু তাঁকে আক্রমণ করেছিল। তারপরই ভদ্রলোকের চোখ গেল স্ত্রীর ডান হাতের দিকে। ভয়ে শিউরে উঠলেন তিনি। সেখানে মাংস কেটে গভীর ভাবে লেখা কয়েকটি শব্দ, 'আই অ্যাম ডেভিড।'

এদিকে মহিলা তখন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত আচরণ করছেন। কী করবেন বুঝতে না পেরে স্বামীটি তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে এলেন হাসপাতালে।

'কাকতালীয়ভাবে তখন আমার ডিউটি ছিল। আর মহিলাটিকে পরীক্ষা করবার সুযোগ হয় আমার। কিছুতেই বুঝছিলাম না, হাতে ওই লেখাগুলো কী ভাবে এল।

'তারপর মহিলার ভর্তির কাগজে ঠিকানা দেখে সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ঠিকানা চেনা লাগছিল আমার। তাড়াতাড়ি পুরনো রেকর্ড ঘাটতে লাগলাম হাসপাতালের।

'পেয়েও গেলাম যা খুঁজছি।

'ওই প্রবাসী ব্যক্তির নামের প্রথম অংশ ছিল, "ডেভিড"।'

www.blogye.com

ডাইনীর গুহা

টেনিসির বেল উইচের মত ভুতুড়ে কাহিনি আমেরিকার ইতিহাসে কমই আছে। রবার্টসন কাউন্টিতে শুধু ১৮১৭-২১ সাল পর্যন্ত যে অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড হয়, তা লিখতে গেলেই আস্ত বই হয়ে যাবে।

ওই চার বছর জন বেল নামের এক কৃষকের পরিবারকে জ্বালিয়ে মারে রহস্যময় উগ্র এক আত্মা। ভুতুড়ে প্রাণী, অদৃশ্য কণ্ঠ, মারপিট এমন নানাভাবে আক্রান্ত হয় পরিবারটি। এমন কী একপর্যায়ে কর্তা জন বেলের মৃত্যুও ডেকে আনে বেল উইচ নামে পরিচিত ডাইনীটা।

ঘটনার শুরু ১৮১৭ সালে।

তখন বাড়িতে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে থাকেন পরিবারটির সদস্যরা।

প্রথম দিকে জোরে দরজায় করাঘাত, খড়খড় ও আঁচড় দেয়ার শব্দ— এমন ছোটখাটো সমস্যা দেখা দেয়।

ধীরে ধীরে যেন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল অশুভ আত্মা। বিছানা থেকে কম্বল টেনে নামিয়ে ফেলে। পরিবারের সদস্যদের লাথি মারা, শরীরে আঁচড় কাটা, এমন কী চুল ধরে টান দিয়ে উত্ত্যক্ত করতে থাকে ওটা।

তবে তার আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল কিশোরী এলিজাবেথ বেল। চড়, চিমটি, পিন দিয়ে খোঁচা মেরে কালশিটে ফেলে দেয়া এসব হয়ে উঠল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

জন বেল শুরুতে এসব গোপন করতে চাইলেন। কিন্তু পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে খুলে বললেন।

এ বন্ধুটি আরও ক'জন অভিজ্ঞ লোকসহ বিষয়টি তদন্ত করে দেখবার সিদ্ধান্ত নেন।

তবে খুব দ্রুতই ভদ্রলোক বুঝে গেলেন, অশুভ শক্তিটা দারুণ বুদ্ধিমান। আর দিনে দিনে যেন ওটার শক্তি বাড়ছে। একসময় দেখা গেল কথা বলবার ক্ষমতা অর্জন করেছে ওটা, তারপর থেকে কমই চুপ থেকেছে।

আত্মাটা নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেয় কেট বেটস ডাইনী বলে।

বেলের প্রতিবেশী ছিল এই নামের এক মহিলা। যার সঙ্গে আবার বেলের ব্যবসায়িক বিষয়ে বেশ ঝামেলা ছিল।

মধ্য বয়সেই মৃত্যু হয় কেট বেটসের।

স্থানীয় লোকজনের কাছে 'কেট' নামে পরিচিতি পেয়ে যাওয়া আত্মা এরপর নিয়মিত হানা দিতে থাকে বেলদের বাড়িতে।

বাড়ির সবাইকে যন্ত্রণা দেয়া শুরু করল ওটা। শুধু তাই নয়, রবার্টসন কাউন্টির আরও বিভিন্ন জায়গায় কণ্ঠ ও নানান রকম শব্দ দিয়ে নিজের উপস্থিতি জাহির করে বদ আত্মাটা।

এতই নাম কামাল যে জেনারেল অ্যান্ড্রু জ্যাকসন একে দেখতে আসবার সিদ্ধান্ত নেন। বলা হয় ওই এলাকায় আসবার পর তিনি নিজেও ওটার খামখেয়ালির শিকার হন। তাঁর ঘোড়াগাড়ির চাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যতক্ষণ না ডাইনীটা ওটাকে যেতে দেয়।

একের পর এক অদ্ভুতুড়ে রোগে আক্রান্ত হতে থাকলেন জন বেল। এলাকার লোকদের ধারণা কেটই এর জন্য দায়ী।

এমন কী অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকা জন বেলকে আত্মাটা অভিশাপ দেয় ও ইচ্ছামত খোঁচায়। বলা যায় অসুস্থ লোকটাকে একমুহূর্তের জন্য বিশ্রামের সুযোগ দেয়নি ওটা।

এক সকালে বিছানায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল জন বেলকে। পাশেই পাওয়া গেল একটা বোতল। বেলের নিঃশ্বাসে বোতলের কালো পানীয়ের গন্ধ পাওয়ার পর অশুভ

www.blogye.com

বেলদের বাড়িতে হানা দেয় বেল ডাইনি।

আশংকা ডালপালা মেলল।

একজন পরীক্ষা করবার জন্য তরলের কয়েক ফোঁটা এক বিড়ালের মুখে ঢেলে দিলেন।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে পৃথিবীর মায়া কাটাল অবলা প্রাণীটি।

অজ্ঞান অবস্থাতেই মৃত্যু হলো বেলের।

আর তখন খুশিতে নাকি চিৎকার করে ওঠে ডাইনীটা।

কেউ কেউ সেই আওয়াজ শুনেছেন এমনও বলেছেন।

জন বেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়ও তার উপস্থিতির নমুনা রাখল 'কেট'।

হতভাগা লোকটিকে সমাধিস্থ করবার সময় শোনা গেল ওটার হাসি, অভিশাপ দেয়া ও গানের আওয়াজ।

তার চিরশত্রুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিল না, 'কেট'।

বাড়ির আশপাশেই থাকল সে।

বেলের মেয়ে বেটসি বেলকে হুমকি দিল ভালবাসার মানুষ জসুয়া গার্ডনারকে বিয়ে না করবার জন্য। তবে পরে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক রিচার্ড পাওয়েলকে যখন বেটসি বিয়ে করে, তখন কোনও ঝামেলা করেনি ডাইনীটা।

www.blogye.com

কেন কে জানে এসময় পরিবারটিকে ছেড়ে যায় 'কেট'।
তবে সাত বছর পর আবারও ফিরে আসবার প্রতিজ্ঞা করে।
কথা রাখে সে।

এবার হপ্তাহ দুয়েক জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়েই বিদায় নিল। তবে কাউন্টির সবাই কোনওভাবেই বিশ্বাস করতে চায় না, ওটা সত্যি এলাকা ছেড়ে গেছে। গেলেও খুব দূরে কোথাও যায়নি। তাদের ওই অনুমান যে খুব মিথ্যা নয়, এর প্রমাণ রয়েছে কাহিনির বাকি অংশে।

অসুস্থ জন বেলকে একমুহূর্তের জন্য শান্তি দেয়নি ডাইনিটা।

প্রাক্তন বেল খামারের সীমানায়, রেড রিভারের ধারে এক গুহা আছে।

www.blogye.com

লোকে একে বলে, 'বেল উইচ কেভ।'

রবার্টসন কাউন্টির অনেকেই মনে করেন, যখন বেলদের নিস্তার দিয়ে তাদের বাড়ি ছাড়ে ডাইনীটা, তখন ওই গুহায় আশ্রয় নেয় সে। তবে কারও কারও ধারণা, গুহায় এমন দরজা আছে, যেটা দিয়ে অন্য কোনও জগৎ থেকে পৃথিবীতে আসে কেট। আবার ফেরে ওই পথেই। হয়তো বা ওই দরজা দিয়েই এখনও গুহায় ঢুকে পড়ে সে, কে জানে?

তবে ওই গুহা এবং ওটার চৌহদ্দি ঘিরে এতসব আধিভৌতিক কাণ্ড ঘটে এখনও, ডাইনীর ফিরবার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

যতদূর জানা যায়, একসময় খাবার সংরক্ষণের হিমাগার হিসাবে ব্যবহার করা হতো গুহাটা। কারণ ওটার তাপমাত্রা সবসময় ৫৬ ডিগ্রী ফারেনহাইটে থাকে।

বলা হয় 'কেট' অদৃশ্য হওয়ার পর পর ওই গুহা এবং আশপাশের এলাকায় তার কণ্ঠ শুনেছেন কেউ কেউ।

এমন কী একবার বেটসি আর তার কয়েক বান্ধবী গুহায় ঘুরতে গিয়ে ওটার মুখোমুখিও হয়ে যায়।

নদীর দিকে মুখ করা বড় এক চড়াইয়ের মাঝে গুহার অবস্থান। গুহামুখ বেশ চওড়া, কিন্তু ভিতরে বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে সুড়ঙ্গ। বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা অন্য গুহাগুলোর সঙ্গে তার তুলনা করা চলবে না। কারণ তার সত্যিকারের দৈর্ঘ্য অজানা। সরু সব সুড়ঙ্গ চলে গেছে পাঁচ শ ফুট কিংবা তারও বেশি, একপর্যায়ে পুরোপুরি অগম্য।

ভৌগোলিকভাবে ওটি চুনাপাথরের তৈরি শুকনো গুহা হলেও বর্ষায় পরিস্থিতি পাল্টে যায়। পাহাড়ের উপর থেকে বেরুনো এক ঝোরা তখন গুহার ভিতর দিয়ে গিয়ে নদীতে পড়ে। আর এ কারণে গুহার ভিতরে বর্ষার সময় যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

শুধু তাই নয়, তখন পানি পতনের প্রচণ্ড শব্দে একজনের কথা

www.blogye.com

আরেকজন শুনতে পাবেন না।

তবে শুকনো মৌসুমে কৌতূহলী দর্শক ও ভূত শিকারীদের সময় কাটানোর এক ভাল জায়গা ওই বেল গুহা।

বেল গুহাটি মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে আসে বিল এডেন নামের এক ভদ্রলোকের কারণে।

কয়েক বছর ওটা ছিল তাঁর মালিকানায়।

এডেনের গুহা সম্পর্কে বেশ স্বচ্ছ ধারণা ছিল।

একসময় জন বেলের মালিকানাধীন ওই জায়গায় যে এখনও আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে, তা নজর কাড়ে তাঁর।

এমনিতে কৃষক হলেও বিদ্যুতের বাতি দিয়ে গোড়ার দিকে গুহার কিছু সংস্কার করেন তিনি। অবশ্য এরপর আর ওটার রক্ষণাবেক্ষণে তেমন নজর দেয়া হয়নি।

পর্যটকদের গুহা ঘুরিয়ে দেখানোর চল শুরু করেন বিল এডেন।

বেল গুহায় যেসব ভুতুড়ে কাণ্ড হয়েছে তার অনেকগুলোর সাক্ষী এডেন নিজে।

আবার পর্যটকদের নিয়মিত মুখোমুখি হতে হয় নানা অশুভ ঘটনার।

একবার এক মহিলা এসে দলবলসহ গুহা দেখবার আর্জি জানালেন। এডেনের পিছুপিছু জনা পনেরো লোক গুহামুখ দিয়ে ঢুকলেন বিপজ্জনক সুড়ঙ্গপথে। একটু গিয়েছেন কী যাননি, এমনসময় দলনেত্রী মহিলাটি রাস্তার মাঝখানে বসে পড়লেন। সঙ্গের এক লোক তাঁকে ওভাবে বসে পড়বার কারণ জানতে চাইলেন।

মহিলাটি ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বললেন, তিনি উঠতে পারছেন না। দাবি করলেন, খুব ওজনদার কিছু, যেন পুরো এক টন সীসা, তাঁর উপর চেপে বসেছে আর মাটির দিকে চাপ দিচ্ছে। তাই কোনওমতেই উঠতে পারছেন না।

www.blogye.com

শেষমেষ কয়েকজন মিলে পায়ের উপর দাঁড় করাতে পারলেন মহিলাটিকে। তারপর বয়ে পাহাড় থেকে গাড়িতে নিয়ে তুললেন তাঁকে।

বিল এডেনের নিজেরও নানা অভিজ্ঞতা আছে গুহা ঘিরে।

ভূত কিংবা ডাইনী, একটা কিছু দেখবার জন্য প্রচুর লোক ওখানে আসেন।

এডেন বলেছেন, 'আমি বলব, অশুভ আত্মা আছে ওখানে। ওটা মানুষের মত, যার পিঠ দেখা যায়। মনে হবে যেন কুয়াশা, বরফ বা পুরোপুরি সাদা পর্দা দিয়ে তৈরি। কিন্তু তাকে ভেদ করে কিছু দেখতে পাবেন না। যখন গোড়ালির উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় তখন পূর্ণাঙ্গ মানুষই মনে হবে। তবে পুরোপুরি মাটি স্পর্শ করে না, বরং অনেকটা ভেসে যায়।'

একবার এক সাক্ষাৎকারে ডাইনীর এ বর্ণনাই দিয়েছিলেন বিল এডেন।

মানুষ বেল গুহায় আসেন ভূত বা প্রেতাত্মা দেখতে। তাঁদের অনেককে বাড়ি ফিরতে হয় হতাশ হয়ে। কেউ আবার যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে একটু বেশিই পেয়ে যান।

এক সন্ধ্যার কথা ধরা যাক।

এক দঙ্গল তরুণ ছেলে-মেয়েকে নিয়ে গুহায় ঢুকলেন এডেন। মোটামুটি ঘণ্টাখানেক ঘুরবার পর প্রশস্ত এক জায়গায় থেমে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সবাই। এসময় বিল গুহা নিয়ে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা বলতে থাকেন। জায়গাটা ছাড়বার কথা ভাবছেন, এমনসময় এক মেয়ে গুহাটা কি আসলেই ভুতুড়ে কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করল। তারপর বলল, যদি গুহা ভুতুড়ে হয়, তা হলে যেন ভৌতিক কিছু ঘটে।

কিন্তু তার কপালে আধিভৌতিক কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি তখন। অবশ্য, দুটো কামরার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা লম্বা, চিকন এক সুড়ঙ্গে যখন ঢুকল সবাই, তখনও মেয়েটা হা-পিত্যেশ

www.blogye.com

করছে। দলের বাদবাকিরা বেশ হাসি-খুশি ছিল। এডেনও একদঙ্গল তরুণ-তরুণীকে পেয়ে ঠাট্টা, অট্টহাসি, শিস দেয়া এমন নানা ছেলেমানুষিতে মেতে আছেন। নাখোশ তরুণীটি এডেনের বেশ কিছুটা সামনে।

সরু পথে মেয়েটা একাকী হাঁটছে। হঠাৎই হোঁচট খেয়ে পিছন দিকে চলে এল সে। মনে হলো কেউ যেন ধাক্কা মেরেছে তাকে। কয়েক পা পিছু হটে গুহার মেঝের উপরই বসে পড়ল মেয়েটা। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, কেউ তাকে চড় মেরেছে।

এডেন বোঝাবার চেষ্টা করলেন পুরোটাই তার কল্পনা। মেয়েটাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন তিনি, যদিও তাঁর মনের সংশয় তখনও কাটেনি। তারপর গুহার বাইরের দিকের কামরায় চলে এলেন তাঁরা। এবার সত্যিই তার কথার সত্যতা আছে না কি দেখবার জন্য আলোটা তুলে মেয়েটার মুখের সামনে ধরলেন এডেন। তরুণীর গালের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলেন, লাল একটা দাগ, আর পরিষ্কার ফুটে আছে কারও আঙুলের ছাপ।

১৯৭৭-এর গ্রীষ্মের শুরুর দিকে কেনটাকির ফোর্ট ক্যাম্পবেলের কয়েকজন সৈনিক আসে গুহা দেখতে। তাদের বেশ কিছুটা সময় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পিছনের কামরায় গিয়ে শেষ করলেন এডেন। এসময় এক সৈনিক খুব ভদ্রভাবে 'কেট'কে নিয়ে প্রচলিত গল্পগুলোর বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করল। সে বলল, ভুতুড়ে হিসাবে বদনাম আছে এমন অনেক গুহাতেই গিয়েছে, কিন্তু তেমন বলবার মত গা শিরশিরে কোনও অনুভূতি হয়নি।

হেসে কাঁধ ঝাঁকালেন এডেন। বললেন, 'যদি আসলেই কিছু ঘটে, তবে সন্দেহ নেই এখানে আর ফিরে আসবে না তুমি।'

ওখানে বসে বেশ কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করবার পর সবাই ফিরবার জন্য উঠে দাঁড়াল, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করা তরুণ সৈনিকটি বাদে।

'মিস্টার এডেন! এখানে এসো, আমাকে সাহায্য করো,'

www.blogye.com

আতংকিত কণ্ঠে বলল সে, 'আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না।'

এডেন ও তরুণের বন্ধুরা ধরে নিল মজা করছে সে। হাসতে শুরু করলেন তাঁরা। কিন্তু সৈনিকটির দিকে ভাল করে তাকাতেই এডেন বুঝতে পারলেন, কোনও গোলমাল আছে। সে তখন সাহায্যের জন্য বারবার অনুরোধ করছে। ঘামে ভিজে গেছে তার মুখ। যখন সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়ালেন, তখন আবিষ্কার করলেন তার হাত ঠাণ্ডা, চটচটে।

সৈনিক তখনও আতংকিত কণ্ঠে চিৎকার করে চলেছে। সে দাবী করল, শক্তিশালী এক জোড়া হাত তার বুক জড়িয়ে ধরেছে। ওই হাত এত জোরে চাপ দিচ্ছে যে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এবার সবাই মিলে খাড়া করলেন তরুণ সৈনিককে। গুহার ভিতর প্রবাহিত জলের এক ধারার কাছে নিয়ে তার মুখ ধুয়ে দিলেন এডেন। একটু সুস্থবোধ করলে সৈনিককে গুহার বাইরে নিয়ে আসা হলো। যখন বেল গুহা ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হলো, ততক্ষণে তরুণ পুরোপুরি স্বাভাবিক। একটু আগের ভীতিকর অভিজ্ঞতার কোনও চিহ্ন তার মধ্যে নেই।

গাড়ির দিকে যাওয়ার সময় একমুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে বিল এডেনের হাত ঝাঁকাল সে।

'তোমার একটা কথা একেবারে ঠিক, মিস্টার এডেন,' বলল তরুণ সৈনিক, 'আমি আর কখনোই এখানে ফিরব না!'

বেল ডাইনীর গুহা ও বেল খামারের এক অংশের বর্তমান মালিক ক্রিস এবং ওয়াল্টার কারবি। ওয়াল্টার তামাকের চাষ করলেও তাঁর স্ত্রী ক্রিস ব্যস্ত থাকেন গুহাতে পর্যটকদের নিয়ে বিভিন্ন ট্যুর পরিচালনা নিয়েই।

বিশেষ করে গ্রীষ্মের মাসগুলোতে তাঁকে এতই ব্যস্ত থাকতে হয়, যে নাওয়া-খাওয়ার সময় বের করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কারবিরা খামার ও গুহা কেনেন ১৯৯৩ সালে।

বিল এডেনের মৃত্যুর পর বেশ কয়েক বছর অনাদরে,

www.blogye.com

অবহেলায় পড়ে ছিল জায়গাটা।

কারবিরা কেনার পর পরই গুহা সংস্কার আর উন্নয়নে মন দেন।

বেল গুহার ভিতরে।

নতুন বাতি লাগানো, গুহায় চলবার ভাল রাস্তা, বিপজ্জনক অংশগুলো পেরোনোর কাঠের পথ তৈরি— এমনই নানা কাজ করেন তাঁরা। এখনও গুহায় পর্যটকদের সুবিধা হয় এমন বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে তাঁরা ব্যস্ত।

তবে খামারটিতে আসবার কিছুদিনের মধ্যেই কারবিরা বুঝে যান, তাঁদের এই সম্পত্তি এমনি এমনি ভুতুড়ে নাম পায়নি।

'সুড়ঙ্গ ও পুরনো বাড়ি— দুটোতেই অস্বাভাবিক সব শব্দ শুনতে পাই,' ক্রিস সাংবাদিকদের বলেন, 'এ জায়গার এমনিতেই ভুতুড়ে বদনাম আছে। তার উপর আবার গুহামুখের উপরে পাহাড়ের চূড়ায় রেড ইণ্ডিয়ানদের গোরস্থান আছে। এদিকে আমাদের শোবার ঘরেই এই বাড়ির আগের মালিক মারা

www.blogye.com

গিয়েছেন। এখানে অতিপ্রাকৃত কিছু থাকবে না তো কোথায় থাকবে?'

একদিন এক দল নিয়ে গুহায় ঢুকছেন ক্রিস। তাঁর কুকুরটা সামনে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

গুহার প্রবেশ পথে লাগানো গেট খুলতেই ভিতরে অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলেন ক্রিস। অনেকটা এ ধরনের শব্দ শুনবার কথা বিল এডেন ও তাঁর সঙ্গে গুহায় ঘুরে-বেড়ানো একটি দলের সদস্যরাও বলেছিলেন।

খুব জোরে জোরে শ্বাস টানবার আওয়াজ। যেন কেউ ঠিক শ্বাস নিতে পারছে না। ক্রিসের চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল। তার পরই ওই আওয়াজ থেমে গেল। পিছু ফিরে অন্যদের দিকে তাকালেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল। টেরই পাননি অস্বাভাবিক কিছু ঘটে গেছে তাঁদের অগোচরে।

প্রথম কক্ষ পেরিয়ে, সরু সুড়ঙ্গ হয়ে দ্বিতীয় কামরায় প্রবেশ করল দলটি। বেল ডাইনীর গুহায় ভ্রমণের পুরনো ঐতিহ্য মেনে, খামারের নানান অস্বাভাবিক, ভুতুড়ে ঘটনা আর ডাইনী হিসাবে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেয়া 'কেটের' গল্প বলতে শুরু করলেন ক্রিস।

এসময় কোনও কারণ ছাড়াই যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল কুকুরটা। ওটার ঘাড়ের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেছে, আর দাঁত বের করে গর্জন করছে। ঘুরতে আসা পর্যটকরা উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন, ওটা এমন করছে কেন?

কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না ক্রিস। শেষ পর্যন্ত গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে প্রাণীটাকে শান্ত করলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই পিছনের দু-পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে বিলাপ করতে শুরু করল ওটা। এসময় হঠাৎ ক্রিসের হাতে ধরা ফ্ল্যাশ লাইট নিভে গেল। শুরুতে ভাবলেন ব্যাটারি গেছে। তারপর এক মহিলার হাতে ধরা ভিডিও ক্যামেরা বন্ধ হলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন

www.blogye.com

তাঁরা। কিছুক্ষণ পর ঘুরে গুহামুখের দিকে রওনা হলেন সবাই।

সাধারণত এ ধরনের অশুভ কিছুর ইঙ্গিত যখন পাওয়া যায়, তখন গুহার ভিতরে না থাকাই ভাল।

গুহাতে রহস্যময় আকৃতি দেখেছেন ক্রিসসহ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে থাকা লোকেরা, এমন কী সৌভাগ্যবান দু-চারজন পর্যটকও।

বেশিরভাগ সময় এগুলো ধোঁয়া ও কুয়াশার মত।

পরিষ্কার দেখা যায় না।

হঠাৎ গুহায় হাজির হয়, পরমুহূর্তেই আবার অদৃশ্য হয়।

এদিকে বেল গুহা নিয়ে আরেক কিংবদন্তী প্রচলিত অনেকদিন ধরেই।

ওটা অনুসারে পাথর বা গুহার ভিতরের অন্য কোনও জিনিস কেউ তুলে নিয়ে গেলেই বিপদ। স্থানীয় লোকেদের ধারণা, এর মাধ্যমে ওখানে বাস করা অশুভ শক্তিটিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কেউ বেল গুহা থেকে কিছু নিলে, গুহার শক্তিটা তাকে অনুসরণ করবে।

মনে করা হয় এ ধরনের গুজবের শুরু বেশ কয়েক বছর আগে। তখন স্থানীয় রাস্তার মেরামতের সময় শ্রমিকরা এক আমেরিকান আদিবাসী নারীর মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। যেহেতু বেল খামারের সীমানার ভিতর আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানদের বহু পুরনো গোরস্থান আছে, তাই মৃতদেহ বেল গুহার ভিতরে সমাধিস্থ করবার অনুরোধ জানানো হয়।

গুহার প্রথম খুপরির গভীর খাঁজে মহিলার কংকাল ঢুকিয়ে চুনাপাথরে চাপা দেয়া হয়।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওগুলো ওখানে বেশিদিন থাকেনি।

কিছুদিন বাদেই চোরেরা রাতের আঁধারে গুহার ভিতর থেকে হাড়গুলো খুঁড়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

তবে স্থানীয় জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গল্প সত্যি

www.blogye.com

হলে, এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হয় চোরগুলোকে।

চুরির কয়েকদিনের মধ্যেই এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের উপর নেমে আসে বেল গুহার অভিশাপ।

মন্দভাগ্য, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা এমন নানা সমস্যায় পড়তে থাকে তারা। পরের বছরগুলোতে বেল গুহা থেকে কোনও জিনিস সরিয়ে মন্দ ভাগ্যের শিকার হওয়ার দাবি করেন এখানে ঘুরে যাওয়া অনেক পর্যটক।

ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেননি ক্রিস কারবিও।

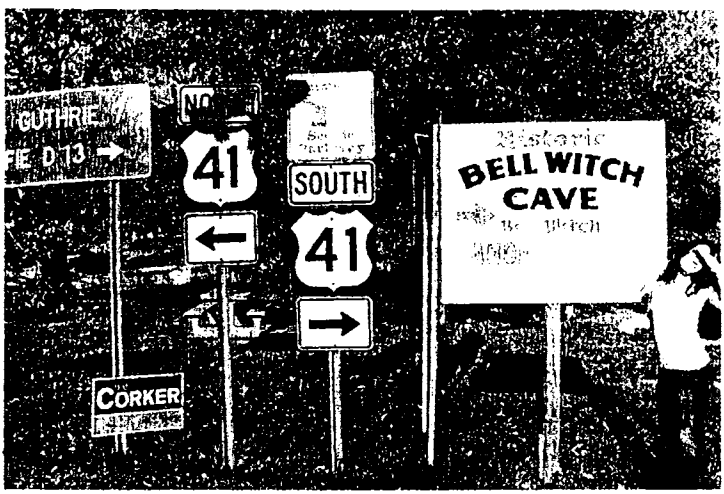

বেল গুহায় ঢোকার আগেই পাবেন এমন দিক নির্দেশনা।

মহিলা জানান, গত কয়েক বছরে ডাকে বেল গুহার পাথরসহ বেশকিছু প্যাকেট পেয়েছেন তিনি, যেগুলো ঘুরতে আসা পর্যটকরা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। ওগুলো বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্য নাকি শান্তি পাননি তাঁরা।

তাঁদের বিশ্বাস, ওগুলোকে গুহায় ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আবারও স্বাভাবিক ছন্দ ফিরবে জীবনে।

www.blogye.com

কেউ যদি বেল গুহায় যেতে চান, তাঁকে শুরুতেই যেতে হবে আমেরিকান অঙ্গরাজ্য টেনেসিতে। অমকো স্টেশন থেকে বামে মোড় নিয়ে পাওয়া যাবে কিসবার্গ রোড। এই রাস্তা ধরে আধ মাইলটাক গেলেই ডানে পাবেন এক ফলকের লেখা:

'বেল গুহা দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে ১ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। সাপ্তাহিক বন্ধ মঙ্গলবার। তবে হঠাৎ নদীতে পানি বাড়লেও নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ থাকে। প্রতিদিন দরজা খোলা হয় সকাল দশটায় আর বন্ধ হয় বিকাল পাঁচটায়।'

ঘুরে বেড়াতে পারবেন বেলদের পুরনো বাড়িতে। উপরি হিসাবে দেখবার সুযোগ মিলবে বেলউড গোরস্থান। ওখানে বেল পরিবারের বড় এক সমাধি এলাকা আছে। বেল স্কুলের সামনে হাইওয়ে ৪১, ওখানে ওই এলাকা ভুতুড়ে তা বুঝাবার জন্য শরীর শিরশির করা এক রোডমার্ক আছে। ওটার নকশা করেছে টেনিসি হিস্টরিক্যাল কমিশন।

দখল

এবারের ঘটনাটি সিংগাপুরের এক তরুণী অভিনেত্রীর।

চলুন, বরং তাঁর জবানীতেই শুনি:

'এটা বছর দশেক আগের ঘটনা। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরবার পর সারা শরীরে অস্বস্তিকর এক ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল। মাকে বললাম, তবে তিনি খুব গুরুত্ব দিলেন না। কেবল, "তোমার উপর বেশ ধকল গেছে আজ। ভাল মত বিশ্রাম নাও। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে," এই বলে সান্ত্বনা দিলেন।

'তবে তাঁর কথা মত সব ঠিক হয়ে গেল না। বরং আমার পা

www.blogye.com

ফুলতে লাগল। দেখতে দেখতে বেঢপ আকৃতি নিল। সেই সঙ্গে ব্যথা তো আছেই। তবে পা ফুললেও পরের কয়েক দিনে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল আমার। একপর্যায়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হলো।

'পায়ের ব্যথা এমন চরমে পৌঁছাল, ঘরের ভেতর একটু দূরে যেতে হলেও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে এগুতে হয়। তারপর আতংকিত হয়ে আবিষ্কার করলাম, মুখও ফুলতে শুরু করেছে। গাল দুটো ঝুলে পড়ল। নিজেকে কিম্ভুত কোনও প্রাণী মনে হতে লাগল। আর প্রতি মুহূর্তেই শরীরে অসহনীয় ব্যথা।

'তারপরই খেয়াল করলাম, মুরগীসহ কোনও মাংস খেতে পারছি না। কেবল ফলমূল ও শাকসব্জীতে কোনও ঝামেলা হয় না। ওগুলো বাদে অন্য কোনও কিছু খেলে বমি করে উগরে দিতে লাগলাম।

'ডাক্তার দেখানো হলো। নানা ওষুধ দিলেন তাঁরা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

'তারপর নতুন এক উপসর্গ দেখা দিল। পিলে চমকানো সব দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

'প্রথম যে স্বপ্ন দেখলাম, তাতে দূরে এক নারীমূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। হাতে একটা পাথর, ওটাকে খোদাই করা ফলক বলে চিনতে পারলাম। আমাকে ইশারায় ডাকছিল সে। তার দিকে এগুবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি এক পা এগুলে সে যেন দু-পা পিছিয়ে যায়।

'দ্বিতীয় স্বপ্ন রীতিমত ভয়ঙ্কর। মোটাসোটা, অর্ধনগ্ন এক লোককে দেখলাম। ভুড়িটা বিশাল, কুৎসিত। চোখদুটোকে মনে হলো উজ্জ্বল, লাল গোলার মত। আমার দিকে রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। প্রথমে এতই ভয় পেয়ে গেলাম, লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, টুটে গেল স্বপ্ন। তারপরই মনের ভিতর থেকে কেউ বলল, আমাকে বিকট লোকটার মুখোমুখি হতে

www.blogye.com

হবে। তাই চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে চাইলাম।

'তখন ঘুমের ভিতর দেখলাম, একদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি। এতে সে আরও রেগে গেল। তার চোখের লাল গোলার মত জিনিসদুটো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল। একসময় মনে হলো ওই লাল জিনিস দুটো ছাড়া লোকটার আর কোনও অস্তিত্ব নেই, তারপর পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'আমার পরিবারের সবাই ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সব কিছু শুনবার পর তাঁদের মনে হলো আমার এই সমস্যার মধ্যে অশুভ কিছুর যোগ আছে। আর যাই হোক ডাক্তার দিয়ে এর চিকিৎসা হবে না। এক নামকরা ওঝার খোঁজ পেয়েছিলেন তাঁরা। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলো। কিন্তু যখনই ওই ওঝার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি, একটা না একটা অঘটন ঘটে। মনে হয়, যেন অশুভ এবং ক্ষমতাধর কোনও শক্তি চাইছে না ওঝার কাছে যাই আমি।

'প্রথমবার বাবার গাড়ি হঠাৎ অচল হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন মেঘ ছাড়াই হঠাৎ মুশলধারে বৃষ্টি শুরু হলো।

'উপায়ান্তর না দেখে ওঝাই একদিন আমাদের বাড়িতে হাজির হলেন। আমাকে এক পলক দেখেই বললেন, আমার দখল নিয়ে নিয়েছে কেউ।

'কেঁদে ফেললাম।

'ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না এমন ভয় আঁকড়ে ধরল আমাকে।

'তবে ভাগ্য ভালো, ওঝাও বেশ ক্ষমতাধর।

'আমার উপর প্রভাব বিস্তার করা অশুভ আত্মার সঙ্গে কথা বললেন তিনি। ওটা জানাল, তার আরাধনার কিছু জিনিসের উপর ভুল করে পা দিয়েছি। আর রেগে গেছে সে।

'ওঝা বললেন, নিজের মঙ্গলের জন্য আর অশরীরীর যে কোনও ক্ষতি করতে চাইনি, তা বুঝাবার জন্য কিছু জিনিস দিতে

www.blogye.com

হবে আমাকে।

'ওঝার কথা মত তিনদিন বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করলাম। তৃতীয় দিন শরীরের ফোলা ও ব্যথা দুটোই চলে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে স্কুলে যেতে পারলাম।

'কয়েকদিন পর আবার ওঝার সঙ্গে দেখা হলো। জানতে চাইলাম, ওই অশরীরীর প্রভাবে থাকার সময় আমি কেন শুধু ফলমূল ও শাকসব্জী খেতে পারতাম।

'হেসে ওঝা বললেন, "ওটা ছিল নিরামিষভোজী।" '

/

বুকিট বাটক

সিংগাপুরের বুকিট বাটক আবাসিক এলাকা নিয়ে যেসব ভুতুড়ে কাহিনি প্রচলিত, তার প্রায় সব ক'টিই নির্দিষ্ট একটি ব্লক এবং এর ফ্ল্যাটগুলোকে কেন্দ্র করে। আর ওই ভূত মোটেই ক্ষতিকর নয়। এখানকার এক বাসিন্দা অবশ্য স্বস্তি প্রকাশ করে বলেছেন, এলাকায় গোরস্থান থাকবার পরও কেবল একটি প্রেতাত্মার বিচরণ রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার।

সিংগাপুরের দ্য স্ট্রেইট টাইমস পত্রিকা ১৯৮৫ সালের ১০ মার্চ সংখ্যায় ওই ভূতকে নিয়ে ফিচার ছাপে।

তবে এক পাঠক বিষয়টাকে মোটেই ভাল চোখে দেখেননি। ক্ষিপ্ত হয়ে বেশ কঠিন ভাষায় তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক বরাবর চিঠি লেখেন। এতে বলা হয় ওই ফিচারের মাধ্যমে মানুষকে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাতে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। যেখানে এর উল্টো হওয়া উচিত।

অবশ্য ওই লোককে দোষ দেয়া যায় না। কারণ এ ধরনের

www.blogye.com

কাহিনি বুকিট বাটক এলাকায় লোকদের ফ্ল্যাট কিনতে নিরুৎসাহিত করবে।

এদিকে স্ট্রেইট টাইমস পর পর দুটো চিঠিতে তাঁদের সতর্ক করবার জন্য ওই পাঠককে ধন্যবাদ জানিয়ে এ ধরনের কাহিনি আর না ছাপার প্রতিজ্ঞা করে।

যাক, আমাদের এ ধরনের কোনও বাধা নেই।

তা ছাড়া, বাংলাদেশের কারও এতে স্বার্থহানিরও সম্ভাবনা নেই।

তাই চলুন বরং বুকিট বাটকের ভুতুড়ে কাহিনির স্বাদ নেয়া যাক।

এক পরিবার বুকিট বাটকে তাঁদের নতুন কেনা ফ্ল্যাট বুঝে নিতে গেলেন। কিন্তু বাড়িতে ঢুকবার মুখেই সিঁড়ির গোড়ায় পাথরের আসনে এক বুড়ি মহিলাকে বসে থাকতে দেখলেন। বেশ ভদ্রভাবেই তাঁকে ওখানে বসে থাকবার কারণ জানতে চাইলেন তাঁরা।

বুড়ি মহিলাটি জানালেন, নাতির জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। এখন মেয়েটির প্রাইমারি স্কুল থেকে ফিরবার কথা।

পরিবারটির সদস্যরা শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, তাঁরা বুড়ি মহিলার নতুন প্রতিবেশী হতে চলেছেন। তারপর ফ্ল্যাট দেখবার জন্য লিফটে চড়লেন। এমনসময় পরিবারের একজন একটু অবাক হয়ে জানতে চাইল, সিঁড়ির গোড়ায় বসা ওই মহিলা কী ভাবে তাদের প্রতিবেশী হন, যেখানে নতুন এই ব্লকটিতে এখনও কেউ বসবাস শুরু করেননি!

অন্যরা একটু অবাক হলেও এ নিয়ে বেশি ভাবলেন না।

নতুন ফ্ল্যাটের দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে তাঁর স্বামী ও তিন ছেলেকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন মহিলাটি। পুরুষটি রান্নাঘর ও বাথরুমের সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখতে গেলেন। এদিকে ছেলে তিনটি শোবার ঘরগুলো দেখতে লাগল। আর মহিলা রওনা

www.blogye.com

মেয়েটার দেয়া সিংগাপুরিয়ান মুদ্রা থাকবার কথা, সেখানে আছে কেবল কয়েকটা শুকনো পাতা।

চালককে কথাটা জানাতেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। আরও জোরে গাড়ি চালাতে শুরু করল সে।

পরদিন যেখানে মেয়েটাকে নামিয়ে দিয়েছিল, সেখানে গাড়ি থামিয়ে দিনের আলোয় জায়গাটা পরীক্ষা করল বাস কণ্ডাক্টর।

মেয়েটা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে দেখতেই হবে তাকে।

মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে।

আশপাশে দু-চার মাইলের ভিতর কোনও বাড়ির নাম-নিশানা পেল না সে।

তবে আবিষ্কার করল একটা পুরনো ছোট্ট গোরস্থান।

মুখোমুখি

এবারের কাহিনিটি বর্ণনা করেছেন আয়ারল্যাণ্ডের কর্নেল লিউইনের স্ত্রীর।

'১৮৬৮ সালের জানুয়ারিতে ইংল্যাণ্ডের হেস্টিংসের কাছে এক বাড়িতে থাকতে হয় আমাকে।

'এক রাতের ঘটনা।

'প্রবল ঝড় হচ্ছে। আবহাওয়া প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কামরাটাকে উষ্ণ রাখার জন্য আগুন জ্বলছিল। রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার দিকে ঘুমাতে গেলাম। কিন্তু ঝড়ো বাতাস ও অবিরাম বৃষ্টির শব্দ জাগিয়ে রাখল আমাকে। এভাবে কয়েক ঘণ্টা শুয়ে আছি, এমন সময় একটা আলোর উপস্থিতির কারণে সচেতন হয়ে উঠলাম।

'আলোর উৎস কামরার ভিতরেই।

'ভাবলাম আগুন আসলে পুরোপুরি নেভেনি, ওটাই কোনও

www.blogye.com

কারণে আবারও তরতাজা হয়ে উঠেছে। কাজেই বিছানাতে হাঁটুর উপর ভর করে বসে আগুনটা দেখার চেষ্টা করলাম। কী ভাবে আবার আগুন জ্বলে উঠল এটা কৌতূহলী করে তুলেছে আমাকে।

'তখন আগুনটা ছাড়া আর কিছুর কথাই ভাবিনি, কাজেই কোনও অস্বস্তি বা ভয় কাজ করছিল না।

'কিন্তু উঁচু খাটে বসে চাইলাম, মুখোমুখি হয়ে গেলাম জিনিসটার।

'আমার থেকে ফুট তিনেক দূরে, অনেকটা মানুষের অবয়ব। তবে এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে মানুষ মনে হলো না আমার, বরং মনে হলো মৃতদের জগৎ থেকে আসা কিছু।

'আলোটা মনে হলো যেন তার শরীর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে। তবে ওটার কেবল মাথা আর কাঁধই দেখছি।

'চেহারা কখনও ভুলব না। ফ্যাকাসে, পাতলা মুখ। নাকটা চিকন, লম্বা। চোখজোড়া কোটরে ঢুকে আছে, কিন্তু মনে হলো যেন জ্বলছে। দীঘল দাড়িগুলো গলার সাদা মাফলারের ভিতর।

'লম্বা কিনারাওয়ালা পশমী এক টুপি মাথায়। রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেছি। সত্যি বলতে, ভয় পেতেও ভুলে গেছি।

'কেবল মনে হলো, এক মৃত আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপরই নড়তে শুরু করল ওটা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, ওটাকে ডিঙিয়ে দরজার দিকে আর এগুতে পারব না।

'আর ঠিক তখনই ভয়াবহ আতংক আঁকড়ে ধরল আমাকে। তারপরই মুর্ছা গেলাম।

'এভাবে কতক্ষণ জ্ঞান ছিল না, জানি না। যখন জ্ঞান ফিরল, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগল। থরথর করে কাঁপতে লাগল শরীর। তবে ঘর অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে এটা বুঝলাম, পৈশাচিক জিনিসটা বিদায় নিয়েছে। স্বস্তির শ্বাস বেরিয়ে এল আমার বুক থেকে। আবার বিছানায় এলিয়ে দিলাম শরীর। সকাল পর্যন্ত মড়ার মত ঘুমালাম।'

www.blogye.com

বাদুড় মানব

খুব বেশি দিন নয়, এই বছর বিশেক কিংবা তার কিছুটা আগের ঘটনা।

সেসময় আমেরিকার টেক্সাসের মার্শাল হোটেলে নাকি আবাস ছিল ডেভিল ব্যাট ম্যান বা শয়তান বাদুড় মানবের।

আধা মানুষ আধা বাদুড়— এই প্রাণীটি আস্তানা গেড়েছিল ধবংসাবশেষে পরিণত হওয়া পুরনো হোটেল ভবনের গভীরে।

অবশ্য পরবর্তীতে ওই হোটেল সংস্কার হয়, ব্যাট ম্যানকেও আর দেখা যায়নি।

১৯৭০-এর দশকে হোটেলটি বিক্রি করে দেয়া হয় ইস্ট টেক্সাস ব্যাপ্টিস্ট ইউনিভার্সিটির কাছে। গোড়ার দিকে প্রথম তিনতলা ছাত্রনিবাস হিসাবে ব্যবহার হতো। পরে অট্টালিকা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। শুধুমাত্র মাল-সামান রাখা হতো তখন।

সবচেয়ে উপরতলায়, হোটেলের নাম লেখা বিশাল ফলকটির ধবংসাবশেষের নীচে আশ্রয় নেয় বড় বাদুড়দের বিশাল এক কলোনি।

শুরুতে মার্শালের ওই নতুন বাসিন্দাদের খবর কেউ জানত না। তবে দ্রুতই এর মুখ ওর মুখ থেকে শহরের বেশিরভাগ লোক জেনে গেল এদের খবর।

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনগুলোতে শহরের কৌতূহলী বাসিন্দারা হাজির হতে থাকে হোটেলের কাছে। দেখত তারা হাজারে হাজারে কুৎসিত প্রাণী, শিকারের খোঁজে ডানা ঝাপটে বেরিয়ে

যেত ওগুলো।

তখনই লোকোমুখে ছড়িয়ে পড়ে এক আজব প্রাণীর গুজব।

হোটেলের ছায়া ঢাকা অংশে ছিল অন্ধকার জগতের এক বাসিন্দা। যে অচিরেই পরিচয় পেল মার্শালের ডেভিল ভ্যাম্পায়ার ব্যাট ম্যান নামে।

প্রতিদিনই কোনও না কোনও লোক শোনাতে থাকল বাদুড় মানবকে দেখবার গল্প।

আর অনেকেই তীর্থের কাকের মত আশপাশের এলাকায় ঘুরতে থাকল ওটাকে একবার দেখবার আশায়।

যদিও তাকে দেখা কিংবা তার পরের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর ছিল না।

গুজব সত্যি হলে, সূর্যের শেষ সোনালী আলো মরে না যাওয়া পর্যন্ত উপরতলার জানালাগুলো গলে বেরুতে পারত না সে।

হেসে উড়িয়ে দিলেও শহরবাসীরা গভীর আগ্রহ, উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করত, কখন বিশাল ডানা ঝাপটে টেক্সাসের আকাশে ভাসবে বাদুড় মানব।

কারও কারও দাবী, চাঁদহীন রাতেই কেবল তাকে দেখা যেত। তাই অনেকে ধরে নিয়েছিল, সে মোটেই জীবিত কোনও প্রাণী নয়, বরং মৃত্যুর ওপার থেকে আসা কিছু।

শহরের এক যুবতী যে কাহিনি শুনিয়েছে তা রীতিমত ভীতিকর।

শহরের এক বাড়ির তিনতলায় থাকে সে। একরাতে হঠাৎ জানালার ধার থেকে কী এক শব্দে চমকে যায়। তারপরই যা দেখল, চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। বিশাল বাদুড় মানব জানালায় আঁচড়াচ্ছে। ইশারায় ভিতরে ঢুকতে দেয়ার অনুরোধও করছে। আতংকিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। তখনই

www.blogye.com

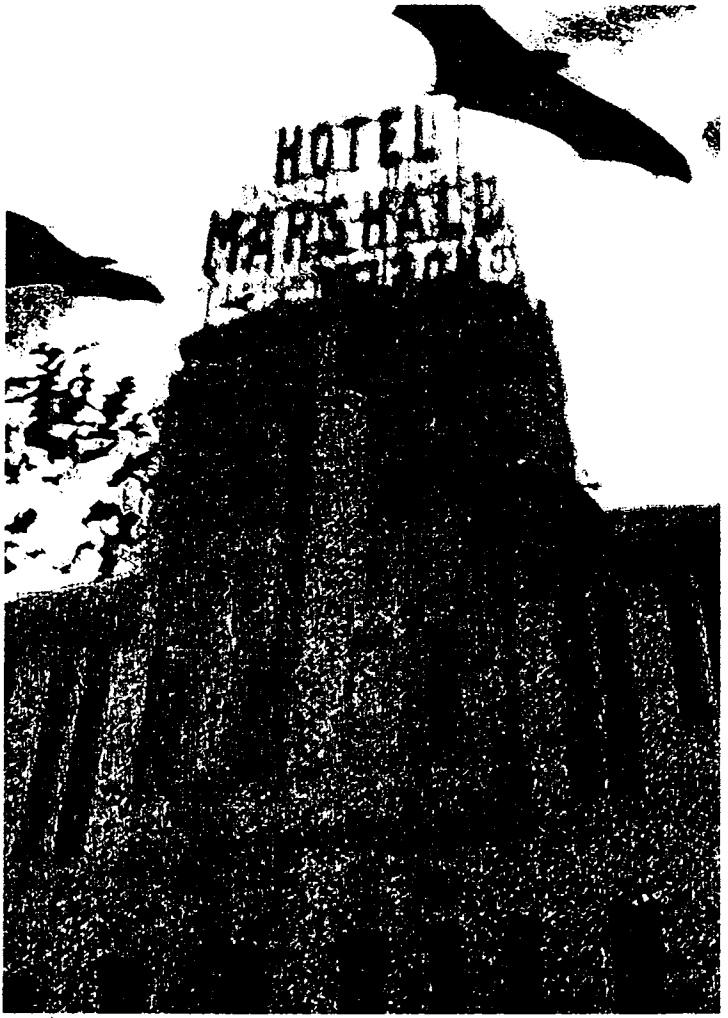

বাদুড় মানব আস্তানা গেড়েছিল হোটেল মার্শালে।

www.blogye.com

ডানা ঝাপটে অদৃশ্য হলো বাদুড় মানব।

অথচ মার্শাল হোটেলের ইতিহাস কিন্তু মোটেই ভুতুড়ে নয়।

ওখানে এমন কিছু ঘটেনি যার সঙ্গে বাদুড় মানবের আবির্ভাবের যোগ থাকতে পারে।

১৯২৯ সালের দিকে তৈরি হয় ওই হোটেল।

'দ্য মার্শাল' নামে পরিচিত ওই হোটেল ছিল পুব টেক্সাসের পেথিভিজ হোটেল কোম্পানির তিনটি হোটেলের একটি। এখন পুব টেক্সাসে গেলে যে মার্শাল হোটেলটি চোখে পড়বে, সেটি পুরনো মার্শাল হোটেল নয়।

পুরনো মার্শাল হোটেলটি ছিল ওটার ঠিক পাশেই।

এখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিন অট্টালিকা।

একটা একদা সুন্দরী ক্যাপিটাল হোটেল।

আরেকটা সত্যিকারের মার্শাল হোটেল, যেখানে একসময় ঠাঁই গেড়েছিল ভুতুড়ে বাদুড় মানব।

তবে সংস্কারের পর আগের চেহারার কিছুই অবশিষ্ট নেই ওই হোটেলের।

বিংশ শতাব্দীর মাঝে পুরনো মার্শাল হোটেল ছিল পুব টেক্সাসের আকর্ষণীয় স্থানগুলোর একটি।

১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে শহরের সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জায়গা হিসাবে হোটেল মার্শাল ছাড়া আর কিছুর নাম ভাবাই যেত না।

কিন্তু পরের বছরগুলোতে ধীরে ধীরে এর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে থাকে। আগ্রহ হারাতে থাকেন বিনিয়োগকারীরাও।

১৯৭৩ সালে ইস্ট টেক্সাস ব্যাপ্টিস্ট ইউনিভার্সিটি ওটা কিনে নিয়ে ছাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহার শুরু করে।

কিন্তু নতুন ছাত্রাবাস করবার পর কিছুদিনের শেষে পরিত্যক্ত হয় হোটেল মার্শাল। আশি ও নব্বুইয়ের দশকে কয়েকবার সংস্কারের চেষ্টা হলেও নানা কারণে মুখ থুবড়ে পড়ে পরিকল্পনা।

www.blogye.com

আর হোটেলের ভগ্ন অবস্থার সুযোগ নিয়েই ওখানে আস্তানা গাঁড়ে বাদুড়ের দল। তবে পরে জেরি কারগিল নামের স্থানীয় এক মানী ব্যক্তি এর সংস্কার করেন।

এখন বিয়েসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় ওই দালানে।

বাদুড় মানব সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি যাঁরা জানেন, তাঁদের একজন লিসা লি হার্প।

জিটারবার্গস্ নামে লিসার দারুণ জনপ্রিয় এক রেস্টুরেন্ট আছে।

গত শতকের নব্বইয়ের দশকে দোকানের ব্যবসা তুঙ্গে থাকায় প্রায় রাত তিনটা-চারটা পর্যন্ত খোলা রাখতে হতো।

এসময় বিভিন্ন খদ্দেরের কাছ থেকে ডেভিল ব্যাট ম্যান নিয়ে নানা চমকপ্রদ কাহিনি শোনেন লিসা।

একরাতে যেমন এক লোক এলেন তাঁর দোকানে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে লিসাকে শোনালেন, তিনি এবং কয়েক বন্ধুর মার্শাল হোটেলে দারুণ রোমাঞ্চকর অভিযানে গিয়েছিলেন। ওই কাহিনি বলবার সময় দুই চোখের মণি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল তাঁর।

হোটেলের সাততলায় বাদুড় মানবকে শুয়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। কেবল দুই আঙুল দিয়ে ঝুলছিল ভয়ঙ্কর প্রাণীটা। তাঁদের দেখেই ঘুম ভেঙে যায় ওটার। হিসহিস শব্দ করে রক্ত-লাল চোখদুটো মেলে তাঁদের দিকে তাকায়। আতঙ্কে পড়িমড়ি করে ছুট লাগান সবাই। বাদুড়ের দলের বিষ্ঠা ও পরিত্যক্ত ভবনের ইট-পাথরের ভাঙা টুকরো মাড়িয়ে কে কার আগে ওই নরক থেকে বেরুতে পারবেন, তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। একজন আরেকজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তবে শেষপর্যন্ত কোনও অঘটন ছাড়াই বেরুতে পারেন মার্শাল থেকে।

এমনিতে এসব গল্প শুনতে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন, এসব পাত্তা দেয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না লিসা।

www.blogye.com

তারপরই ঘটে ঘটনাটা।

এখনও ওটার কথা ভাবলে বুক কাঁপে তাঁর।

সেদিন পুরনো কাস্টোমার জোসেফ বেকার মটর সাইকেল ছুটিয়ে এলেন। জিটারবার্গসের দরজার সামনে এসে জোরে ব্রেক কষলেন, রাস্তায় আগুনের ফুলকি ঝরতে দেখলেন লিসা।

বেকারের পুরো শরীর রক্ত ও বাদুড়ে ঢাকা। কোনওমতে যা বললেন, তা থেকে মোটামুটি ঘটনা উদ্ধার করতে পারলেন লিসা। সবুজ মটরসাইকেলটা চালিয়ে হাইওয়ে ৫৯ ধরে আসছিলেন ভদ্রলোক। ট্রাভিস স্ট্রিটের দিকে যখন মোড় নিচ্ছেন, তখন বাদুড়ের একটা দল হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপর। ভয়ে, আতংকে বেকারের তখন মাথা খারাপ অবস্থা। প্রচণ্ড গতিতে মটর সাইকেল ছুটাতে লাগলেন, ওগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য।

নর্থ ওয়াশিংটন স্ট্রিটে যখন ঢুকলেন, বাদুড়ের দল সঙ্গেই আছে। উড়ছে, আবারও এসে গায়ে বসছে

এত আদরের মোটর সাইকেল ফুটপাতে তুলে দিলেন বেকার। অসংখ্য জীবিত বাদুড় তখন ছটফট করছে তাঁর শরীরে

এদিকে মোটর সাইকেলের নীচে চাপা পড়ল শত শত বাদুড়। রক্তে লাল হয়ে গেছে ফুটপাত। কোনওমতে দু'চাকার গাড়ি ছুটিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছেন।

তারপরই চিৎকার করতে করতে শরীর থেকে জ্যান্ত বাদুড় ঝাড়তে ঝাড়তে রেস্তোঁরার ভিতরে ঢুকে পড়লেন বেকার।

একটু ধাতস্থ হওয়ার পর যখন তাঁর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বলছেন, তখনই একটা অবাক করা তথ্য দিলেন

রাতে বাদুড়ের দল যখন আকাশ থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন আধা মানুষের মত দেখতে ভয়ানক এক প্রাণীকে রাস্তার পাশে ঝুলতে দেখেছেন।

এদিকে ডেবি ফুলার নামে রেস্তোঁরার আরেক নিয়মিত খদ্দর

www.blogye.com

জানান, তিনি যখন জিটারবার্গসের দিকে আসছিলেন, বিদ্যুতের তারে ঝুলতে থাকা শত শত বাদুড় তাঁকে নিশানা করেই মল ত্যাগ করতে থাকে। তাঁর পুরো মাথা ভরে যায় ওদের আবর্জনায়।

ডেবি লিসাকে বললেন, গাছে ঝুলে থেকে এখানকার লোকেদের মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে ওই বাদুড়েরা।

শুধু তাই নয়, ডেবির বিশ্বাস, ওই বাদুড়গুলো সবসময় তাঁর দিকে নজর রাখে। আর ওই প্রাণীগুলো কারও করুণ মৃত্যুর আগাম সংকেত দেয়, তাদের বার বার দেখা দিয়ে।

তারপরই একদিন কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী দাবী করলেন, বার্লেসন স্ট্রিটে বাদুড়ের ঝাঁক ঘিরে থাকা অবস্থায় ডেবিকে পড়ে থাকতে এবং চিৎকার করতে শুনেছেন তাঁরা।

যদিও পরে ওই ঘটনার কথা সরাসরি অস্বীকার করেছেন মহিলা।

তবে সিনডি বার নামে তাঁর এক বান্ধবীর কাছে অন্য এক কাহিনি বলেন তিনি।

ডেবি জানান, নরকের প্রহরী বাদুড় মানব এসে তাঁকে বলেছে, শহরের পরের যে মানুষটি মরবে সে আর কেউ নন, তিনি। এক রাতে ডেবি স্বপ্ন দেখেন যে জিনিসটা মার্শাল হোটেলে আছে, সে তাঁকে ডেকেছে অনেক কিছু বলবার জন্য।

তারপরই ডেবি ছুটে যান মার্শাল হোটেলে। বাদুড়ের মলের পুরু গালিচা মাড়িয়ে মার্শাল হোটেলে যাবার পর কী ঘটেছে, তা কখনোই বান্ধবীকে বলেননি ডেবি।

তবে এর কয়েকদিন বাদেই ভয়াবহ এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান ডেবি ফুলার।

তাঁর তন্বী দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায় মাথা।

যাঁরা ঘটনাস্থলের আশপাশে ছিলেন, তাঁরা বলেন কয়েক গজ দূরে মহাসড়কে পড়ে ছিল ওটা।

www.blogye.com

ডেবির উদ্ধার করা হাতব্যাগে একটা নোট পাওয়া যায়।

কারও কারও দাবী ওটা স্বয়ং বাদুড় মানবের লেখা।

আর এসময় নাকি দুর্ঘটনা কবলিত গাড়িভরা ছিল মৃত বাদুড়ে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে যেদিন সমাধিস্থ করা হলো ডেবিকে, সেদিনের কথা ভুলতে পারবেন না অনেকেই।

সূর্যাস্তের সময় মার্শাল হোটেল থেকে দলে দলে বাদুড় এসে উড়তে থাকে গোরস্থানের উপর।

গোরস্থানের তত্ত্বাবধায়ক দেখেন, ওগুলোর মনোযোগ ডেবির কবরের দিকেই।

অন্ধকার নামবার পর ওই কবরের চারপাশেই জমায়াত হতে থাকে বাদুড়ের দল।

তাঁর কথার সত্যতা মেলে পরদিন, যখন উৎসুক জনতার অনেকে গোরস্থানে গিয়ে দেখে সমাধি ঢেকে আছে বাদুড়ের মল ও আবর্জনায়।

তবে হতভাগিনী ডেবি ফুলারের কাহিনি এখানেই শেষ নয়।

অনেকে তাঁর প্রেতাত্মাকে দেখবার কথা বলেন।

৮০ নম্বর মহাসড়ক ধরে হারানো মুণ্ডুর খোঁজে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে এক কমনীয় দেহকে।

আবার, জীবন্ত বাদুড়দের পিছু তাড়া করতেও তাঁকে দেখেছেন কেউ কেউ।

ডেবি ফুলার মারা গেছেন অনেক বছর, নতুন করে কেউ বাদুড় মানবকেও দেখেছেন এমনও নজির নেই

কিন্তু মার্শাল হোটেলের সঙ্গে অমর হয়ে গেছে ডেবি ফুলার ও বাদুড় মানব

www.blogye.com

রাস্তার আতংক

এমনও সব রাস্তা আছে, রাত হলেই যেগুলো হয়ে ওঠে পথচারী কিংবা পর্যটকদের আতংকের এক প্রতিশব্দ।

এসব পথে পথচারীদের ভয়ংকর সব অভিজ্ঞতা হয়েছে। দেখা যায় ভুতুড়ে গাড়ি, অনেক আগে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেয়া কারও প্রেতাত্মা— আরও কত কী!

এ ধরনের কিছু পথের গল্প নিয়ে 'রাস্তার আতংক'।

ক্ষুধার্ত আত্মা

সিংগাপুরের কলাম আয়েরের বাসিন্দারা এ গল্প ভালমতই জানে।

কয়েক দশকের পুরনো কাহিনি।

এক সাইকেল চালকের গল্প।

একবার বেশ রাত করে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিল এক যুবক। সঙ্গে ছিল রাতে খোলা থাকে এমন এক দোকান থেকে কেনা কিছু খাবার।

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের উপর বামহাত দিয়ে চেপে প্যাকেট ধরে রেখেছে সে।

সেসময় ওই এলাকার প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সব সাইকেলারোহী যে ধরনের সাইকেল চালাত, তা পরিচিত ছিল ভদ্রলোকের সাইকেল নামে।

ওই ভারী সাইকেলগুলোর পিছনে বেশ বড় আসন থাকত। সাধারণত হালকা খাবার-দাবার নেয়ার জন্য ওটা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর সদ্ব্যবহার করত কোনও যাত্রী।

ট্রাফিক পুলিশরা কখনোই এভাবে যাত্রীবহনকে উৎসাহিত করত না।

তবে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো এমন মানুষের অভাব ছিল না তখনকার সিংগাপুরেও।

কলাম আয়েরের কাছে চলে এসেছে, এমনসময় সাইকেল চালকের মনে হলো পিছনে হঠাৎই বাড়তি ওজন চেপে বসেছে।

যেন কেউ লাফিয়ে চড়ে বসেছে সাইকেলের পিছনে।

অপ্রত্যাশিত এই উপস্থিতিতে ভীষণ চমকে উঠল সে।

এদিকে এতই ভয় পেয়েছে, পিছন ফিরে দেখবার সাহসও নেই। ঘাড়ের পিছনে শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল যুবকের। কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখবার চেষ্টা করল। আগের মতই স্বাভাবিকভাবে সাইকেল চালিয়ে যেতে লাগল।

যেন ভয়ই পায়নি। তার মনে পড়ল, বাবা সাবধান করেছে, এমন পরিস্থিতিতে আতংকিত হয়ে পড়লেও তা কোনওভাবেই বুঝতে দেয়া চলবে না।

পিছনের ভারী বোঝা নিয়ে প্যাডেল মারতে কষ্ট হচ্ছে যুবকের।

এমনসময় রাস্তার এক বাতির নীচ দিয়ে যাবার সময় পিছন থেকে কালো, লোমশ এক হাত এগিয়ে এল। চোখের সামনে এক মহিলার হাতের তালু দেখল সাইকেল চালক।

তারপরই শুনল ভারী কণ্ঠ, করুণ সুরে বলছে, 'তুমি কি আমায় কিছু দেবে না?'

পথে বিপদ

এবারের কাহিনিটি জানিয়েছেন স্বস্তিকা নামের এক ভারতীয় তরুণী:

'এটা আসলে আমার দাদার অভিজ্ঞতা। দক্ষিণ-ভারতের কোদাইকানাল শহরের ধারে এক গ্রামে বাস করতেন তিনি।

'১৯৫০-এর দশকে খরা হয় ওই এলাকায়। সঠিক বছর মনে রাখতে পারেননি তিনি।

www.blogye.com

'তাঁর বয়স তখন একুশ-বাইশ।

'তাঁদের গ্রামে খরার ভাল প্রভাব পড়েছে। কৃষকরা যেসব শস্য চাষ করেছে, সব নষ্ট হয়ে গেছে সেচের পানির অভাবে। এদিকে সে সময়ে খাবারের আর কোনও উৎস ছিল না। বাধ্য হয়ে খরার কবলে পড়েনি, দূরের এমন কোনও গ্রাম থেকে খাবার আনতে হতো প্রতি সপ্তাহে।

'দাদার ভাই-বোনেরা পালা করে একেকবার একেকজন দায়িত্বটা পালন করতেন।

'তো এক সপ্তাহে দাদার পালা পড়ল। যে গ্রাম থেকে দাদা খাবার আনতেন, তা বেশ দূরে। তখন যাতায়াত ব্যবস্থা এখনকার মত ভাল ছিল না। পায়ে হেঁটে যেতে হতো।

'মোটামুটি ঘণ্টা আড়াইয়েক লাগত সেখানে পৌঁছতে। তবে দাদা কষ্ট করতেন হাসি-মুখেই। কারণ ওই গ্রামে তাঁর বেশ ক'জন বন্ধু থাকতেন। বেশ কিছুটা সময় তাঁদের সঙ্গে গল্প করে তবেই ফিরতেন।

'অন্যবারের মত বেশ সকাল সকালই বেরুলেন দাদা। গ্রামে পৌঁছে কেনাকাটাও সেরে নিলেন। তারপর দোস্তদের একজনের বাসায় গিয়ে গল্প-গুজব করলেন। দুপুরের খাবারও সেখানেই সারলেন। তারপর আরেক বন্ধু এলেন ওখানে। বন্ধুটি জানালেন, নতুন এক সরাইখানা কিনেছেন তাঁরা।

'ওই গ্রামের অবস্থান এমন জায়গায়, শহরে যাওয়ার পথে অনেকে রাত কাটায় ওখানে। কাজেই আশা আছে হোটেল-ব্যবসা বেশ লাভজনক হবে। দাদার বন্ধুটি তাঁর হোটেলটা এক চক্কর ঘুরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদেরকে।

'কাজেই তিনজন মিলে সেখানে চলে গেলেন। আর তিন বন্ধু মিললে যা হয়, তাই হলো। হাসি-ঠাট্টা, গল্পে কখন যে সময় চলে গেল, টেরই পেলেন না।

'যখন টনক নড়ল, তখন বাজে রাত দশটা।

www.blogye.com

'দেরি না করে উঠে পড়তে চাইলেন দাদা। কিন্তু এত রাতে তাঁকে বিদায় দিতে ঘোর আপত্তি জানালেন বন্ধুরা।

'যে বন্ধু হোটেলের মালিক, তিনি বললেন হোটেল বা তাঁদের বাড়িতে রাত কাটিয়ে যেতে। সকালে বরং বাড়ির উদ্দেশে রওনা হতে পারবেন দাদা। তারপরই কেন আমার দাদার রাতে বেরুনো উচিত হবে না, তা বোঝাতে মোক্ষম যুক্তি দেখালেন। বললেন, তাঁদের গ্রামের আশপাশে এক আত্মার খুব উপদ্রব দেখা দিয়েছে। আর দাদাকে যে পথে তাঁর গ্রামে যেতে হবে, ওখানেই প্রায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে অশুভ জিনিসটাকে। গ্রামের অনেক লোক ইতিমধ্যে তাকে দেখেছে। সাদা পোশাকের লম্বা চুলের এক নারী সে। এমন কী হোটেলে কাজ করা লোকেরা রাতে দরজার ফুটো দিয়েও দেখেছে। রাতে একা বাড়ি থেকে বেরুতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না গ্রামের লোকেরা। কিছুক্ষণ আগে কী এক কাজে হোটেলে আসা এক লোক কয়েক শ গজ দূরে তাঁর বাড়িতে যেতেই ভয় পাচ্ছেন।

'এদিকে ছোটবেলা থেকেই ভূত-প্রেত এসবে মোটেই বিশ্বাস নেই দাদার। কাজেই বন্ধুদের ওই কাহিনিকে হেসে উড়িয়ে দিলেন তিনি। তারপর তাঁদেরকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই হাঁটা ধরলেন।

'এদিকে হোটেলে বসে থাকা গ্রামের লোকটা দাদাকে দেখে সাহস পেলেন। দাদার পিছু পিছু রওনা হলেন তিনি। তাঁর বাড়িটা গ্রামের কিনারে। আর ওই বাড়ি পেরিয়ে যেতে হবে দাদাকে।

'পথে লোকটা দাদাকে ভূতটার কাহিনি শোনালেন। দাদা এমনিতে এসব বিশ্বাস না করলেও লোকটার গল্পে বাধা দিলেন না। সত্যি বলতে, এসব শুনতে ভালই লাগে তাঁর।

'লোকটা জানালেন, কিছুদিন আগে বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে গ্রামের এক মহিলা মারা যান। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর শিশুটিকে নিয়ে মহিলার স্বামী কিছু দূরের অন্য এক গ্রামে চলে যান। সম্ভবত

www.blogye.com

স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে এ জায়গাকে অশুভ মনে হচ্ছিল তাঁর। তারপর থেকেই রাতে গ্রামের আশপাশে এক নারীকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে অনেকে। আর সে নাকি দেখতে অবিকল মৃত মহিলার মতই। গ্রামবাসীর বিশ্বাস, বাচ্চাটাকে খুঁজে না পেয়ে খেপে আছে ওটা। আর এখন ভূতের সামনে পড়া মানেই নিশ্চিত বিপদ। নিজের সন্তানকে খুঁজে না পাওয়ায় যাকেই দেখবে তার উপর প্রতিশোধ নেবে।

'হাঁটতে হাঁটতে যখন তাঁরা লোকটির বাড়ির সামনে চলে এলেন, দাদাকে সিদ্ধান্ত বদলে ওখানে রাত কাটিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তিনি।

'জবাবে দাদা কেবল মৃদু হাসলেন, তারপর আবার হাঁটা ধরলেন।

'দাদাকে এক উপত্যকার ভিতর দিয়ে বহুদূর গিয়ে, তারপর পেঁচালো এক পথ ধরে পাহাড়ে উঠতে হবে। যখন উপত্যকায় পৌঁছেছেন, ততক্ষণে প্রায় মধ্যরাত। এসময় কোনও জানান না দিয়েই উপত্যকার মাঝে হাজির হলো এক সাদা অবয়ব।

'গোড়ার দিকে ওটাকে পাত্তা দিলেন না দাদা। কিন্তু যতই কাছাকাছি হলেন, ছায়ামূর্তিটাকে নারী মনে হতে লাগল তাঁর। চাঁদের আলোয় আবছা দেখা গেল কাঠামোটা। হাতে টর্চ থাকলেও অজানা কোনও কারণে ওটা জ্বালেননি দাদা।

'যখন বেশ কাছাকাছি হলেন, নারী অবয়বের দিকে ভালভাবে তাকালেন। তখন দেখলেন পরিষ্কারভাবে।

'মধ্য বয়স্কা নারী, পরনে সাদা পোশাক। লম্বা, কালো চুল। বন্ধুর দেয়া মৃত মহিলার বিবরণের সঙ্গে খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। এবার একটু ভয় পেতে শুরু করলেন দাদা।

'বলে রাখা ভাল, দাদার কোনও নেশার অভ্যাস নেই। তা ছাড়া, সাহসী হিসাবে গ্রামে সুনাম আছে। আর এমন মানুষের ঘাবড়ে যাওয়া মোটেই সাধারণ বিষয় নয়।

www.blogye.com

'তাঁর মনে হলো, যেভাবে হোক ওই মহিলার নাগালের বাইরে থাকতে হবে। ভয়টা ভীষণ আতংকে রূপ নেয়ার আগেই দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন দাদা।

'শ্বেত নারীমূর্তি ছিল রাস্তার অপর পাশে। কোনও অঘটন ছাড়াই তাকে অতিক্রম করে গেলেন দাদা। কিন্তু পিছু ফিরতেই আঁৎকে উঠলেন, ওটা অনুসরণ করছে তাঁকে!

'দাদা আঁকাবাঁকা, সরু রাস্তা ধরে পাহাড়ে চড়ছেন। রাস্তার দুই পাশে খাদ। একটু এদিক-সেদিক হলেই কয়েক শ ফুট নীচে গিয়ে পড়তে হবে। একইসঙ্গে দ্রুত ও সাবধানে হাঁটবার চেষ্টা করতে হচ্ছে। পিছন পিছন ওটাকে আসতে দেখে ঝুঁকি নিয়ে হাঁটবার গতি আরও বাড়ালেন দাদা। কিন্তু একটু পর টের পেলেন, দূরত্ব বাড়ার বদলে কমছে ব্যবধান।

'রীতিমত আতংকিত হয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন দাদা। আর তার ফাঁকে পিছু ফিরে দেখছেন। ওটাও গতি বাড়িয়েছে তাঁর মত। মিনিটখানেক দৌড়েছেন, এমনসময় ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল কিছু। এতই জোরে, পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন দাদা। ভাগ্য ভাল, কোনওমতে একটা গাছের শিকড় ধরে পতন ঠেকাতে পারলেন। তারপর কোনওমতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আবারও উঠে এলেন রাস্তায়। তবে এখন আর সাদা ভৌতিক কাঠামোটা দেখতে পেলেন না। তারপর যত দ্রুত সম্ভব দৌড়ে, জোরে হেঁটে গ্রামে ফিরলেন। কাউকে কিছু না বলে বিছানায় শরীর ছেড়ে দিলেন। তারপরই অন্ধকার নেমে এল দু-চোখে।

'যখন সকালে তাঁর দিকে খেয়াল হলো বাড়ির অন্যদের, প্রচণ্ড কাঁপছেন তিনি, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর।

'সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয়, তাঁর ঘাড়ের পিছন লাল হয়ে আছে, মানুষের হাতের আঙুলের ছাপও চোখে পড়ছে, যেন জোরে চড় কষেছে কেউ!

www.blogye.com

'পরে দাদার ভাইয়েরা গিয়ে তাঁর কেনা খাবারগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন পথে। এক ওঝা এনে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করলেন দাদার পরিবার।

'কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য ধাক্কা কাটিয়ে আগের মতই সুস্থ হয়ে উঠলেন দাদা।

'এ কাহিনি যতবার বলেন দাদা, ভয়ে কেঁপে উঠি আমি। কিন্তু আশ্চর্য, এখনও ভূতের গল্প শুনলে হেসে ওঠেন দাদা।'

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

এবারের কাহিনিটি বলেছেন মি. টি. জে. ওয়েস্ট্রপ।

আয়ারল্যাণ্ডের ডিয়ারপার্কের ব্রে থেকে উইণ্ডগেটসের দিকে যাওয়া রাস্তাটা বেশ রহস্যময়। এখানে ব্যাখ্যার অতীত নানা ধরনের ঘটনা ঘটে। অনেকেই অদ্ভুত সব শব্দ শোনেন। কেউ আবার অস্বাভাবিক কিছু দেখবার দাবিও করেছেন। ওয়েস্ট্রপের নিজের অভিজ্ঞতাটি উনিশ শতকের শেষভাগের। ব্রে স্টেশনে যাচ্ছিলেন রাতের ট্রেন ধরবার জন্য, এক বন্ধুসহ। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। এমনসময় ভারী পদশব্দ আর ডিয়ারপার্কে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ পেলেন দুজনেই। যেন কেউ একজন গেট টপকে এসে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের ব্রে হ্যাডের দেয়াল থেকে নীচে পড়েছে। গাছের ডাল ভাঙার শব্দ ও মৃদু গোঙানি তাই প্রমাণ করে। মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে, জেঁকে বসেনি রাতের অন্ধকার।

দেয়ালের উপর থেকে যেখান থেকে শব্দ এসেছে মনে হয়েছে, সেদিকে চেয়ে কিছু দেখতে পেলেন না তাঁরা। দুজনেই ধরে নিলেন অন্য কোথাও থেকে আসা আওয়াজ এমন বিভ্রান্তির

www.blogye.com

জন্ম দিয়েছে মনে। কে না জানে, রাতে শব্দ অনেক দূর থেকেও শোনা যায়!

কয়েক বছর বাদে গল্প করতে গিয়ে গুরুত্বহীনভাবেই কয়েক আত্মীয়কে ঘটনাটি বলেন মিস্টার ওয়েস্ট্রপ। তখনই শোনেন তাঁর এক আত্মীয়, যিনি আবার ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক, এ শব্দ শুনেছেন। স্থানীয়দের বিশ্বাস ওটা এখানকার এক চোরাশিকারীর প্রেতাত্মা। একজন বনরক্ষীর গুলি খেয়ে মারাত্মক আহত লোকটা পালানোর সময় ডিয়ার পার্ক এলাকায় মারা পড়ে। পরে ওয়েস্ট্রপ ওই আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল খুঁজে পান।

তবে ট্রিনিটি কলেজের ওই অধ্যাপক এক ছায়ামূর্তিকে দেখেন।

গ্রেস্টোননসের পাদ্রী ভদ্রলোকও জানান রাস্তাটা ভুতুড়ে।

ওখানে রাতে মাঝে মাঝেই কারও ছুটে পালানোর আওয়াজ পান তিনি, তবে কাউকে দেখেননি।

রাতের বিভীষিকা

এবারের কাহিনি সিংগাপুরের ৩২ বছর বয়স্ক এক আইনজীবীর।

শুনব তাঁর মুখ থেকেই।

'এ ঘটনাটি ঘটেছে বছর কয়েক আগে। বেশ বড় ছুটি পেয়েছিলাম। তাই আমি ও আমার দুই চাচাত ভাই মিলে ঠিক করলাম, ছুটিতে গাড়ি নিয়ে কুয়ালালামপুর চলে যাব। সেখানে আমাদের এক আত্মীয় থাকেন। এক চাচাত ভাইয়ের টয়োটা করোলাতে চেপে রওনা দিলাম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।

www.blogye.com

'প্রথমে গাড়ি চালানোর ভার চাপল আমার উপর।

'স্বাভাবিকভাবেই দারুণ খোশ মেজাজে আছি আমরা। হাসি-ঠাট্টা ও আড্ডায় কাটছে সময়। এভাবে একসঙ্গে তিনজন অবিবাহিত মানুষ সহজে একত্র হয় না।

'সন্ধ্যাটা চমৎকার। আকাশ পরিষ্কার, ঝিকমিক করছে তারা।

'একসময় এয়ার হিতাম অতিক্রম করল আমাদের গাড়ি।

'এই পর্যায়ে হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেলাম তিনজনই। আসলে বলবার মত নতুন কোনও কৌতুক কিংবা কাহিনি হাতড়াচ্ছি সবাই মনে মনে।

'এসময় রিয়ার ভিউ মিররে পিছনের সাদা টয়োটার দিকে নজর গেল আমার। কিছুক্ষণ খেয়াল করতেই পরিষ্কার হয়ে গেল নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে আমাদের অনুসরণ করছে ওটা।

'কখনও আমাদের বেশি কাছে আসছে না, আবার ব্যবধান বাড়তেও দিচ্ছে না।

'তারপরও শুরুতে বিষয়টা গুরুত্ব দিলাম না। এর মধ্যে আমার এক চাচাত ভাই আবার গল্প শুরু করেছে।

'একটু পরে আবার সাদা গাড়ির কথা মনে হতেই রিয়ার ভিউ মিররে চোখ চলে গেল। হ্যাঁ, এখনও আছে। তারপর থেকে গাড়ি চালানোর ফাঁকে বারবার পিছনের দিকে দৃষ্টি গেল ওটা আমাদের পিছু পিছু আসছে। তবে আশ্চর্য বিষয় হলো, যখনই কোনও টোল বুদের কাছে আসছি, অদৃশ্য হচ্ছে ওটা টোল বুদ পেরুবার পর আবারও দেখছি সাদা গাড়িটাকে। তখনও ঠিক আগের ব্যবধান রেখেই আমাদের অনুসরণ করছে

"অ্যাই, তোমরা কি পিছনের সাদা গাড়িটাকে দেখেছ?" চাচাত ভাইদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম।

'একই সঙ্গে ঘাড় ঘোরাল দুজন।

' "হ্যাঁ, কিন্তু হয়েছে কী?" জানতে চাইল পিছনে বসা চাচাত ভাইটি। তার চোখ এখনও সাদা টয়োটার দিকে

www.blogye.com

"এয়ার হিতাম থেকে শুরু করে পুরো পথ অনুসরণ করে এসেছে। পাশ কাটিয়ে কেন যাচ্ছে না?" প্রশ্ন করলাম।

' "কেন?" সামনের সিটে বসা ভাইটি বলতে শুরু করল, তারপরই আমার চেহারার উৎকণ্ঠা নজরে পড়ল তার। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। তার সঙ্গে যোগ দিল অপরজন।

'তবে আমি মোটেই ভারমুক্ত হতে পারলাম না। কারণ পিছনের গাড়ি গতি বাড়িয়েছে।

'দ্রুত আমাদের গাড়ির পাশে চলে এল। তারপর পাশাপাশি চলতে লাগল। তবে আমাদের অতিক্রম করে গেল না।

'ঠিক একই গতিতে আমাদের ডান পাশেই থাকল সাদা গাড়িটা।

'ভিতরে কে বা কারা আছে দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গাড়ির কালো জানালার ভিতর দিয়ে চোখ গেল না।

'হঠাৎ গাড়ির গতি কমিয়ে দিলাম, ওটাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে। কিন্তু আঠার মত পাশেই সেঁটে থাকল।

'এবার হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিলাম, ওটা কী করে দেখবার জন্য। ঠিক একইসময় গতি বাড়াল সাদা টয়োটা, আর ঠিক একইভাবে। যেন আমার মনের কথা পড়ছে ওটার চালক।

' "ওই লোকটা কী করছে?" সামনের আসনে বসা আমার ভাইটি নীরবতা ভাঙল। একপলক তার দিকে তাকালাম, চেহারায় চিন্তার রেখা।

' "তোমার কী মনে হয়?" তার মনের কথা জানতে জিজ্ঞেস করলাম।

'ডানপাশের সাদা গাড়িটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "ভেবে দেখ বছর কয়েক আগে মালয়েশিয়ান পুলিশ হাইওয়ের ডাকাতদের ধরতে কেমন আদাজল খেয়ে লেগেছিল। ওরা শুধু সিংগাপুরের গাড়িগুলোকে আক্রমণ করত।"

'তারপর ভাইটি রাস্তা থেকে আমার দিকে যখন মুখ ফেরাল,

www.blogye.com

বলল, "আশা করি আমাদের ওই একই সমস্যায় পড়তে হবে না।"

'তারপর মুখে কুলুপ এঁটে দিল ও।

'তার দিকে চাইলাম। জোর করে অশুভ সাদা গাড়ি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে চাচ্ছি। আমি জানি, ওটা মোটেই আমাদের পাশ ছাড়েনি। আসলে গাড়িটার দিকে তাকাতেই ভয় পাচ্ছি এখন। ধীরে ধীরে অন্য একটা আশংকা দানা বাঁধছে আমার মনের ভিতর।

'একটা বিষয় চাচাত ভাইটির দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। একটা ডাকাত দল এত দীর্ঘ সময় ধরে কেন আমাদের অনুসরণ করবে? এয়ার হিতামের পর এত বিশাল রাস্তা পেরিয়ে গেল। কোনও যুক্তিই নেই তার। এত সময় একটা গাড়ির পিছনে ডাকাতদের ব্যয় করবার কারণ নেই। তারা এটাও নিশ্চিতভাবে জানে না গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে টাকা আছে কি না। সত্যি যদি লুটেরা হতো, অনেক আগেই হামলা চালাত।

'তা ছাড়া, আরেকটি বিষয় আমাকে অবাক করেছে।

'তা-হলো গাড়িটার আচরণ। খুবই অদ্ভুত। এ কেমন চালক যে প্রতি মুহূর্তে আমার মনের ভিতর কী চলছে বুঝবে?

'প্রতিটি টোল বুদের আগে কেন অদৃশ্য হয়ে যায়?

'আর বুদ পেরোনোর পর কোথা থেকে হাজির হয়?

'সন্দেহ নেই, বড় কোনও গোলমাল আছে গোটা বিষয়টাতে।

'এটা রীতিমত অস্থির করে তুলল আমাকে। ভয়ের কারণে আমার চিন্তাগুলো প্রকাশও করলাম না, পাছে আমার দুই ভাই আরও বেশি শংকিত হয়ে পড়ে।

'কাজেই আমরা চলতে লাগলাম। পাশে ছায়ার মত থাকল সাদা গাড়ি। আনন্দময় ছুটি যেন ধীরে ধীরে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠল। তারপর সামনে আবার এক টোল বুদ দেখলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তখনই বেকুবের মত কাজ করলাম। টোল তুলবার বুদ

www.blogye.com

দেখে আমরা এত শান্তি পেয়েছি, সাদা গাড়ি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ফেলেছি।

'তবে যা ভেবেছি তাই হলো, টোল বুদ পেরুনোর আগে ওই গাড়ি আর দেখতে পেলাম না।

'অবশ্য এই সুযোগে গাড়ির ড্রাইভার বদলে নিয়েছি আমরা। সামনের আসনে বসা আমার চাচাত ভাই চালক হিসাবে সবচেয়ে তুখোড়। কাজেই আমাকে বিশ্রাম দিয়ে হুইল নিজ হাতে তুলে নিল সে।

যে লোকটি টোল আদায় করছেন, তিনি মধ্যবয়স্ক এক মালয়ান লোক।

'তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আমাদের পিছনে সাদা এক গাড়ি দেখেছেন কি না। ভদ্রলোক কেবল বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, কোনও জবাব দিলেন না। সম্ভবত আমাদেরকে ডাকাত ভেবে বসেছেন।

'আবার যখন গাড়ি চলতে শুরু করল, তখন আমি ভারমুক্ত। কারণ সাদা গাড়ি নিয়ে ভাবতে হবে না। এখন গাড়ি চালাতে হচ্ছে না আমায়। এরপর এক কিলোমিটার গিয়েছি, এমনসময় রহস্যময় সাদা গাড়ি পাশে চলে এল

' "ওহ! আবার!" পিছনে বসা ভাইটি বলল মৃদু কণ্ঠে যেন জোরে বলতেও ভয় পাচ্ছে ও।

'আর কোনও কথা হলো না আমাদের মধ্যে।

'এমন কী এখন গাড়িটার দিকে তাকাচ্ছি না ভয়ে আশা করছি, সমস্যাটা নিয়ে না ভাবলে এমনিতেই সমস্যা চলে যাবে

'কিন্তু ওটা রাতভর আমাদের সঙ্গেই রইল, যতক্ষণ না সেরেমবানে পৌঁছালাম

'সেরেমবানে পৌঁছবার আগে, কোথাও অদৃশ্য হলো সাদা গাড়ি। মনে হলো একটা পাথর নেমে গেল আমাদের ঘাড় থেকে। তবে এবারও ঠিক কোনখানে ওটা অদৃশ্য হয়েছে, খেয়াল করিনি

www.blogye.com

একজনও। দুশ্চিন্তায় মোটামুটি বিধ্বস্ত অবস্থা আমাদের।

'একটা' বিরতি দিয়ে হালকা খাবার খাওয়ার পর পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির করলাম আমরা।

' "রাতে এখানে থাকা উচিত আমাদের," পিছনের সিটে বসা চাচাত ভাইটি মন্তব্য করল। তারপর যোগ করল, "থাকার একটা জায়গা বের করে রাতটা কোনওমতে কাটিয়ে দেব। সকালে আবারও কুয়ালালামপুরের দিকে রওনা হব। ...ঠিক আছে?" বলে সমর্থনের আশায় আমাদের দিকে তাকাল।

'আমার কাছে একে চমৎকার প্রস্তাব মনে হলো। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগে গাড়ির নতুন ড্রাইভার ভাইটি শক্তমুখে বলল, "বোকার মত কথা বোলো না। কুয়ালালামপুর কেবল এক ঘণ্টার পথ। চাচার বাসা মাত্র এক ঘণ্টার পথ, তা হলে এই শহরে কোন্ দুঃখে রাত কাটাব? তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?"

' "কিন্তু সাদা গাড়ির কী হবে?" জানতে চাইলাম আমি।

'আমার ভাই বলল, "তোমরা কী ভাবছ বলতে পারব না। আমার মনে হয় ওটা চলে গেছে। হয়তো সেরেমবানেই সাদা গাড়ির আরোহীরা আসতে চেয়েছিল। সম্ভবত রাস্তায় আমাদের গাড়ি দেখে মজা করবার লোভ সামলাতে পারেনি। আমাদের অস্বস্তিতে ফেলা ছিল ওদের লক্ষ্য। আর তোমরা বোকারা তাদের ওই ফাঁদে পা দিয়েছ।"

'আমার মনে হয় পুলিশকে রিপোর্ট করা উচিত,' বলল অপর চাচাত ভাই।

'মনে হলো এখানে রাত কাটাবার চিন্তা বাদ দিয়েছে সে। এ ব্যাপারে আর কথা বাড়ালাম না। কাপুরুষের মত সেরেমবানে থাকবার বায়না ধরব না, অন্য দুজনের কোনও সমস্যা নেই যখন।

' "হ্যাঁ, মনে হয় পুলিশে জানানোই উচিত," সমর্থন

www.blogye.com

জানালাম। তবে মনের ভিতর যে চিন্তার ঝড় বইছে, তা আর প্রকাশ করলাম না।

'আবার গাড়িতে উঠে সবচেয়ে কাছের পুলিশ স্টেশনের খোঁজ করলাম। ওটা বের করতে বেগ পেতে হলো না। কয়েকটা খাবার দোকানের পাশেই পুলিশ স্টেশন। মনে পড়ল চাচা বলেছিলেন, এ জায়গার নাম গ্লাটন স্কয়ার। মাঝারি আকারের পুরনো এক দালানে পুলিশ স্টেশন। ইদানিং রং করা হয়েছে। রাতের এসময়েও দালানের বাইরের আঙ্গিনায় গল্প করছে দেখলাম কয়েকজন পুলিশকে । গাড়ি থেকে নামতেই আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল তারা।

' "একটা অভিযোগ লিখতে চাই। কোথায় তা করব?' 'তাদের সামনে গিয়ে জানতে চাইলাম।

'একজন ছোট্ট বসবার কামরার দরজার সামনে রাখা এক টেবিলের দিকে হাত ইশারা করল।

'টেবিলের ওপাশে বসা লোকটাকে বললাম অভিযোগ লিখতে চাই।

'আমাদের এ গল্প কেউ বিশ্বাস করবে কি না, ভাবতে গেলাম না।

'কে কী ভাবল তাতে থোড়াই কেয়ার এতক্ষণ গাড়ি চালিয়ে আসা ভাইটির। আগাগোড়া পুরো কাহিনি বলে গেল সে। যখন ও বলছিল, বাইরে দাঁড়ানো তিন পুলিশ সদস্য শান্তভাবে ভিতরে ঢুকে আমাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনতে লাগল।

'একটু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, তারা একে-অপরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করছে।

'কথা শেষে ডেস্কের ওপাশে বসা সার্জেন্ট আমাদের দিকে তাকিয়ে আন্তরিকভাবে হাসল। "প্রথমবারের মত একে টয়োটা হিসাবে বর্ণনা করল কেউ।"

'তিনজন একে-অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

www.blogye.com

‘ “আপনি বলতে চাচ্ছেন...” গাড়ি চালিয়ে আসা ভাইটি বলা শুরু করল।

“এই রাস্তায় অনেক লোককেই রহস্যময় এক সাদা গাড়ি অনুসরণের ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, যে গাড়িটাকে অনুসরণ করে, সেটা সব সময় একই জাতের গাড়ি হয়। যদি গাড়িটা হয় মার্সিডিজ, তবে অনুসরণকারী গাড়ি হয় সাদা কোনও মার্সিডিজ। যদি হয় ওটা হোণ্ডা, মাজদা কিংবা যাই হোক না কেন, পিছু নেয়া গাড়িটা ওই একই জাতের হয়।

‘ “এ ধরনের অনেক অভিযোগ পেয়েছি আমরা। তবে কখনও রহস্যময় ওই গাড়িকে খুঁজে বের করতে, বা এমন কী চোখের দেখাও দেখিনি। আপনারা চাইলে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারেন, ওটা হবে পণ্ডশ্রম। আমার কথা শুনলে বলব, ছোট কোনও হোটেল বেছে রাতটা সেরেমবানে কাটিয়ে দিন। সকালে তরতাজা হয়ে গন্তব্যের দিকে রওনা হবেন।”

‘অন্য পুলিশ সদস্যরা মাথা নেড়ে সায় জানাল সার্জেন্টের কথায়। পুলিশ সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে ফিরলাম আমরা। কী করব বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ ঠায় বসে রইলাম সেখানে।

‘অস্বীকার করব না, ভয়ও করছিল বেশ। আমার হাতদুটো কাঁপছে। ভাইদের চোখ এড়াবার জন্য দুই হাত পকেটের ভিতর ঢুকিয়ে রাখলাম।

‘ “তাহলে এখন কী?” জানতে চাইলাম।

“আমরা চালিয়ে যাব,” একগুঁয়ের মত বলল গাড়ির ড্রাইভার চাচাত ভাইটি।

‘কেউ প্রতিবাদ করলাম না তার কথায়। আমরা ক্লান্ত, একই সঙ্গে ভীত। আমাদের আসলেই বিশ্রাম দরকার। বুঝতে পারলাম, নিঃসন্দেহে বোকার মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমরা।

www.blogye.com

'কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার রাজপথে উঠে এলাম।

'একটা কথাও বলছি না কেউ। যেন একটা শব্দ উচ্চারণ করলেই মহাসর্বনাশ হবে। কথা বললে যেন সাদা টয়োটার বেশে সেই অশুভ জিনিসটা আবারও চড়াও হবে আমাদের উপর।

'মিনিট পনেরো নির্বিঘ্নে কেটে গেল। তারপরই এক তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে হলো। আর তখনই ওটাকে দেখলাম।

'ওহ্! এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

'কয়েক শ গজ দূরে রাস্তায় আমাদের অপেক্ষা করছে সাদা টয়োটা। রাস্তার পাশে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ওটা। আর পাশে দাঁড়িয়ে আছে কেউ।

'আমার ভাই গাড়ির গতি কমাল। জানি না হঠাৎ এত সাহস কোথা থেকে পেলাম আমরা। কিন্তু তখন সবারই যেন নিয়তিকে একবার দেখবার ইচ্ছা হলো। হয়তো বা ওটা দাঁড়িয়ে থাকায় ভীতি কমে গেল আমাদের। আমরা নিশ্চিত ওটাই সেই গাড়ি।

'কাছাকাছি আসতে ছিটেফোঁটা সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

'হ্যাঁ ওটাই সেই অভিশপ্ত গাড়ি।

'আর ওটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সুশ্রী এক নারী, পরনে ধবধবে সাদা পোশাক। লম্বা, ঘন কালো চুল মুখের উপর এসে পড়েছে। সরাসরি আমাদের দিকে তাকাল মেয়েটা।

'গাড়ির একেবারে কাছে চলে এসেছি ততক্ষণে। হঠাৎ হাত তুলে আমাদের বুড়ো আঙুল দেখাল সে। একমুহূর্তের জন্য মনে হলো আমাদের গাড়ি থামবে, কারণ আমার চাচাত ভাই গাড়ির গতি আরও কমিয়ে দিয়েছে।

'সাদা গাড়ির ভিতরটা এবার পরিষ্কার দেখা গেল। তবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারব না। কী কারণে পারব না, তাও বলতে পারব না। তবে দুটো বিষয় বাদে। কুয়াশার এক চাদর ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর মনে হলো, লম্বা, কালো এক কাঠামো যেন পিছনের সিটে বসে আছে।

www.blogye.com

'শেষপর্যন্ত আমাদের গাড়ি থামল না। আমি ভয় পাচ্ছিলাম হয়তো ওটা থেমেই যাবে। পিছনের সিটে বসা ভাইটির দিকে তাকালাম। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা। সম্ভবত সেও ভেবেছে গতি কমাতে কমাতে গাড়ি হয়তো স্থির হবে। তবে কথা বললাম না কেউই।

'আমরা ওই গাড়ি পেরিয়ে চলে এলাম।

'আর দেখা দিল না সাদা গাড়ি।

'একসময় কুয়ালালামপুরে পৌঁছলাম আমরা, তবে সন্দেহ নেই জীবনের ভয়াবহতম ওই রাতের অভিজ্ঞতা কখনও ফিকে হবে না আমার মন থেকে।'

www.blogye.com

গোরস্থানে ভয় আছে

গোরস্থানের প্রতি মানুষের মজ্জাগত ভীতি আছে। তার উপর আবার যদি কোনও কবরস্থান ঘিরে অশুভ ও ব্যাখ্যাতীত বিভিন্ন ঘটনা ঘটবার বদনাম থাকে, তো কথাই নেই।

কবরস্থান নিয়ে ভুতুড়ে কাহিনির অভাব নেই।

এরই কয়েকটা নিয়ে লিখিত হলো 'গোরস্থানে ভয় আছে'।

বাজি

সিংগাপুরের এক কফি শপে বসে আড্ডায় মেতে উঠেছে কয়েক বন্ধু। সেই সঙ্গে চলছিল হালকা মদ্যপান। একপর্যায়ে আলাপে চলে এল ভূত, প্রেতাত্মা এসব বিষয়। ইতিমধ্যে তাদের কেউ কেউ খানিক মাতালও হয়ে পড়েছে।

দলের একজন শুরু থেকেই হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছিল ভূত-আত্মা এসবের অস্তিত্ব। তার এই দাম্ভিক আচরণ মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না অন্যদের।

তারা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল: 'এতই যদি অবিশ্বাস, তো সাহস করে ভুতুড়ে বলে বদনাম আছে এমন এক গোরস্থানে একরাত কাটিয়ে এসো না!'

যুবকটিও পিছাবার পাত্র নয়।

'এ আর কী! আমি ডরাই নাকি? ভূত, অশুভ আত্মা এগুলো সব বোগাস।' এবার চড়া গলায় বলল সে, 'শুধু বলো কখন যেতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, আজ রাতে নয়। তুমি মাতাল হয়ে গেছ, ঘুমিয়েই রাত কাবার করবে। শনিবার রাতে যাবে তুমি। আমরাও যাব সঙ্গে। গোরস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দেব, যেন কোনও চাতুরি করতে না পার।'

'ঠিক আছে। তবে বাজির অঙ্ক ঠিক করে ফেল ঝট্‌পট্।'

অতএব টাকার অঙ্কও ধার্য হলো।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার।

অহংকারী যুবকের সবচেয়ে কাছের দোস্ত আবার সন্ধ্যার সে

আড্ডায় ছিল না। পরে যখন বাজির কথা শুনল, সে বোকামির জন্য যুবককে গালমন্দ করতে লাগল।

'তুমি কি সত্যিই ওই গর্দভের দলের সঙ্গে বাজি ধরে গোরস্থানে রাত কাটাবে?'

'আমার আর কোনও উপায় নেই,' করুণ শোনাল যুবকের কণ্ঠ, 'এখন যদি পিছু হটি, মুখ দেখাতে পারব না।'

বন্ধুটি এই বোকামি না করবার জন্য বারবার তাকে অনুরোধ করল। বলল, যেন অন্যদের বলে এসবের মধ্যে আর নেই সে। তার আগ্রহ শেষ।

এদিকে বন্ধুর কথায় টনক নড়েছে অহংকারী যুবকের। বোকার মত ফাঁদে পা দিয়ে বাজে পরিস্থিতিতে পড়ে যাওয়ায় নিজেরই এখন লজ্জা করতে লাগল তার। যাদের সঙ্গে বাজিটা ধরেছে, গিয়ে তাদের নেতাকে বেশ শান্তভাবেই বাজি ধরা বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ করল।

'ভেবে দেখো, শনিবার রাতে পুরনো গোরস্থানের আশপাশে কাটাবার চেয়ে অনেক মজার কত কিছু করার আছে আমাদের,' বোঝাতে চাইল সে।

কিন্তু তার কথায় চিড়ে তো ভিজলই না, উল্টো খেপে গেল ওই দলের নেতা যুবক।

'ও, তুমি তা হলে ভয় পাচ্ছ?' টিটকারির সুরে বলল সে।

'না, মোটেই না। আমি প্রস্তাব দিয়েছি কারণ, মনে হয়েছে এভাবে গোরস্থানে নিরানন্দ সময় কাটাবার কোনও মানেই হয় না। খামোকা পণ্ডশ্রম হবে আমাদের।'

'আমরা সবাই শনিবার রাতের রোমাঞ্চকর অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। এখন তুমি পিঠটান দেয়ার কথা ভাবছ? তুমি আসলে কাপুরুষ। শুধু মুখে যত সাহস।' টিটকারি ঝরছে দলনেতার কণ্ঠে।

এরপর সত্যি পিছু হটবার সুযোগ থাকে না।

www.blogye.com

নিজের মান-সম্মান বাঁচাতে হলে যেতেই হবে। ফেঁসে যাওয়া যুবক গোমড়া মুখে বলল, 'আমি মোটেই পিছু হটছি না। তোমরা যদি তাই ভেবে থাক, তবে ঠিক আছে, কথামত রাত এগারোটায় দেখা হবে গোরস্থানে।'

শনিবার মাঝরাতের একঘণ্টা আগে বন্ধুদের চার-পাঁচজন জড় হলো গোরস্থানের বাইরে। কয়েকজন পিঠটান দিয়েছে। তবে অন্যরা এসেছে তাদের অহংকারী বন্ধু সত্যি তার পাওনা পাচ্ছে কি না দেখতে।

ঘটনার নায়ক সে যুবকটিও সময়মত হাজির, হাতে একটা ফ্ল্যাশ লাইট।

'ভিতরে ঢুকব কী ভাবে?' জানতে চাইল সে।

'মূল ফটকে চড়তে হবে,' আবার গা জ্বালানো হাসি উপহার দিল দলনেতা।

'ঠিক আছে,' বলল যুবক।

অহংকারী যুবক ফটকে চড়বে, এমনসময় দলের একজনের মনে কু ডাকল। তার কেন যেন মনে হলো ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে আজ গোরস্থানে। বোঝানোর চেষ্টা-করল সে, 'মনে হয় বাড়াবাড়ি করছি আমরা। চলো বাদ দিই, সবাই বাড়ি ফিরি।'

আরেকজন সম্মতি জানাল, তারপর আরও একজন।

'বরং গিয়ে বিয়ার আর সামুদ্রিক মাছ পেটে চালান দেয়া যাক,' পরামর্শ দিল আরেকজন।

দলনেতা কিছু বলল না। কিন্তু চোখে পরিষ্কার টিটকারির আভাস দেখল অহংকারী যুবক।

আর সহ্য করা যায় না, মনে মনে স্থির করে ফেলল সে।

'না, আমি যাব। কাপুরুষের মত পিছু হটেছি বলার সুযোগ কাউকে দিতে চাই না,' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল সে। চোয়াল দুটো চেপে বসেছে পরস্পরের উপর। বোঝা যাচ্ছে আর টলানো যাবে না একগুঁয়ে যুবককে। তারপর কেউ বাধা দেয়ার আগেই

www.blogye.com

লাফ দিয়ে ফটকে চড়ল সে, আরেক লাফে গোরস্থানের ওপাশে নামল। এবার ফটকের ওধার থেকে বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'সকালে এখান থেকে বেরোব আমি।' তারপর ঘুরে অন্ধকারের দিকে হাঁটা ধরল।

আসলে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই।

একজন বলল, 'ওকে ঠেকানো উচিত।'

তবে কেউ নড়ল না।

'ওকে যেতে দাও, ও টাকাটা জিততে চায়, এটাই বড় কথা,' বলল দলের নেতা, 'আর ওর কিছু হবে না। সকালে আমরা ফিরে আসব।'

অনীহার সঙ্গে অন্যরা তাকে অনুসরণ করল। তারপর সবাই রওনা হলো একটি নাইট ক্লাবের দিকে।

ওদিকে অন্যদের চোখের আড়ালে এসেই থমকে দাঁড়াল অহংকারী যুবক। গোরস্থানের ভিতর শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। অস্বীকার করবার উপায় নেই, ভয় পেয়েছে সে। তার মনে হলো, যদি এমন হতো: চোখ বন্ধ করল আর এখানেই দাঁড়িয়ে রইল, কোনওকিছু তাকে বিরক্ত পর্যন্ত করল না। এভাবে একসময় সকাল হয়ে গেল! আহ্ কী চমৎকারই না হতো এমন হলে!

কিন্তু যুবক জানে, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না সে। চারপাশে যেদিকেই চোখ যায়, সমাধি ফলক। ওদিকে তাকাতে চায় না সে, কিন্তু ফ্যাকাসে, নীলচে পাথরগুলো বারবার তার দৃষ্টি টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে।

তারপরই একটা চিন্তা এল মাথায়।

একটা গাছে চড়ে সেখানেই রাত কাটাতে পারে সে। রাতে একা একা এই গোরস্থানের ভিতর হাঁটবার চেয়ে ওটাই ভাল হবে। এখানে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে সকালের অপেক্ষা করবার চেয়ে

www.blogye.com

নিশ্চিতভাবেই গাছে উঠবার এই পরিকল্পনা অনেক বাস্তবসম্মত।

কাজেই যুবক পছন্দমত গাছ বাছাই করল।

ঘন ডাল-পালার গাছগুলোকে কেমন ভুতুড়ে লাগে, কাজেই বেশি ডাল-পালা-পাতা নেই এমন গাছ বাছাই করল সে।

তবে গাছে চড়া যতটা সহজ হবে ভেবেছে, ততটা সহজ হলো না। প্রচুর খসখস, মরমর শব্দ হতে লাগল।

আর শব্দগুলো তার হৃৎপিণ্ডের গতি থমকে দেবার উপক্রম করল। একবার মনে হলো বিড়ালের মিঁউ-মিঁউ শব্দ শুনল। তবে আর শব্দটা পেল না, ওই আওয়াজ নিজের কল্পনা মনে করল।

শেষপর্যন্ত গাছের যে জায়গা বাছাই করেছে, সেখানে উঠতে পারল। বেশি নীচে থাকতে চায়নি, পাছে আবার কেউ টেনে নামিয়ে ফেলে।

এই গোরস্থানের বদনাম তো আর এমনি এমনি হয়নি।

তাই মোটামুটি উঁচুতে ডাল বাছাই করল যুবক।

তবে গাছের উপর থিতু হয়েও যে খুব শান্তি এল মনে, তা নয়।

দূরের রাস্তা দিয়ে যাওয়া প্রতিটি বাসের শব্দ তার আত্মা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। গাছের পাতা বা ডাল-পালা নড়ে উঠলেই দ্রিম দ্রিম করে বাড়ি খেতে শুরু করছে হৃৎপিণ্ডের ভেতর। ঘড়ির দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে মধ্যরাতের দিকে চলেছে ঘণ্টার কাঁটা।

হায় ঈশ্বর, তখন কী ঘটবে কে জানে, ভাবল সে।

হঠাৎ করেই ভয়াবহ এক আতংক গ্রাস করল তাকে।

ঘাড়ের চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল। ভীষণ ফাঁকা লাগছে মাথাটা আবার একইসঙ্গে খুব ভারী লাগল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে মধ্যরাত হবে, শুরু হবে অশুভ প্রহরের।

তাকে যদি পালাতে হয়, তো এখনই।

পরে আর সুযোগ নাও মিলতে পারে।

www.blogye.com

পালাও! মনের ভিতর থেকে স্পষ্ট নির্দেশ শুনল সে।

অন্যরা কী ভাববে তাতে এখন কিছুই আসে যায় না। একদা অহংকারী যুবক ভাবল, তারা তাকে কাপুরুষ ভাবলে ভাবুক গে!

এমন পরিস্থিতিতে অতিসাহসী মানুষ কাপড় ভিজিয়ে ফেলত, ভাবল সে।

তাকে এখন যেভাবেই হোক গোরস্থান থেকে বেরুতে হবে।

চিন্তা-ভাবনা করতে করতেই গাছ থেকে হিঁচড়ে নেমে এল সে, অনেকটা অবচেতনভাবেই। তারপর ঝেড়ে দৌড় দিল।

গোরস্থানের ফটক লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে, ঝড়ের গতিতে চলছে পাদুটো।

এভাবে পাগলের মত ছুটে চলবার সময় কোন্ ফাঁকে হাত থেকে ছুটে গেল ফ্ল্যাশ লাইট। আর অন্ধকারে পথ দেখাবার একমাত্র উৎস ছিল ওটাই। ঘাসের উপর পড়া বাতির আলো গিয়ে পড়েছে এক সমাধি ফলকের গায়ে সেঁটে থাকা ধবধবে সাদা এক কাঠামোর উপর!

যুবকের মনে হল, বুকে হাতুড়ি পিটাচ্ছে কেউ। একমুহূর্ত দেরি না করে পাগলের মত ছুটল সে। মনের ভিতর থেকে কে যেন চিৎকার করছে, 'পালাও! পালাও!'

ওই তো ফটক দেখা যাচ্ছে!

খুব বেশি দূরে নয়!

ধীরে ধীরে আরও কাছে চলে আসছে ফটক।

প্রায় পৌঁছে গেছি, নিজেকে সাহস যোগাল যুবক।

একবার টপকে ওপাশে পড়তে পারলেই সে মুক্ত।

জীবনে আর এ মুখো হবে না।

মধ্যরাত হতে দেরি নেই। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র।

এত জোরে ছুটছে, ফটকের কাছে পৌঁছে নিজেকে থামাতে পারল না সে— জোরে বাড়ি খেল লোহার ফটকের সঙ্গে।

বুকের সব বাতাস যেন বেরিয়ে গেল। এতে দমল না, ফটকে

www.blogye.com

এক পা রেখে উপরে উঠতে শুরু করেছে, এমনসময় কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেল সে।

গালে এসে পড়ল প্রচণ্ড চড়। শক্ত কিছু আঁকড়ে ধরল গলা!

পরদিন বন্ধুরা পেল তাকে, শক্ত হয়ে গেছে শরীরটা। হাতের আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরেছে গোরস্থানের ফটকের শিক।

শরীরটা লেগে আছে ফটকের সঙ্গে।

কয়েক ঘণ্টা আগেই মারা গেছে যুবক।

পরে চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানান, হৃৎপিণ্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে মারা গেছে সে।

যারা মৃতদেহ আবিষ্কার করে, গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে: দমকা বাতাসে গাছের একটা ডাল জোরে এসে আঘাত করেছিল যুবকের ঘাড়ে।

হাইগেটের রক্তচোষা

১৮৩৯ সালে তৈরি হয় হাইগেট গোরস্থান।

ভিক্টোরিয়ানদের দারুণ কারুকার্জময় সব সমাধিতে ভরে উঠতেও সময় লাগেনি।

কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে এসে মানুষের আগ্রহ কমতে থাকে গোরস্থানটির প্রতি।

অযত্নে-অবহেলায় ধ্বংস হতে থাকে সুন্দর স্থাপত্যরীতির সব সমাধি। এসময় প্রথম একে ঘিরে নানা ভুতুড়ে কীর্তির কাহিনি ছড়াতে থাকে। গোরস্থান-কাহিনিতে নতুন মাত্রা আসে যখন ভ্যাম্পায়ারের আস্তানা হিসাবে হাইগেট গোরস্থানকে চিহ্নিত করে

www.blogye.com

একটার পর একটা খবর ছাপতে থাকে সংবাদপত্রগুলো।

প্রথম ঘটনাটি ১৯৬৩ সালের এক রাতের।

ষোল বছর বয়সী দুই সন্ন্যাসিনী কিশোরী হাইগেট গ্রামে বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরছিল। গোরস্থানের পাশের সোয়াইন লেন ধরে চলেছে তারা, এমন সময় গোরস্থানের উত্তর গেট পেরিয়ে যা দেখল, নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না। মেয়েদুটো পরিষ্কার দেখল, সমাধির ভিতর থেকে একটার পর একটা দেহ বেরুতে শুরু করেছে!

এই দৃশ্য দেখবার পর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে কোন্ সাহসে!

পড়িমরি করে ওই এলাকা থেকে ছুটে পালাল ওরা।

এর রেশ কাটতে না কাটতেই ঘটল দ্বিতীয় ঘটনা।

এবারও সেই সোয়াইন লেন।

রাস্তা ধরে হাঁটছিল এক প্রেমিক-প্রেমিকা। হঠাৎ মেয়েটার নজরে পড়ল, ভয়ংকর কুৎসিত চেহারার কিছু গোরস্থানের ফটকের লোহার রেলিংয়ের ওপাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে।

প্রেমিকাকে চোখ বিস্ফারিত করে ফটকের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে ছেলেটারও দৃষ্টি গেল ওদিকে।

যেন বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল দুজনেই। জায়গা থেকে নড়তে পারল না বেশ কিছু সময়।

তারপর আরও অনেকেই দেখল পৈশাচিক ছায়ামূর্তিটাকে।

ফটকের ওপাশে সমাধি সারির মাঝের সরু পথ ধরে হেঁটে বেড়াতে দেখা যায় ওটাকে।

কেউ কেউ তাঁদের অভিজ্ঞতা লিখলেন স্থানীয় পত্রিকাতে।

তারপরই গোরস্থান আর তার পাশের নালায় পাওয়া যেতে লাগল রক্তে-রঞ্জিত নানা জানোয়ারের মৃতদেহ।

লণ্ডন শহরে ছড়িয়ে পড়ল খবর: হাইগেট গোরস্থানে আস্তানা গেড়েছে একটা ভ্যাম্পায়ার!

পরের বছরগুলোতে আরও অনেকে গোরস্থানের

www.blogye.com

গোরস্থানের প্রবেশদ্বার।

ভ্যাম্পায়ারকে দেখবার কথা জানাল।

তারপর ১৯৭১ সালে এক তরুণী দাবী করল, গোরস্থানের বাইরের রাস্তায় ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণের শিকার হয়েছে সে।

ভোরের দিকে গোরস্থানের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল মেয়েটি। তখনই দীর্ঘ কালো এক ছায়ামূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক ঝলকের জন্য তার মুখ দেখতে পায় মেয়েটি— ফ্যাকাসে, সাদা।

বিশাল দেহের ওজনে রাস্তায় পড়ে যায় মেয়েটি।

ভাগ্যই বলতে হবে, তখনই রাস্তা অতিক্রম করতে থাকা এক গাড়ির চালকের বিষয়টা নজরে পড়ে।

মেয়েটাকে সাহায্য করবার জন্য গাড়ি দাঁড় করাতেই মাথার উপরের বাতির মৃদু আলোয় অদৃশ্য হয় ভৌতিক অবয়ব।

হতবিহ্বল মেয়েটাকে কাছের পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সৌভাগ্যক্রমে হাত-পায়ে হালকা কেটে-ছিঁড়ে যাওয়া

www.blogye.com

ছাড়া শরীরে আর কোনও আঘাত লাগেনি তার।

সময় নষ্ট না করে গোটা এলাকায় জোর তল্লাশি চালায় পুলিশ।

তবে এ ব্যাপারে পরে মুখে কুলুপ এঁটে ফেলে তারা।

এ ঘটনার ক'দিনের মধ্যে সম্মোহনের শিকার হলেন এক লোক গোরস্থানের ভিতর।

এক সন্ধ্যায় কৌতূহলের বশে হাইগেট গোরস্থানে ঢোকেন তিনি। দিনের আলো মরে আসতে থাকলে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তারপর পথ হারিয়ে বসেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন নন, কাজেই শুরুতেই ঘাবড়ে যাননি। শান্তভাবে ফটকের খোঁজে হাঁটতে লাগলেন এদিক-ওদিক। তখনই পিছন পিছন কিছু আসবার শব্দ পান। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরতেই ভয়ে যেন সম্মোহিত হয়ে যান।

দীর্ঘ, কালো দেহের ভ্যাম্পায়ারটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি!

আতংক এতই আঁকড়ে ধরল তাঁকে, ওটা অদৃশ্য হওয়ার পরও বেশ কয়েক মিনিট জায়গা থেকে নড়তে পারলেন না।

পরে তিনি বলেন, কিছুর প্রভাবে যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল তাঁর শরীর।

এদিকে ১৯৭৪ সালের একরাতে এক লোক সোয়াইন লেনে গাড়ি রেখে কুকুরটাকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ফিরলেন, গাড়ির ভিতরে আবিষ্কার করলেন সদ্য কবর খুঁড়ে আনা এক লাশ।

অবশ্য আশ্চর্য বিষয়: গাড়ির দরজাগুলো লাগানোই ছিল!

ভ্যাম্পায়ারটিকে আরও যারা দেখেন, তাঁদের ভিতর আছেন অতিপ্রাকৃত ও ভ্যাম্পায়ার বিষয়ে গবেষণাকারী ডেভিড ফেরান্ট।

১৯৬৯ সালের ২১ ডিসেম্বর প্রেতাত্মা ও অপ্রাকৃত ঘটনার খোঁজে গোরস্থানটিতে হানা দেন তিনি।

www.blogye.com

গোরস্থানের ভিতরের ভাস্কর্যগুলো মানুষের আতংক আরো বাড়ায়।

তখনই কালচে ধূসর এক অবয়ব নজরে পড়ে তাঁর।

দিনের পর দিন ভ্যাম্পায়ার দেখেছেন এমন লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকল।

কোনও কোনও প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, কালো কোট, টপ হ্যাট ও ধূসর টুপি পরা এক লোক কিংবা এরকম কিছু ওটা। কুয়াশার চাদরে হঠাৎ করেই সমাধি ফলকগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় তাকে। এমন কী কারও কারও দিকে নাকি দাঁত বের করে গর্জনও করেছে সে।

যারা দেখেছেন, তাঁদের অনেকেই বর্ণনা করেছেন লম্বা তীক্ষ্ণ দাঁতওয়ালা এক মানুষকে। ভ্যাম্পায়ারের কথা মনে করিয়ে দেয় এমনই বর্ণনা দিয়েছেন তাঁরা।

ধূসর রঙের ওই ভৌতিক কাঠামো ছাড়াও আরও অনেক জিনিস দেখেন অনেকে হাইগেটে।

www.blogye.com

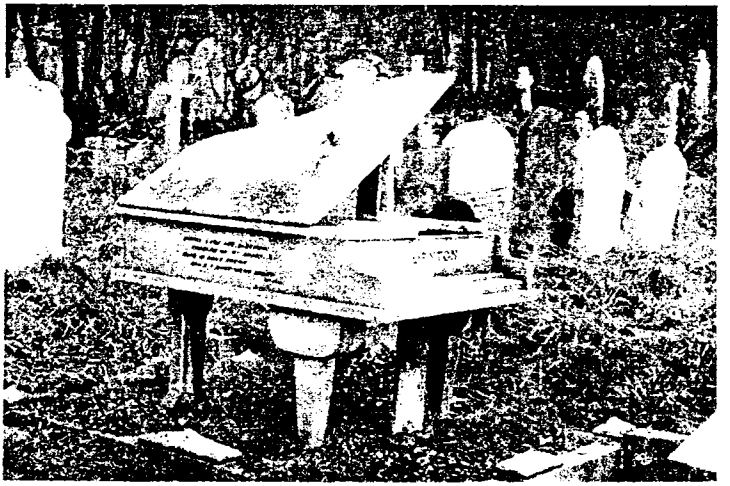

গোরস্থানের ভিতরের একটি সমাধি।

বাই সাইকেল চালানো এক লোক, বারবার হেঁটে পুকুরে নেমে পড়া এক অবয়ব, ফটকের ওপাশ থেকে উঁকি দেয়া বীভৎস এক মুখ, আর সাদা পোশাকের এক নারী— চারপাশে ভেসে বেড়ায় যেন সে। কখনও খনখনে গলায় হাসে, কখনও আবার দয়াভিক্ষা করে।

তবে ওই কালচে ধূসর ছায়ামূর্তিকে চোখে পড়েছে সবচেয়ে বেশি।

এমন কী ক'জন বলেছেন, ছায়ামূর্তিটাকে একটা শিয়াল হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন তাঁরা।

ওটার দাঁত ছিল প্রাণীটার গলায়।

তাঁদের এই দাবী হেসে উড়িয়ে দেয়াও কঠিন।

কারণ ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরগুলোতে ছিন্নভিন্ন গলার অনেক শিয়াল পাওয়া গেছে হাইগেট গোরস্থানের ভিতর।

www.blogye.com

অনেকে আবার এর সঙ্গে যোগ খুঁজে পান ওয়ালাসিয়ার রক্তচোষার।

কিংবদন্তী অনুসারে আঠারো শতকের শেষদিকে রক্তচোষাটাকে রুমানিয়ার ওয়ালাসিয়া এলাকায় আনা হয় বিশাল এক কফিনে পুরে। মধ্যযুগের ওয়ালিসায় কালো জাদুর চর্চা করত সে। কিন্তু একপর্যায়ে ভ্যাম্পায়ার শিকারীদের কাছে তার অস্তিত্ব গোপন থাকল না। ধ্বংস করবার জন্য হন্যে হয়ে তার খোঁজ শুরু করেন তাঁরা। বাধ্য হয়ে ওয়ালাসিয়া ছাড়তে হয় ভ্যাম্পায়ারটিকে।

বলা হয়, পুরনো সেই ভ্যাম্পায়ারটিকে কফিনের ভিতর পুরে যে এলাকায় সমাধিস্থ করা হয়, কালক্রমে তাই একসময় পরিণত হয় হাইগেট গোরস্থানে।

বেশ কিছুকাল শান্তিতে বিশ্রামে ছিল বুড়ো ভ্যাম্পায়ার। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাকে জাগিয়ে তোলে কালো জাদুর চর্চা করা কিছু মানুষ। আর শান্তির ঘুম বিঘ্নিত হওয়ায় সে এতই খেপে যায়, যারা তাকে জাগিয়ে তুলেছে, তাদের জীবন কেড়ে নিয়ে প্রতিশোধ নেয়।

অনেকেই বলে বুড়ো ভ্যাম্পায়ারের বয়স কয়েক হাজার বছর, তাই তার চামড়া খুব শক্ত।

কেউ আবার দাবী করেছে, গোরস্থানে এমন এক লোককে তারা দেখেছে, যার চামড়া দেখে মনে হয় যেন মোমের তৈরি।

১৯৬০-এর দশকে ছিন্ন গলার শেয়াল পাওয়া গেলেও পরে আর তা শুধু ওই প্রাণীতে থেমে থাকেনি।

পরের বছরগুলোতে গোরস্থানের আশপাশে গলাকাটা কয়েকজন মানুষের মৃতদেহও পাওয়া গেছে।

শিয়ালের মত তাদের শরীরের ক্ষতস্থানও রক্তে জবজব করছিল।

১৯৭০ সালে মার্চের ১৩ তারিখ ভ্যাম্পায়ারের খোঁজে হাইগেট গোরস্থানে বেশ বড় তল্লাশি চালানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল

www.blogye.com

ভ্যাম্পায়ারের বুকে কাঠের কিলক ঢুকিয়ে চিরতরে ওকে শান্তি দেয়া।

কিন্তু অভিযানটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, ভ্যাম্পায়ার শিকারে অংশ নেয়া ক'জনকে খুঁজেও পাওয়া যায়নি পরে।

তারপর ওই বছরের আগস্টের ১ তারিখ মস্তকবিহীন এক নারীদেহ পাওয়া যায় গোরস্থানে।

আশ্চর্য বিষয়, ওই নারীর শরীরে কোনও রক্ত ছিল না।

ধারণা করা হয়, ব্যর্থ ভ্যাম্পায়ার শিকার অভিযানে নিখোঁজদের একজন ওই নারী।

পুলিশের কড়া তল্লাশির পরও মাথা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তবে গোরস্থানের ভিতর পাওয়া গেল রক্তহীন কিছু জানোয়ারের মৃতদেহ।

২০০৬ সালের নভেম্বরের ১০ তারিখ হাইগেট গোরস্থানে পাওয়া গেছে মস্তকবিহীন দুই নারীর মৃতদেহ। শরীরদুটো ছিল রক্তশূন্য।

প্রমাণ হয়, কোনও প্রাণী বা মানুষ তাদের শরীরের সব রক্ত পান করেছে কিংবা বের করে নিয়েছে।

অজ্ঞাত পরিচয় দুই নারীর মাথা খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি আর।

এ ঘটনার বছর কয়েক আগে এক নারী ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন গোরস্থানের কাছে।

২০০১ সালের এপ্রিলে আতংকে পাগলের মত সোয়াইন লেন ধরে দৌড়ে আসতে দেখা যায় তাঁকে।

একটু ধাতস্থ হওয়ার পর ভদ্রমহিলা জানান, রাস্তা ধরে হেঁটে আসবার সময় প্রায় মোমের মত সাদা এক লোকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে বসেছিলেন তিনি।

বিশাল এক কুকুরের উপর ঝুঁকে ওটার ঘাড়ে মুখ ডুবিয়ে ছিল

www.blogye.com

সে লোক।

মহিলা চিৎকার শুরু করলে দেয়াল টপকে গোরস্থানে ঢুকে পড়ে পিশাচটা।

মহিলার কথামত রাস্তায় বিশাল এক দোআঁশলা কুকুরের ছিন্নগলার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তবে বারো ফুট উঁচু দেয়াল পেরিয়ে কী ভাবে লোকটা গোরস্থানে ঢুকল, তা রয়ে গেল রহস্য হয়েই।

যদিও গোরস্থানের বেড়ার দু-পাশেই রক্তের চিহ্ন পেল পুলিশ।

বিগত বছরগুলোতে কৌতূহলী বেশকিছু মানুষ প্রাচীন ভ্যাম্পায়ারের কাঠের কফিন লুকিয়ে রাখবার মত জায়গার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন হাইগেট গোরস্থানে।

কিন্তু পাওয়া যায়নি কিছুই।

এমন কী ১৯৭০-এ ভ্যাম্পায়ারের গুজব ছড়িয়ে পড়বার পর থেকে গোরস্থানের ভিতর ও বাইরে প্রচুর ভ্যাম্পায়ার শিকারীকে আটক করেছে পুলিশ।

তবে মামলা কোর্টে যাবার পর খালাস হয়ে গেছেন সবাই।

হাইগেট গোরস্থানে রহস্যময় ঘটনা থেমে নেই এখনও।

২০১১ সালের ২৪ ডিসেম্বরে এক তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া যায় গোরস্থানে।

চারপাশের মাটি স্বাভাবিক থাকলেও মাথাটা বরাবরের মত নিখোঁজ।

এমন কী মাটিতে কোনও রক্তের ছাপও মেলেনি।

তবে কি বুড়ো ভ্যাম্পায়ার জীবন নিয়েছে তরতাজা ওই তরুণীর?

এদিকে গোরস্থানের ভ্যাম্পায়ার নিয়ে ডেভিড ফ্যারান্ট তো 'বিয়ণ্ড দ্য হাইগেট ভ্যাম্পায়ার' নামে বই লিখে ফেলেছেন।

আর সে বইয়ে ভ্যাম্পায়ারের বসবাসের পক্ষে নিজের যুক্তি

www.blogye.com

তুলে ধরেছেন ভদ্রলোক।

তিনি লিখেছেন, হাইগেট গোরস্থানের রহস্য সমাধানে লে লাইনের বিষয়টি বোঝা জরুরি। এ ধরনের রেখা তাদের চলবার

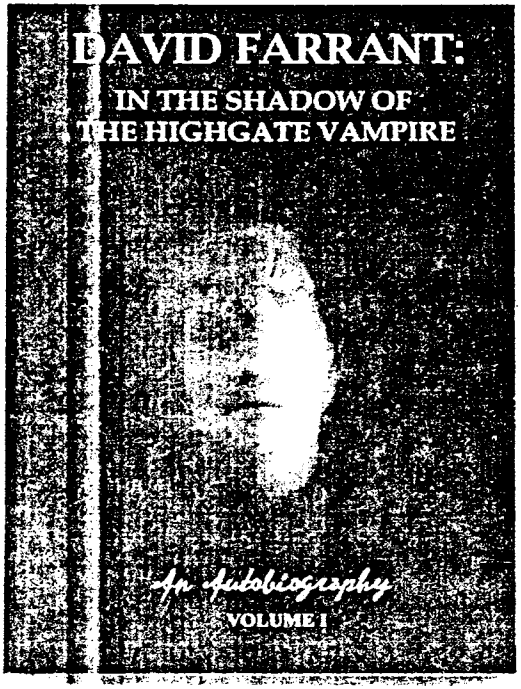

ডেভিড ফ্যারান্টের লেখা বইয়ের প্রচ্ছদ।

পথে অতিপ্রাকৃত শক্তি বিকিরণ করতে পারে। উপযুক্ত সময় এলে ভ্যাম্পায়ার বা রক্তচোষাদের সক্রিয় হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এমন একটি রেখার শুরু হয়েছে হাইগেট গোরস্থানের সীমানার মধ্যখানের লেবাননের চক্র নামে পরিচিত সমাধির একটি থেকে।

গোরস্থানের সীমানা পেরিয়ে পুরনো রোমান বসতির মধ্য দিকে চলে গেছে ওটা।

এদিকে একেবারে সাম্প্রতিক সময়েও দেখা গেছে দীর্ঘ,

www.blogye.com

কালো সে রহস্যময় ছায়ামূর্তিকে সোয়াইন লেনে।

এই তো গত ফেব্রুয়ারির একরাতে এক মহিলা গোরস্থানের পাশের সোয়াইন লেন ধরে গাড়ি নিয়ে চলেছিলেন। তখনই সাত ফুট লম্বা কালো এক ছায়ামূর্তি দেখেন, ওটার চোখদুটো আঁধারেও ভাটার মত জ্বলছিল। তারপরই গোরস্থানের দেয়াল ভেদ করে ওপাশে অদৃশ্য হয় সে।

এর ক'দিন বাদেই গোরস্থানের কাছে রোমান বসতি এলাকায় এক কুকুর নিয়ে হেঁটে বেড়াতে দেখা গেছে কালো পোশাকের রহস্যময় এক ছায়ামূর্তিকে। হঠাৎই বাতাসে মিলিয়ে যায় সে!

(সমাপ্ত)

www.blogye.com

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০,০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১১/১১/১৩ ভাগ্যচক্র -২০১৪ (বর্ষফল) কাজী সারওয়ার হোসেন

১৮/১১/১৩ টাইম বম (রানা-৪২৯) কাজী আনোয়ার হোসেন

বিষয়: গনগনে তপ্ত নিউ ইয়র্ক। বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ধসে পড়ল শক্তিশালী এক বোমার আঘাতে। জড়িয়ে পড়ল রানা। কারণ, হুমকি দিয়েছে টেরোরিস্ট, ওকে ডেকে না আনলে আরও অনেক বোমা ফাটবে শহরে। ডিটেকটিভ চিফ ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসনের সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখতে গিয়ে শুধু জাঙ্গিয়া পরে হারলেমের ক্রাইম জোনে যেতে হলো রানাকে। ডাক পিওনের মত ছুটছে ও শহরের এদিক থেকে ওদিক! এখানে-ওখানে-সেখানে ভয়ানক সব বোমা পেতে রেখেছে লোকটা! উড়িয়ে দিতে চাইছে কমিউটার ট্রেন, স্কুলের কচি শিশু ও নিরীহ জনসাধারণকে! আসলে কী চায় লোকটা? যখন বোঝা গেল সত্যিই কী চায়, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। ঠেকাতে গিয়ে অসহায়ভাবে বন্দি হলো রানা ও তার কালো বন্ধু জো মাইনার। এবার মরতে বসেছে দুজনই। বাইনারি বোমা দিয়ে ওদের সহ লোকটা উড়িয়ে দিল মস্ত জাহাজ। তা হলে কি এখানেই শেষ রানা?

চিরতরে গুড বাই, মাসুদ রানা?

আরও আসছে

সত্য হরর কাহিনি

ভুতুড়ে ছায়া

ইশতিয়াক হাসান

ঝড়ো সাগর উত্তাল হলেই হাজির হয় ভুতুড়ে জাহাজ ফ্লাইং ডাচম্যান! ওই নাম শুনেই শিউরে উঠেন সব ক্যাপ্টেন এবং দুঃসাহসিক নাবিক। ...কেন?
সুদূর মিশর থেকে মমির হাড় চুরি করে আনলেন যেয়লা। ...জানতেন না মমির অভিশাপ ডেকে এনেছেন!
ইংল্যান্ডের এক বাড়িতে গভীর রাতে কি দেখে চমকে উঠলেন এক আইরিশ নারী? ...ওটা কি মানুষ না অন্য কিছু?
ইংল্যান্ডের হাইগেট গোরস্তানে উদয় হয় ভীতিকর এক আগন্তুক। ওখানে নিয়মিত মেলে শিয়াল কুকুর এমন কী তরুণীদের রক্তশূন্য লাশ। ...তবে কি সত্যিই ভাম্পায়ার আছে?
রহস্যময়, অচেনা, অদ্ভুতুড়ে এক জগতে আপনাকে স্বাগতম। হয়ত মানতে চাইবেনা মন, কিন্তু এগুলো কোন গল্প নয়, সবই নিরেট সত্য!
এক মলাটে ৪২ টি কাহিনি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০